ভাষা, জাতিসত্তা : সংকট ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ, মায়ানমার, ওয়েলশ, স্কটল্যান্ড ও কাতালোনিয়ার দৃষ্টান্তের উপর আলোচনা

ভাষা, জাতিসত্তা : সংকট ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ, মায়ানমার, ওয়েলশ, স্কটল্যান্ড ও কাতালোনিয়ার
দৃষ্টান্তের উপর আলোচনা

বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২২

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা ৭০০০৪৭

প্রচ্ছদ: সোমনাথ হোরের পেপার পাল্পে নির্মিত
Wounds' চিত্রসিরিজের একটি ছবি অবলম্বনে

অক্ষর ও পৃষ্ঠাবিন্যাস
সত্যজিৎ দাস

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা ৭০০১৩২

মূল্য: ১২৫ টাকা

সূচি

	ভূমিকা	৭
১	আত্মহননের বহ্নুৎসব	১১
২	পড়শি যখন যম	২৪
৩	যমের সঙ্গে যুদ্ধ: ওয়েলশদের অভিজ্ঞতা	২৬
৪	শিকার ও শিকারী	৬৩
৫	ভাষা, জাতীয়তাবাদ, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা	৬৫
৬	বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের আঁটুনি ও রোহিঙ্গাদের দুর্গতি	১০১
৭	অন্যতর কোনও পন্থা?	১৩৩
৮	স্বাধীন স্কটল্যান্ডের দাবিতে গণভোট: নতুন জাতীয়তাবাদ?	১৩৬
৯	কাতালান ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ	১৪৭
১০	বিকল্প সম্ভাবনা	১৬৭

ভূমিকা

শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে আধিপত্যের সম্পর্ক, তার ছাপ ফুটে ওঠে ভাষা ও জাতিসত্তার মধ্য দিয়ে। প্রায়শই শাসিতের জিভ কাটা যায়, অর্থাৎ তার নিজের ভাষা সমাজে অচল হয়ে, অন্য কোনো আধিপত্যকারী ভাষার বাচকে সে পরিণত হয়। তার নিজের জাতিপরিচয়ও নিশ্চিহ্ন হয়ে আধিপত্যকারী কোনো জাতির তলার ধাপে তার ঠাঁই হয়। ভাষা, জাতিসত্তা ও শাসনাধিপত্যের মধ্যে এহেন সম্পর্কের বুননকে পরখ করে দেখাই এই বইয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু ভাষা-জাতি-রাষ্ট্র ত্রিভুজের টানাপোড়েন পরখ করার যাত্রায় এগোবো কীভাবে? ভাষা, জাতি, রাষ্ট্রের সাধারণ সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করে তারপর সেই প্রতিষ্ঠিত তাঁতযন্ত্রে টানা ও পোড়েন বুনে একটি তাত্ত্বিক সন্দর্ভ নির্মাণের পথে আমরা যাব? না, এখানে সে পথ আমরা নিইনি। সংজ্ঞানির্মাণের তাঁতযন্ত্রে টানাপোড়েন বোনায় আসলে আমাদের আগ্রহ কম। ঐতিহাসিক অস্তিত্বমানতায় ভাষা-জাতি-রাষ্ট্র ত্রিভুজের টানাপোড়েন যে বহু বিচিত্র নিত্য পরিবর্তনশীল নকশা ফুটিয়ে চলেছে, তা কোনো সাধারণ সার্বজনীন সংজ্ঞার কঠোর সীমারেখার মধ্যে ধরবে না, বরং উপছে পড়বে বলেই আমাদের সন্দেহ। তাই আমরা সংজ্ঞা থেকে নয়, ঐতিহাসিক অস্তিত্বমানতা থেকে শুরু করেছি। ইতিহাসের মুহূর্ত ও সেই মুহূর্তে মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করেছি। বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা থেকে বিমূর্তণ করে সাধারণ নিয়ম নিঙড়ে আনার চেয়ে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতাকেই মান্যতা দিয়ে বুঝতে চেয়েছি। সাধারণ প্রবণতা হিসেবে যখন যা উপলব্ধ হয়েছে, তখন তা চিহ্নিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোথাওই তা ইতিহাসের বা সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়ম হিসেবে মহামান্যবরেষুর শিরোপা পায়নি। বরং ইতিহাসকে আমরা দেখতে চেয়েছি বহু বৈচিত্র্য ও নিত্য পরিবর্তনশীলতার ধারক স্বরূপ বহু বিকল্পের সম্ভাবনাময় হিসেবে যেখানে মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোনো একটি সন্ধিক্ষণে বহু বিকল্পের মধ্যে নির্দিষ্ট বাছাইটি সংঘটিত হয়। এভাবে দেখাটাও আমাদের

একটি রাজনৈতিক পছন্দ। কারণ, ভাষা-জাতি-রাষ্ট্র ত্রিভুজের টানাপোড়েন পরখের অভিপ্রায় আমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যাবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে যা 'তাহলে কী করা যায়' প্রশ্নটিকেই নিরন্তর সামনে নিয়ে এসেছে। ভাষা ও জাতিসত্তা সংক্রান্ত এই সমস্যাবোধগুলো প্রথমে বিস্তৃত করা যাক।

ভাষার মড়ক-অতিমারী নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকরা বহুদিন হল সাবধানবাণী শুনিয়ে আসছেন। ১৯৯০-এ এসে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে যে আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস হিসেবে মান্যতা দিয়ে পালন করা শুরু হল, তাও এই ভাষাবিলোপ ও ভাষাগণতন্ত্রের ক্ষয়ের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির ভাবনা থেকেই। কিন্তু ভাষামড়কে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। বিশ্বজুড়ে প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো ভাষা, বিশেষত জনজাতিদের ভাষা তার শেষ কথকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করছে। ভাষা বাস্তুতন্ত্রে এক আধিপত্যের ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি হয়ে রয়েছে—সবার উপরের ধাপে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশয়ের মতো গুটিকয় ইউরোপিয় ভাষা, তারপর ক্রমে নামতে থাকা ধাপগুলোয় বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ভাষা, আর একদম তলায় অগুন্তি জনজাতিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিহীন ভাষা। একদম তলার ধাপের ভাষাগুলো যেমন একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, তেমনই মধ্যবর্তী ধাপের ভাষাগুলোরও ক্রমাগত স্বাস্থ্যক্ষয় হয়ে চলেছে সামাজিক ব্যবহারক্ষেত্রের ক্রমসংকোচনের মধ্য দিয়ে, আধিপত্যকারী ভাষার আগ্রাসী প্রভাবে স্বভাব-স্বকীয়তা-শব্দভাণ্ডার খোয়ানোর মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে নিরন্তর আরও বেশি বেশি মানুষ নিজস্ব পরম্পরাগত ভাষা-সংস্কৃতি থেকে শিকড়সুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে আধিপত্যকারী জাতির ভাষা-সংস্কৃতি অনুকরণ-অনুসরণে বাধ্য হচ্ছে। নিজ মাতৃভাষা যখন একের পর এক সামাজিক ব্যবহারক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হতে থাকে, তখন সেই মানুষদের স্বতক্রিয়ার উপরও বেড়ি পড়ে। আধিপত্যকারী ভাষায় অপারগতা সমাজের বহু ক্ষেত্রে তাকে নিষ্ক্রিয় ঠুঁটো করে তোলে। গণতন্ত্রের সম্ভাবনাও এভাবে পরাহত হয়।

ভাষা-সংকট ও ভাষা-আধিপত্য নিবিড়ভাবে জাতি-সংকট ও জাতি-আধিপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভাষা যেহেতু সাধারণত একটি জাতির ভাষা হিসেবে পরিচিত হয়, বা উল্টোদিক থেকে ভাষা যেহেতু জাতিপরিচয়ের অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে, তাই এ হয়ত খুব স্বাভাবিক। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ও বিকাশপথের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ভাষা-সমাজরূপ-সংস্কৃতির পার্থক্যের মধ্য দিয়ে পরম্পরার অগণিত বিভিন্ন ধারাকে প্রবাহিত করেছে। সেই বিবিধ ধারার উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বতন্ত্র ভাষা-সমাজরূপ-সংস্কৃতির বাহক হিসেবে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গোষ্ঠীগত আত্মপরিচয়ের বিকাশও ঘটেছে। বিভিন্ন

গোষ্ঠীর মধ্যে বসতএলাকা ও জীবনযাপনের উপজীব্য দখলের জন্য সংঘাত ও প্রতিযোগিতা হয়ত এই গোষ্ঠীগত স্বতন্ত্র পরিচয়ের শিলীভূতকরণের উপযোগী হয়েছে। এই বিভিন্ন জাতি নিজেদের ঘনিষ্ঠ অন্য জাতিদের সঙ্গে বন্ধুতা-শত্রুত্বের মিশ্র সম্পর্কে বিন্যস্ত ছিল। কিন্তু সমস্ত পরিচিত-অপরিচিত জাতিদের একটি পিরামিডসম ধাপবন্দি স্তরে বেঁধে উন্নত-অনুন্নত অগ্রসর-পশ্চাৎপদ সম্পর্কের পরকলার মধ্য দিয়ে দেখার চল খুব পুরোনো নয়। সতেরো থেকে উনিশ শতকের ইউরোপে সাবেক রাজতন্ত্রগুলোর গর্ভে বিকশিত হয়ে জাতিরাষ্ট্রগুলো যখন আবির্ভূত হচ্ছে, ডাচ-স্প্যানিশ-ইংরেজ-ফরাসি জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও ভিত্তিস্থাপন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দুনিয়াজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিস্তারের হিংস্র অভিযান প্রসার পাচ্ছে, তখন ওই উপনিবেশ-বিস্তারকদের দেখার চোখ থেকেই ওই দেখার চলের উদ্ভব হয়। গুটিকয় ইউরোপিয় জাতিকে মানবসভ্যতা বিকাশের নিরিখে সর্বোচ্চ শিখরে কল্পনা করে নিয়ে বিশ্বের বাকি সমস্ত জাতিকে ক্রমঅবনমনের ঢালে পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত, এমনকি বর্বর হিসেবে চিহ্নিত করাই ছিল সেই উপনিবেশ-বিস্তারকদের বিশ্ববীক্ষা। সেই ধারায় ইউরোপিয় গুটিকয় ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি ছাড়া বাকি সব ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি চিহ্নিত হল উন্নয়নের পরিপন্থী হিসেবে। উপনিবেশ-বিস্তারকরা উপনিবেশ স্থাপনের কাজে অভূতপূর্ব মাত্রায় হত্যালীলা-সন্ত্রাস-হিংসা চালিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুধু তার উপর দাঁড়িয়ে হয়নি, সেখানে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাদের এই বিশ্ববীক্ষাকে 'উন্নয়নের মতবাদ' হিসেবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারা। উপনিবেশিকৃত দেশগুলোর পরাধীন জাতির মানুষজনও এই উন্নয়নের মতবাদকে হজম করে নিজ ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজাচারকে পশ্চাৎপদতর শৃঙ্খল জ্ঞান করে 'শৃঙ্খলমুক্ত' হওয়ার জন্য শাসকজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজাচারকে অনুকরণ-আত্মীকরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। শতকের পর শতক জুড়ে এই মতবাদের রাজত্ব চলছে। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার মধ্য দিয়েও তা শেষ হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাওয়ার পরও রাষ্ট্রশাসনের আসনে নবোন্নত শ্রেণি থেকে শুরু করে জনসাধারণ অবধি এই সমস্ত স্তরে 'উন্নয়নের মতবাদের' ঘোর ঔপনিবেশিক খোয়ারি হিসেবে টিকে রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষয় ও ভাষা-মহামারীর সবচেয়ে জোরালো অনুঘটক হিসেবে এই 'উন্নয়নের মতবাদ' এখনও প্রবল সক্রিয়।

উল্টোদিকে, ঔপনিবেশিক শাসনাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে স্ফূরিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকদের আত্মম্ভরী

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতির এমন প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদও জন্ম নিয়েছে যা নিজ ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজাচারের পরম্পরা বজায় রেখে স্বতন্ত্র বিকাশের আশা পোষণ করেছে। ক্ষয়প্রাপ্ত ভাষা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার কিছু প্রচেষ্টাও দানা বেঁধেছে। নানা জয়-পরাজয়, বিচ্যুতি-বক্রগতির মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধগুলো এগিয়েছে। এই আধিপত্য-বিরোধী প্রতিরোধগুলোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা এই বইয়ে আলোচনা করব। সেগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে কিছু প্রতিরোধের শিক্ষা ভবিষ্যৎ সক্রিয়তার প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে চিহ্নিত করতে চাইব। পাঠপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠকও এতে স্বাধীনভাবে অংশ নেবেন আশা করি।

প্রথম অধ্যায়

আত্মহননের বহ্নুৎসব

'আমি বুঝতে পারি না কেন আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে যখন কোনো জাতি তার নিজের লোকজনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে XXXX হতে থাকে'— আপনিও কি এমনটাই মনে করেন? সত্যি তো, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা'-র নিষ্ক্রিয়তা কী করেই বা শ্রেয় হতে পারে? আপনিও কি তাই জাতিকে তার নিজের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' ফল থেকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পক্ষে? একে কি আপনি সেই অপর জাতির প্রতি 'সহমর্মিতা' ও 'মানবিক কর্তব্যের' অংশ বলেই ধার্য করছেন? দাঁড়ান, এখনই সিদ্ধান্ত কবুল করার আগে আরেকটু খতিয়ে দেখা যাক যে কোনো জাতির নিজের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' সে জাতিকে এমন কোন দুরবস্থায় ফেলতে পারে যা থেকে উদ্ধারের জন্য বাইরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এই 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা'-ই বা কীরূপ? কিছু উদাহরণ ধরা যাক:

ক) 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতির মানুষরা 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী', তাই 'খ' জাতি জীবনযাত্রার 'নিম্নমান', 'অভাব-অনটন' ও 'পশ্চাৎপদতা'-র পাঁকে আটকে রয়েছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করা দরকার।

খ) 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতির মানুষরা বুদ্ধি ও মেধা'-য় খাটো, তাই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অবিকশিত' ও 'দীন'। এর থেকে উদ্ধারের জন্য 'ক' জাতির 'উন্নত' ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে সেই 'দীন, অবিকশিত' ভাষা-সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপিত করে খ-জাতির 'বিকাশের দরজা' খুলে দিতে হবে।

গ) 'ক' জাতির আয়ত্ত করা 'আধুনিক' সমাজ-সংগঠনের রীতি এবং রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার রীতি 'খ' জাতির অনায়ত্ত দেখে 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতি মানবপ্রগতির 'বিবর্তনের ধারায়' বহু পিছে পড়ে আছে বলেই এহেন 'দুর্গতি'। তাই 'খ' জাতির 'প্রাগাধুনিক' রীতিরেওয়াজের

লোপ ঘটিয়ে 'আধুনিক' রীতিপদ্ধতি জোর করে চালু করার মধ্য দিয়েই 'ইতিহাসের থমকে যাওয়া গতিতে' বেগসঞ্চার করতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই অধ্যায়ে আলোচনা শুরুর উদ্ধৃতিতে 'XXXX' চিহ্নিত শূন্যস্থানে 'পশ্চাৎপদ' 'অবিকশিত', 'অনাধুনিক' মান্ধাতার যুগে আটকে থাকা' এহেন পদ / পদসমষ্টি বসানো যায় এবং-সে জাতির নিজের লোকদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' বলতে তাদের 'অলসতা, অনুদ্যোগ, বুদ্ধিহীনতা, মেধাহীনতা, ভাষার খামতি, সেকেলেপনা' ইত্যাদি বোঝানো হতে পারে। আর সে অবস্থায় 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না দেখা'-র মানে হল 'খ' জাতির ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারের 'ইতিহাসের নিয়মে লুপ্ত হওয়ার ভবিতব্যকে' ত্বরান্বিত করে 'ক' জাতির উন্নত ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারে নিমজ্জিত হতে তাদের বাধ্য করা। এইভাবে দেখার চোখ কল্পনার বস্তু নয়। সতেরো শতক থেকে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের গুটিকয় দেশ থেকে যে 'সাদা চামড়ার পুরুষেরা' গোটা বিশ্বে উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা অপরাপর জাতিকে এই চোখেই দেখেছে। উপনিবেশের অবসানের পরও এ দেখার চোখ রয়ে গিয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর শাসনকাজের বরাত পাওয়া জাতিগুলোর দেখার ধরনে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যের অপরাপর বিভিন্ন জনজাতিকে তারা একই চোখে দেখে। তাই এ চোখে দেখা কতটা 'সহমর্মিতা' ও 'মানবিক কর্তব্য'-কারক হয়েছে তা এই দীর্ঘ সময়বিস্তারে তার ফলাফল থেকে আমরা বিচার করতে পারি। সে বিচারে যাওয়ার আগে আর একটা কথা সেরে নেওয়া যাক।

আলোচনা শুরুর উদ্ধৃতিটিও কাল্পনিক নয়। এই উক্তিটি করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার বিশ শতকের ষাটের দশকে। তিনি তখন 'মহাশক্তিধর' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তাব্যক্তি। তিনি এটি করেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার 'চিলি' নামক দেশ সম্বন্ধে এবং 'XXXX' চিহ্নিত স্থানে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'কম্যুনিস্ট' শব্দটি। চিলিতে তখন বিপুল ভোটে জিতে সালভাদোর আলেন্দের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়েছে। সেই সরকারের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক অভিযান শুরু করার পূর্বকথা হিসাবেই হেনরি কিসিঞ্জার এই উক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত সেই সমরিক অভিযানে সালভাদোর আলেন্দেকে হত্যা করা হয়েছিল, নবগঠিত সরকারের আরো বহু পদাধিকারীকে হত্যা করা হয়েছিল, সরকারের সমর্থক হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল, আরও বহু মানুষকে দেশান্তরী করা হয়েছিল এবং এক সামরিক একনায়কের দীর্ঘ শাসনের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল।

প্রবল পরাক্রমী রাষ্ট্রনায়করা এমনই করে থাকেন। চিলি-র মানুষদের 'শাস্তি' পেতে হয়েছিল 'সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র' গঠনে সায় দেওয়ার জন্য। এর পূর্বেকার দশকই দেখেছে কীভাবে হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ডের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' সংশোধন করেছিল 'কম্যুনিস্ট রাশিয়া'-র শাসকরা। রাশিয়া নির্ধারিত 'সঠিক কম্যুনিস্ট পথে' আস্থা না রেখে সামান্য কিছু বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ সেনা দখল কায়েম করেছিল গণআন্দোলনকে দমন করে আর পোল্যান্ডের রাষ্ট্রচালকদের সহবত শেখানো হয়েছিল বাধ্য-বাধকতার বেড়ি আরো কষে বেঁধে।

কোনো জাতির রাষ্ট্রনায়করা অন্য জাতির মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' সংশোধন করতে যখন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেয়, তখন সেই 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মানুষদের মৃত্যুমিছিল, দেশান্তরী হওয়ার মিছিল, অধিকার হারানোর মিছিল চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সামরিকতার এই ঝনঝনানিতে 'সহমর্মিতা' বা 'মানবিক কর্তব্য'-র সুর কি কখনও বাজতে পারে?

'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা'-র সংশোধন হিসাবে এই সাঁজোয়া গাড়ি, বোমারু বিমান ও খুনে সেনা পাঠানোর দাওয়াই যদি 'গরম দাওয়াই' হয়, তাহলে 'নরম দাওয়াই' হল আধুনিকতা-উন্নয়নের পাঠ 'শেখানোর' জন্য শিক্ষক, প্রশাসক, অ-সরকারি সংস্থা, মিডিয়া-প্রচারক পাঠানো। এঁরা গিয়ে 'শেখাবেন': ১) 'খ' জাতির ভাষায় কাজ চলে না, 'ক' জাতির উন্নত ভাষা শিখতে হবে; ২) 'খ' জাতির জীবনযাপন 'সেকেলে' বলে তারা বহু সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাই নিজ পরম্পরা বিসর্জন দিয়ে 'ক' জাতিকে অনুকরণ করে জীবন-জীবিকা-খাদ্যাভ্যাস বদলে তাদের উন্নত হয়ে উঠতে হবে; ৩) তাদের সমাজ গঠন ও পরিচালনার বারোয়ারি রীতিনীতিও 'অচল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল', তাই 'ক' জাতির প্রশাসকদের শাসন তাদের মেনে নিয়ে সে শাসনেরই দোসর হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। এহেন 'শিক্ষাদান' চলবে বিদ্যালয় কক্ষে, গণপ্রচারমাধ্যমের পরিসরে, নব প্রশাসনী বিধি নিয়ম প্রবর্তনা মাধ্যমে এবং অ-সরকারি 'উন্নয়নকামী' বিভিন্ন সংস্থার উপকারী উপদেশ-আদেশ বিতরণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনকালে এমনটাই করেছিল, তারা ছিল 'ক' জাতি আর আমরা 'খ' জাতি। (বিশ্বের যেখানে যেখানে ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারকারীরা গেছে, সেখানে সেখানেই তারা নিজেদের 'ক' জাতি হিসেবে ধরে নিয়ে সেখানকার মানুষদের 'খ' জাতি বানিয়ে এহেন প্রক্রিয়া চালিয়েছে।) সেই ঔপনিবেশিক অধিপতিদের মনোভাবে রাঙা 'ক' জাতির ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ-নিয়ম-কানুন-এ পাঠ নিয়ে 'খ জাতি'

থেকে উপরে উঠে আসা 'স্যার-বাবু-সাহেব'-রা আজ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দেশের আদিবাসী জনজাতির মানুষদের উপর আজও একই প্রক্রিয়া বহাল রেখেছে। আদিবাসী জনজাতিদের শিশুরা তাই নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় না, অযত্নের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তাদের আঞ্চলিক প্রধান ভাষা বা হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় ও সেই ভাষা বলতেই বাধ্য করা হয়। আদিবাসী জনজাতির মানুষদের পরম্পরাগত জীবন-জীবিকাকে ধ্বংস করে ছিন্নমূল নিরাপত্তাহীন মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করা হয়। আদিবাসী জনজাতিদের সমাজের বিধি-বন্ধন ভেঙে জমি-জঙ্গল-নদীর উপর সভ্যতাগর্বী মানুষের মুনাফা নিঙড়ে নেওয়ার বিষম প্রক্রিয়া চালু হয়। ধীরে ধীরে আদিবাসী জনজাতিদের নিজস্ব ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র সংকুচিত হয়, তরুণদের 'ক' জাতির ভাষায় সরণ হতে থাকে, নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে কদর্য অনুকরণের এক অগভীর পলেস্তরার নিচে জমতে থাকে শূন্যতা।

'খ' জাতির 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা'-র চিকিৎসা করে তাকে 'উন্নত' করে তোলার এহেন ক'জাতির কার্যক্রমের ফল তাই হয় 'খ' জাতির ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষয়ের পথে অবলুপ্তির দিকে হাঁটা। বিবিধ ভাষা-সংস্কৃতির সমাজের বদলে উন্নত 'ক' জাতি ও তার কদর্য অনুকরণকারীদের এক সমসত্ত্ব কেয়ারী করা সমাজ গড়ে ওঠে। বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা-কে ঘুচিয়ে সমরূপ সমসত্ত্ব গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়ার শুভাশুভ বিচার কিছু দিক থেকে করে দেখা যাক:

ক) 'ক' জাতির দর্শকের চোখে 'খ' জাতির মানুষজন কেন 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী' বলে মনে হল? খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই মনে হওয়া 'ক' জাতির নিজস্ব প্রয়োজনবোধ ও স্বার্থবোধের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, ক জাতি-র ভাবনায় পাহাড় জঙ্গল কেটে রাস্তা, রাস্তার পারে খনি, খনির গহ্বর কেটে আকর তুলে আনা, দূর-দূরান্তে ব্যবসার শিকল তৈরি করে বেচাকেনা জরুরি। ক-জাতির ভাবনায় জঙ্গল কেটে ব্যবসায়ী আবাদ তৈরি ও ফসল বেচে আরও আরও মুনাফা জরুরি। ক জাতির ভাবনায় বাজারি কেনা বেচার বিজ্ঞাপনের ঝাঁ চকচকে মোড়কে ঢাকা সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার শাসনকে বাজার থেকে বসতবাড়ির অভ্যন্তর অবধি জারি করা হল উন্নতির চালিকাশক্তি। তাই কোনো মানুষ যদি এর বিপরীত ভাবনায় সচ্ছন্দ হয় তাহলে ক জাতির চোখে সে 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী'। উল্টোদিকে খ জাতির মানুষ ছোটমাপের কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক/বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও পশুপালনের মধ্য দিয়েই নিজেদের বস্তুগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তির বোধ পায় বলে খনি, দূর-বাণিজ্য, মুনাফাবৃদ্ধি ইত্যাদিতে 'উদ্যোগী' নয়। বন-

জঙ্গল-পাহাড়কে তারা তাদের জীবনের উৎস বা তাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিতি-সূচক হিসাবে দেখে বলে সেই বন-পাহাড় কেটে খুঁড়ে বরবাদ করার তারা বিরোধী। তাই খ জাতির দর্শকের চোখ থেকে দেখলে সভ্যতা-গর্বী আধুনিকতা-গর্বী ক জাতি হয়ত 'লোভী, সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ, লুটেরা' হিসাবে ধার্য হতে পারে। এই পরস্পর সম্বন্ধে পরস্পরের 'দাগা কাটা' এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়, তাহলে বলা যায় যে, এই দুটি ভাবনা আসলে মানবজীবনকে দেখা, প্রকৃতিকে দেখা-র দুটি ভিন্ন ও পৃথক দৃষ্টিকোণ—আবেগে দর্শনে স্বকীয় চরিত্রসম্পন্ন দুটি অস্তিত্ব-নির্যাস। এই দুইয়ের মধ্যে 'খ'-য়ের ভাবনার অস্তিত্বের অধিকার নেই, ক-জাতির ভাবনাকেই সর্বত্রচারী করতে হবে, এমনটা কীভাবে বলা যায়? ক জাতির দর্শক বলবে যে তার ভাবনাই মানুষের জীবনকে ধনে-সম্পদে পূর্ণ করে তুলেছে, নিত্যনতুন ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে তুলেছে, তাই খ-য়ের অভাব অনটন কন্টকিত জীবনের ভাবনার থেকে তার ভাবনা তো শ্রেয় বটেই। কিন্তু প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে ধন-সম্পদের সম্ভাবনাকে অসীম করে, নিত্যনতুন ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়েও কি 'অভাববোধ' ঘোচানো গেছে? যায়নি তো। বরং ভোগের চাহিদা হয়েছে সীমাহীন আর তাই অভাববোধও হয়েছে নিত্য-জায়মান। এই নিত্য-জায়মান অভাববোধ বস্তু সম্পদকে আঁকড়ে যত নিজেকে মেটাতে চেয়েছে, ততই ঘি-ছেটানো আগুনের মতো আরও জ্বলে উঠেছে। স্বার্থচিন্তার সংকীর্ণ গুহায় দাউ দাউ করে জ্বলা এই অভাববোধের হোমাগ্নির বশে মানুষ যত বাঁধা পড়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সমস্ত নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। নিজের বাইরে প্রকৃতির সমস্ত কিছু তার কাছে মনে হয়েছে কেবলই ভোগ্যবস্তু বা ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের উপকরণ। গাছ-পালা-জীবজন্তু-মাটি-জল-বাতাস এ সমস্ত কিছুকে ভোগের কলে নিঙড়ে নিতে নিতে সে নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। মাটির উর্বরতা ধ্বংস হয়েছে, জল-বাতাস দূষিত হয়েছে, গাছপালা-জীবজন্তুর বিভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। তাই মানুষ সহ জীবজগৎ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উৎকণ্ঠা থেকেই এমন প্রশ্ন ওঠে যে মানুষের জন্য কতটা 'ভোগ' দরকারি? কতটা ভোগের উপকরণ দিয়ে জীবনকে সাজানো যায়—এ ভাবনা তাই আজ শ্রেয় নয়, শ্রেয় এই ভাবনা যে কতটা তথাকথিত 'অভাব-অনটন' নিয়েও প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ির টান বজায় রেখে জীবনাচরণ করা যায়। ক জাতির সভ্যতা-গর্বী, আধুনিকতা-

গর্বী ভাবনাকে সর্বত্রচারী করে নয়, বরং খ জাতির মতো আরো বিভিন্ন বৈচিত্রময় জীবনাচার ভাবনার সহাবস্থান, সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই সেই 'শ্রেয়'-র দিকে যাওয়ার পথ।

খ) কোনো ভাষা-সংস্কৃতিকে 'দীন' বা 'অবিকশিত' বলে চিহ্নিত করা হয় কীভাবে? এই চিহ্নিতকরণের চালু রেওয়াজগুলোকে দেখা যাক। আদিবাসী জনজাতিদের এমন অনেক ভাষা আছে যা মৌখিক ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ, লিখন রূপ নেই। অথবা, লিখনরূপ খুবই অল্প ব্যবহৃত হওয়ার ফলে প্রাথমিক অবস্থায় সীমাবদ্ধ। এই লিখন রূপের অভাব বা অনুপস্থিতিকে ভাষার 'দীনতা' বা 'অবিকাশের' সূচক হিসাবে অনেকে ধরেন। আবার কোনো ভাষায় 'সুশীল সাহিত্যসৃষ্টির' সম্ভার যদি কম হয়, ছাপা মাধ্যমে, গণজ্ঞাপনের মাধ্যমে, আন্তঃঅঞ্চল বা আন্তর্জাতিক যোগযোগের ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি যদি না থাকে বা থাকলেও তা দুর্বল হয়, তাহলে তা ভাষার 'দীনতা' বা 'অবিকাশ' হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে এ সমস্তই ভাষাব্যবহারের পরিসর কতটা বিস্তৃত বা কতটা সংকুচিত, সে সংক্রান্ত বিচার, এর সঙ্গে ভাষার নিজস্ব কোনো দোষ বা গুণ জড়িত নেই, যেমন, লিখনশৈলীহীন ভাষার মধ্যে এমন কোনো দোষ নেই যার কারণে তার লিখনশৈলীর বিকাশে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা হাজির হতে পারে। যে কোনো ভাষারই লিখনশৈলীর বিকাশ সম্ভব এবং তা সেই ভাষার বাচকরাই করতে পারেন যদি ভাষাব্যবহারের যথাযোগ্য ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয়। ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রটি সামাজিক ক্ষেত্র, ফলত সেই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি বা সংকোচন নানা সামাজিক অবস্থা ও শর্তের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয়-বাজার-থানা-দপ্তর-আদালতে ক জাতির ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে খ জাতির ভাষা ব্যবহারের সংকোচন ঘটানো ক জাতির মানুষদের একটি সামাজিক ক্রিয়া, এর সঙ্গে খ জাতির ভাষার কোনো 'অযোগ্যতা'-র সম্পর্ক নেই। খ জাতির মানুষদের সমাজে পরম্পরাবাহিত লোকশিক্ষা, আদান-প্রদানের রীতি-নীতি-বিধি, সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার রীতি-নীতি-বিধি সবই তাদের নিজস্ব ভাষার আধারে হত, ফলে যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও ক্ষেত্র উন্মুক্ত হলে তা পুনর্বার হওয়ার মতো জোরও ভাষার আছে। একইভাবে 'সুশীল সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভার' ভাষাবাচকদের সমাজের অন্তর্বর্তী গঠনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হতে পারে, ভাষার দোষ বা গুণের প্রকাশ নয়। যে কোনো ভাষাতেই সেই ভাষার মানুষদের লোককথা,

লোকইতিহাস, লোকজ্ঞান, গান, গল্প, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনের সমৃদ্ধ ধারা প্রবাহিত থাকে, যা সেই ভাষিক সমাজের জীবনশক্তিকে প্রকাশ করে। কোনো জনজাতির জীবনের মধ্য দিয়ে জড়-জীব জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, যে অধ্যাত্মভাব স্ফূরিত হয়, তার সমগ্রকে প্রকাশিত করার ক্ষমতা যে জনজাতির ভাষার থাকে। ফলে এই বিচারে কোনো ভাষাই অন্য কোনো ভাষার থেকে ছোট নয়, দুর্বল নয়। সমস্ত ভাষার মধ্যেই বিকাশের সম্ভাবনা সমান। বিকাশের সুযোগ সবার যে সমান নয় তা তো সামাজিক ক্ষেত্রে হাজির বৈষম্যের জন্য। এই বৈষম্য তৈরি করা ও তীব্রতর করার যুক্তিই হল ক জাতির নিজের ভাষা দিয়ে খ জাতির ভাষাকে প্রতিস্থাপন করার যুক্তি। সামাজিক ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোয় নিজের অর্থাৎ ক জাতির ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে খ জাতির ভাষাব্যবহার ক্রমসংকুচিত করা তার লক্ষ্য। খ জাতির বাচকদের ক জাতির ভাষায় ভাষাসরণ ঘটানো তার লক্ষ্য। আর এর মধ্য দিয়ে ক্রমশ বাচকহীন হয়ে খ জাতির ভাষাকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া তার লক্ষ্য। এভাবে খ জাতির ভাষাবিলোপ কি 'শ্রেয়'? ভাষা হারিয়ে গেলে শুধু কি ভাবপ্রকাশের কিছু চিহ্ন ও ধ্বনিই হারিয়ে যায়? না, হারিয়ে যায় আরও অনেক অনেক কিছু। খ-জাতির ভাষা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় সেই ভাষার আধারে ধরা থাকা হাজার হাজার বছরের বিশিষ্ট এক মানব অভিজ্ঞতার ধারায় সঞ্চিত জ্ঞান, প্রকৃতিচেতনা ও অধ্যাত্মচেতনার সম্পদ। খ-জাতির ভাষাতেই তার বসবাস-অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ, জীব ও জড়প্রকৃতির নাম, পরিচয় বৈশিষ্ট্য ও মানবঅস্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের আভাস সঞ্চিত আছে, অন্য কোনো ভাষাতে তা নেই। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে দেখার এক বিশেষ ধরন ও তার থেকে উঠে আসা উপলব্ধি খ-জাতির ভাষাতে আছে, যা হুবহু অন্য আর কোনো ভাষায় নেই। খ জাতির ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবও বিলুপ্ত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতার ও উপলব্ধির ভাণ্ডারের একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়ে মানুষের দেখার ও ভাবার ক্ষমতা আরও সীমিত আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও, নিজ মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিতদের 'ক জাতির' ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আড়ষ্টতা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সমস্যাপূর্ণ অথবা অসম্ভব করে তোলে। এভাবে সমাজে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পরিসরেরও সংকোচন ঘটে।

গ) গণতন্ত্র নিয়ে অবশ্য ক জাতির বাগাড়ম্বর অন্তহীন। ক জাতির দাবি এই যে একটি বৃহৎ ভূখণ্ড জুড়ে কেন্দ্রীভূত শাসন জারি রাখার 'সংসদীয় গণতন্ত্র'-র পথই (যা আবার কেন্দ্রীভূতকরণের প্রবণতা আধিক্যে সর্বাত্মকতাবাদী শাসনে পর্যবসিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকে) মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার একমাত্র পথ। সেনা-পুলিশ-আদালত ও নজরদারি ব্যবস্থার বেড়িতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বেঁধে, কিছু পেশাদার রজনৈতিক দলের হাতে জনগণের 'প্রতিনিধিত্ব' করার 'দায়িত্ব' দিয়ে, গুটিকয় শহরের ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে জনগণকে শাসন করাই নাকি গণতন্ত্রের একমাত্র রূপ। আর আদিবাসী-জনজাতিদের নিজেদের সমাজের পরম্পরা অনুয়ায়ী যে সমাজ-সংগঠনের রীতিনীতি, তা সবই 'অগণতান্ত্রিক'। তাই ক জাতি তার সংগঠিত সরকার-প্রশাসন-আদালতের বল ব্যবহার করে খ জাতির 'সমাজ' চালানোর ব্যবস্থাকে ভেঙে বা দুর্বল করে নিজেদের 'সংসদীয় গণতন্ত্রের' কিনারে খ জাতিকে জুতে নিতে চায়। সত্যিই এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রসার হয় কিনা একটু খতিয়ে দেখা যাক। আদিবাসী জনজাতিদের সমাজ-প্রশাসনের কাঠামো সাধারণত একটি বা কয়েকটি গ্রামের ছোট পরিসরের উপর গড়া, এক বৃহৎ অঞ্চলকে কেন্দ্রীভূত শাসনে আনার কল্পনা তার মধ্যে নেই। গ্রামে সব মানুষদের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত সভা এবং তাকে পরিচালনা করার বা কার্যনির্বাহী দেখভালের জন্য বয়স্ক অভিজ্ঞদের একটা দল থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে গ্রামের প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণ করা সহজ। তা আরো সহজ এই কারণে যে সভার আলাপআলোচনা চলে অংশগ্রহণকারীদের মাতৃভাষায় এবং চেনা পরিবেশে পরিচিতদের মধ্যে অংশগ্রহণে আড়ষ্টতা থাকেনা। বেশ কিছু গ্রামের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বিভিন্ন গ্রামের বয়স্ক জনেদের সভা হতে পারে, কিন্তু গ্রামের জীবন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-মীমাংসা সব গ্রামসভাতেই হওয়া দস্তুর। বয়স্ক-অভিজ্ঞ জনেদের প্রতি মান্যতা, পরম্পরার প্রতি মান্যতা ও পাঁচজন মিলে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি মান্যতা এখানে নির্ধারক মূল্যবোধ হিসাবে কাজ করে। এই মান্যতার মূল্যবোধ কি 'অগণতান্ত্রিক', তা কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের পরিপন্থী? মান্যতা যদি প্রশ্নহীন আনুগত্যের মাত্রা অবধি বিস্তৃত হয়, মান্যতা যদি যেকোনো বিরোধিতাকে অসম্ভব করে তুলতে চায়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই অগণতান্ত্রিক। আবার অন্যদিকে, বিভিন্ন মানুষ একসঙ্গে জীবনযাপনের জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া

ও সম্মতির ভিত্তিতে যে নিয়ম-রীতি-র জন্ম দেয় তার প্রতি মান্যতা স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই আসে, তাই মান্যতা মানেই অগণতান্ত্রিক নয়, সামাজিক প্রাধিকার যদি সবার অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ও নিরন্তর পুনরুৎপাদিত হয়, তাহলে সেই প্রাধিকারের প্রতি মান্যতা গণতন্ত্রের আবশ্যক অংশ। উল্টোদিকে ক জাতির সংসদীয় গণতন্ত্রে আপামর মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ যদি আসে, তবে তা আসে কেবল সংসদীয় নির্বাচনের সময়, তখনও প্রতিনিধিত্বের অধিকার যেহেতু কার্যকারীভাবে পেশাদার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মানুষকে ভোটদানের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করার জন্য হরেক উপকরণের উপর পেশাদার রাজনৈতিক দল ও সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অংশের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকে, তাই তখনও মানুষ যে মুক্তভাবে নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে এমন নয়। আর সংসদীয় নির্বাচন অতিবাহিত হয়ে গেলে তো তখন 'মান্যতা'-র বোঝা অশেষ। নেতা-মন্ত্রী সেনা-পুলিশ, সংবিধান-আদালত, অফিসার- আমলা সবার সামনে মান্যতায় মাথা ঝুঁকিয়ে না থাকলেই 'দেশবিরোধী', 'রাষ্ট্রবিরোধী' ছাপ্পা মেরে জেল-হাজত-মামলামোকদ্দমার জেরে নাজেহাল হতে হবে। অথচ আপামর মানুষের অংশগ্রহণ ও সম্মতির মধ্য দিয়ে এই সেনা-পুলিশ, সংবিধান-আদালত, অফিসার-আমলার কাঠামোটি পুনরুৎপাদিত হচ্ছে না। বরং, যে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন গণবিদ্রোহ হয়েছে, সেই শাসনযন্ত্রের প্রভূত আইন কানুন, দমনমূলক ব্যবস্থাকে এখনও রাষ্ট্রচালনার হাতিয়ার করে রাখা হয়েছে। ক জাতির রাজনৈতিক রাষ্ট্রগঠন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পরিসর তাই কতটুকু এবং কতটা নিরাপদ সে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য 'স্বাধীন' ভারতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, বিকাশের প্রশ্নটিকে দেখা যাক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কী বুঝব? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থ হতে পারে নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে ভাবা, সে ভাবনা প্রকাশ করা বা অপরের কাছে জ্ঞাপন করা ও সে ভাবনা অনুযায়ী স্বতঃক্রিয়া করার অবকাশ। খ জাতির সমাজ পরম্পরাকে গুরুত্ব দেয় ও তা যৌথতা ভিত্তিক বলেই এ অবকাশ সেখানে কম হবে কেন? বরং ক জাতির আধুনিক শিল্প-সমাজে মানুষ ও উৎপাদনের যন্ত্রের মধ্যে ফারাক যেভাবে ক্রমে ঘুচে যাচ্ছে, বিশদ নজরদারি ব্যবস্থার অধীনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী উত্তেজনাকে বেহুঁশ

করে যন্ত্রমানবদের হল্লা রাজার সেনার মতো কুচকাওয়াজে জুতে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তো এই অবকাশের চরম অবক্ষয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম সর্বনাশ ঘটে চলেছে। তাই তুলনায় বোধহয় খ জাতির সমাজব্যবস্থাতেই ব্যক্তির মুক্তভাবে নিশ্বাস নেওয়ার ও স্বাধীনভাবে বিকাশের অবকাশ বেশি। আরেকটি প্রশ্নও আছে। সমাজযৌথতা ও পরম্পরার মধ্যে শিকড় কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশকে খর্ব করে নাকি ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে সার-রস যুগিয়ে মহীরুহের মত তাকে পল্লবিত হয়ে উঠতে সাহায্য করে? রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির মতো দুই ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ কি সমাজযৌথতা ও পরম্পরার মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েই পল্লবিত হয়নি? এ বিষয়ে আরও নিবিড় বিচার পৃথক কোনো আলোচনায় করা যেতে পারে।

এযাবৎ আলোচনা থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি যে খ জাতির তুলনায় ক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি শূন্যগর্ভ। এ শূন্যগর্ভতা ক জাতির আত্মকেন্দ্রিকতা ও তজ্জনিত দর্পেরই জাতক বোধহয়। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে সমস্ত অপরকে নিজের আদলে দুরমুশ করে নিয়ে সমসত্বতা গড়ার অভিযান মানবসভ্যতা ও প্রকৃতির মধ্যে আপদ হিসাবেই হাজির হয়। সমস্ত অপরতার বৈচিত্র্য ও বহুত্ব সম অধিকারে অস্তিত্ববান ও বিকাশমান হওয়াই বরং মানবসভ্যতা ও প্রকৃতির পক্ষে শ্রেয়। এ বিষয়ে 'ঠেকে শেখা' এক মানুষের উপলব্ধি শোনা যাক। এঁর নাম আলেস দেবেলজাক। ইনি পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণী স্লাভ জনজাতির এক মানুষ। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে সম্মান দিয়ে বহুত্বের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার পথ নাকচ করে সমসত্ত্ব সমাজ ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্যোগ কসভোর সার্বদের মধ্যে মাথাচাড়া দেওয়ার পর হিংসা-দ্বেষ-অবিশ্বাসের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে যুগোশ্লোভিয়ার বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন:

> যখন সবাই এক চিন্তা করে, তখন আসলে কেউই চিন্তা করে না।... নিজের জনজাতির সংস্কৃতি এবং অপর জনজাতির সংস্কৃতির টানাপোড়েনের মধ্যে জীবনযাপন আপনাকে বাধ্য করে আপনার নিজের পূর্বানুমানগুলোকে সর্বদা প্রশ্নের মুখ ফেলে পরীক্ষা করে নিতে। তা অবশ্যই ক্লান্তিকর বোধ হতে পারে, কিন্তু তাই-ই একমাত্র সৃজনশীল পথ। যখনই আমরা এই টানাপোড়েন ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তখনই তা পাল্টা প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে আবার ফিরে আসে।
>
> (বুদাপেস্তের হাঙ্গেরিয় পি.ই.এন ক্লাব থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'ওডি এট আমো: রাইটারস অন দি লাভ এণ্ড হেট অফ ফরেন নেশনস অ্যাণ্ড কালচারস' গ্রন্থে

> সংকলিত আলেস দেবেলজাক-এর লেখা 'ওডি এট আমো ইন দি ল্যাণ্ড অফ সাদার্ন স্লাভস' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

কিন্তু তাহলে এক ছাঁচে একভাবে এক ভাষায় সবাইকে গড়েপিটে নিয়ে সমসত্বতা গড়ার বিধ্বংসী টান তৈরি হয় কীভাবে? দেবেলজাক এক ক্লান্তির কথা বলেছেন। মূল্যবোধ-নৈতিকতা-সংস্কৃতির বহুত্বের টানাপোড়েন সর্বদা নিজের অবস্থান বা পূর্বানুমানগুলোকে প্রশ্ন করে যাচাই করতে বাধ্য করে, 'চিরায়ত, শাশ্বত, চিরন্তন' চিহ্নিত কুলুঙ্গি থেকে প্রায় সব কিছুকেই টেনে নামায় আপেক্ষিকতার ধুলোমাটিতে। এই অস্থিরতা যেমন নবসৃজনের ভিত্তিভূমি, তেমনই কখনও তা হয়ত কারও মধ্যে ক্লান্তিরও জন্ম দিতে পারে। ক্লান্তি থেকে কেউ এই অস্থিরতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে 'চিরায়ত, শাশ্বত, চিরন্তন'-এর কুঠুরিতে নিজেকে দরজাবন্ধ করে রাখতে পারে। এভাবে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া হয়ত সৃজনশীলতা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়া—তা নিষ্ক্রিয়তার সূচক। কিন্তু আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম এক অতি সক্রিয়তার রূপ নিয়ে যা সমস্ত বিভিন্নতা-বৈচিত্র্যকে হিংসাত্মক উপায়ে ধ্বংস করে নিজের ছাঁদে গড়ে নিতে চায় কারণ সে নিজের ভাবনা-মূল্যবোধ-নৈতিকতা-সংস্কৃতিকেই সবচেয়ে সঠিক বা সবচেয়ে সেরা বলে মনে করে। দরজাবন্ধ কুঠুরির নিষ্ক্রিয়তা থেকে এই আগ্রাসী আধিপত্যবাদী সক্রিয়তায় আসা-যাওয়ার পথটা কীভাবে তৈরি হয়? এই প্রশ্ন নিয়েই এবার ভেবে দেখা যাক।

অপরাপর ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারকে অস্তিত্বের সমানাধিকার না দিয়ে শ্রেষ্ঠ > < নিকৃষ্ট, কাম্য > < বাতিল বিভাজিকা টেনে ধাপবন্দি কাঠামোয় সাজিয়ে তোলা হল একটি অতি প্রভাবশালী ধারণা যা বিভিন্ন ধরনের 'প্রগতির মতবাদ'-এর জন্ম দেয়। 'প্রগতির মতবাদ' অপরাপর বিভিন্নতাগুলোকে এক ক্রমবিকাশের সারণিতে সাজিয়ে 'বিকাশের নিয়ম' নির্দিষ্ট করে, সেই নিয়ম বলে যে সমগ্র মানবপ্রজাতি 'ক্রমউন্নত' হতে হতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনাচারের অভিমুখে ধেয়ে চলেছে। সেই অভিমুখে স্থিত বা তার সবচেয়ে কাছে স্থিত সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনাচারের রূপটিই শ্রেষ্ঠ বা সবর্জনকাম্য। অপরাপর অন্য বিভিন্ন রূপগুলি আসলে সে অভিমুখে যাত্রাপথে বিভিন্ন ক্ষণজীবি মুহূর্ত, যা 'গতির নিয়মে' বিলীন হয়ে যাওয়াই ভবিতব্য। ইউরোপীয় উপনিবেশস্থাপনকারীরা তাদের নিজস্ব সমাজ-সভ্যতাকে এই মানবপ্রজাতির অভিমুখ হিসাবে হাজির করে 'প্রগতির শীর্ষবিন্দুতে' নিজেদের স্থাপন করেছিল। আর অন্যান্য অপরাপর সমাজ-সভ্যতার রূপগুলি যখন 'পশ্চাৎপদ', 'ত্রুটিযুক্ত', 'অসম্পূর্ণ' হওয়ার কারণে বিলীন হওয়াই ভবিতব্য, তখন জোর প্রয়োগ করে তাদের বিলীন করে দেওয়াও

‘ইতিহাসের গতিকে সাহায্য করা’ বলে আগ্রাসী আধিপত্যবাদী সক্রিয়তার ‘যুক্তি’ তৈরি করেছিল। এই প্রগতির মতবাদই তার মূল চরিত্র বজায় রেখে বিভিন্ন রূপ ধরে হাজির হয়েছে, যেমন, ইতিহাসের অন্তিমবিন্দু হিসাবে কখনও পুঁজিবাদী শিল্প-সমাজ, কখনও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সমাজতান্ত্রিক সমাজ, কখনও আর্য জাতির সমাজ হাজির হয়েছে। আর সেই শেষবিন্দু অভিমুখে অপরাপর সবাইকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ‘আধুনিকতা-নির্মাণ’-এর ধ্বংসযাত্রা তীব্র হয়ে উঠেছে।

এভাবে মানবপ্রজাতির বিকাশের শেষবিন্দু হিসাবে সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনাচারের একটি রূপকে পরম মূল্যের বলে হাজির করা অপরাপর সমস্ত রূপ-কে মূল্যহীন বলে সাব্যস্ত করে। প্রগতির ধারণার মধ্য দিয়ে যেমন এর মতবাদিক ক্ষেত্র নির্মিত হয়, তেমনই এর সমাজ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি নির্মিত হয় ‘জাতি-রাষ্ট্র’-এর রূপের মধ্য দিয়ে। ‘জাতি-রাষ্ট্র’-এর প্রতিমা নির্মাণ হয়েছে এইভাবে যে তা এক দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল, ছোটো ছোটো জনজাতিদের যৌথতা-ভিত্তিক সমাজ থেকে ‘বিবর্তিত’ হতে হতে ক্রমশ ‘উন্নততর’রূপ নিতে নিতে সামজ সংগঠনের সবচেয়ে উন্নত রূপ হিসাবে ‘জাতি-রাষ্ট্র’-এর উদ্ভব হয়েছে। একটি বড় ভূখণ্ড জুড়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ‘জাতীয় ভাষা’, ‘জাতীয় সংস্কৃতি’-র ঐক্যবন্ধন (ঐক্যের চেয়ে এখানে বন্ধনেই জোর বেশি) বাঁধা এখানে এক চরম ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি করে। এই ধাপবন্দি কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপে থাকে ‘জাতীয় পরিচয়’ নির্মাণে ব্যবহৃত প্রমিতিকৃত এক বা কয়েক ভাষা এবং রীতি-রেওয়াজ আর সেই ভৌগোলিক সীমায় বর্তমান অন্য সমস্ত ভাষা ও রীতি-রেওয়াজকে ‘অযোগ্য, ত্রুটিযুক্ত, দুর্বল’ ইত্যাদি নানা বিশেষণে মূল্যহীন করে তোলা হয়। এই অপরাপর ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন জনজাতির মানুষরা ‘কৌতূহলপ্রদ’ ‘দর্শনীয়’ ‘অতীতের প্রদর্শনযোগ্য অবশেষ’ হিসাবে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে নির্ধারিত স্থান পেতে পারে যদি তারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন চর্চা ও বিকাশের অধিকার দাবি না করে ‘জাতীয়’ ভাষা-সংস্কৃতি সমূহের আধিপত্য মেনে নেয়, নতুবা তাদের ‘রাষ্ট্রদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে তাদের অস্তিত্বের অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। ইউরোপের দেশগুলোর জাতি-রাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে রাশিয়া বা চিনের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বা উন্নয়নশীল দেশের জাতিরাষ্ট্র—এই আধিপত্য-নির্মাণের প্রবাহ বয়েই চলেছে।

বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। জাপানে তখন জাতীয়তাবাদের তুমুল জোয়ার উঠেছে। সেখানে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> ইউরোপের মাটি থেকে গজিয়ে ওঠা যে রাজনৈতিক সভ্যতা এখন গোটা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলছে আগ্রাসী আগাছার মতো, তার ভিত্তি হলো অপরকে বাদ দেওয়ার প্রবণতা।

> তা সবসময় অপরদের উপর সতর্ক নজরদারি চালায় যাতে অপরদের দূরে ঠেলে রাখা যায় বা একেবারে নিকেশ করে দেওয়া যায়। সর্বখাদক ও নরখাদক প্রবণতা আছে তার মধ্যে। অপর মানুষদের সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও তাদের গোটা ভবিষ্যতকেই গ্রাস করার চেষ্টা করে এই রাজনৈতিক সভ্যতা। তা সবসময় আশঙ্কা করে যে অপর কোনো জাতি বুঝি তাকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠে গেল আর সেই সম্ভাবনাকে সে ‘মহা বিপদ’ বলে চিহ্নিত করে। এই চিরসন্দিগ্ধ চিরআশঙ্কিত মানসিকতা চায় তার সীমানার বাইরের মহত্ত্বের যে কোনো লক্ষণকে দমন করতে। দুর্বলতর জাতির মানুষদের দুর্বলতার বন্ধনেই আটকে রাখতে জোর ফলায়।... তা শক্তিধর কারণ তা তার সমস্ত বল একটাই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করে, যেন-বা কোনো কোটিপতি তার আত্মাকে বেচে অর্থ সংগ্রহ করছে। কোনো আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার বাধে না, নির্লজ্জভাবে তা মিথ্যার জাল বুনে চলে। মন্দিরে মন্দিরে তা লোভ-লালসার বিপুলাকার মূর্তি স্থাপন করে, সেই মূর্তিপুজো ও তজ্জনিত বহু ব্যয়সাপেক্ষ জাঁকজমককে ‘দেশপ্রেম’ নাম দিয়ে সে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই।... অনির্দিষ্টকাল জুড়ে যদি এমনটাই চলতে থাকে, নির্বুদ্ধিতাকে অভাবনীয় সীমায় নিয়ে গিয়ে যুদ্ধাস্ত্র জাহির চলতে থাকে, যন্ত্র ও গুদামঘর তার আবর্জনা, ধোঁয়া আর কদর্যতা দিয়ে ঢেকে দেয় সুন্দর ধরণী, তাহলে এক আত্মহননের বহুসবে সব শেষ হয়ে যাবে।
>
> (রবীন্দ্রনাথ ভাষণটা ইংরেজিতে দিয়েছিলেন, যা ১৯১৭ সালে ‘Nationalism’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে নির্বাচিত অংশটিকে আমি বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করলাম।)

জাপানের মানুষরা সেই সময় রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবার্তায় গুরুত্ব দেয়নি। শোনা যায় যে তাদের বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এর জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর রুষ্ট হয়ে তাঁকে ‘ধ্বংসের কিনারে দাঁড়ানো পরাজিত জাতির প্রতিনিধি’ বলে উপেক্ষার ব্যঙ্গোক্তি করেছিল। গোটা বিশ্ব জুড়ে অবশ্য তখনও ভাষার বিলুপ্তি, জীব-পশু-পাখির প্রজাতির বিলুপ্তি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণের উপযোগী পরিবেশের ধ্বংসপথে যাত্রা আজকের মতো সর্বব্যাপী চেহারা নেয়নি। আজও কি আমরা এই সতর্কবার্তাকে কোনো গুরুত্ব দেব না? জাতি-রাষ্ট্রের কারাগারের উঠোনে প্রগতির বৃন্দবাদনের তালে এখনও কি আমরা কুচকাওয়াজ করে ফিরব? নাকি সেই উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে সব ভাষার, সব সংস্কৃতির অস্তিত্বের সমানাধিকার, বিকাশের সমানাধিকার নিশ্চিত করার মতো বহুত্ববাদী সমাজ-রাজনৈতিক পরিসর গঠনের চেষ্টা করব? আত্মহননের বহুৎসব নাকি বহুত্বের পরিসর—মূর্ত কিছু দৃষ্টান্তকে বিচার করে দেখা যাক আত্মহননের বিরুদ্ধে ও বহুত্বের পক্ষে কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে কিনা। কোনটা আমাদের অভীষ্ট?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পড়শি যখন যম

ইংরেজরা একসময় বড়াই করে বলত যে তাদের সাম্রাজ্যের উপর সূর্য অস্ত যায় না। উল্টোদিক থেকে তো বলা যায় যে তাহলে নিশিও কখনও বিদায় নেয় না। সদা খরসূর্যে দগ্ধ, সদা নিশান্ধকারে নিমজ্জিত এই বিপুলায়তন সাম্রাজ্যে অগণন জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজাচারের উপর আগ্রাসনেও তাই কখনও ছেদ পড়ত না।

এহেন ইংরেজদের পড়শি জাতি হল ওয়েলশরা। ইংলন্ডের সঙ্গে ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডকে সংযুক্ত করেই ব্রিটেনের মূল ভূমিখণ্ড, যা ইংরেজ জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে। ওয়েলসের ভাষা ওয়েলশ, আয়ারল্যান্ডের ভাষা আইরিশ আর স্কটল্যান্ডের ভাষা স্কটিশ বা গ্যেলিক। ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের পরম্পরাগত ধারায় সংস্কৃতি ও সমাজরীতির বৈচিত্র্য ও বহুত্বও প্রচুর। গ্রেট ব্রিটেন স্বরূপ একটি রাষ্ট্রিক কাঠামোয় বাঁধার ঐতিহাসিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা আধিপত্যকারী ভাষা হিসেবে এইসব অঞ্চলগুলোর ভাষাকে প্রতিস্থাপিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে। একইসঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও সমাজরীতিকে উচ্ছিন্ন করে একবগ্গা ব্রিটিশত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছে। ধর্ম, দৈনিক জীবনযাপনপ্রণালী, পেশা, বিনোদন—সব ক্ষেত্র জুড়েই এই আধিপত্যনির্মাণ সক্রিয় থেকেছে। ওয়েলশ, আইরিশ ও স্কটিশ মানুষজনের একটা বড় অংশ এই আধিপত্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের মনে ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচার নিয়ে হীনতাবোধ এবং তারা আরও বেশি বেশি করে ইংরেজ হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আবার এই জনগোষ্ঠীগুলোর ভিতর থেকেই জন্ম নিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে প্রতিরোধ—ভাষিক প্রতিরোধ, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, রাজনৈতিক প্রতিরোধ। আধিপত্যনির্মাণ ও প্রতিরোধের এই যুগপৎ ক্রিয়া দীর্ঘ ইতিহাসপর্যায় পেরিয়ে বহু সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে আজও বিভিন্ন সম্ভাবনা ও প্রবণতা নিয়ে ভীষণ জীবন্ত।

ওয়েলশ, আইরিশ, স্কটিশ— এই তিন ক্ষেত্রে আধিপত্যনির্মাণ ও প্রতিরোধের ইতিহাস নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে স্বতন্ত্র। তাই পৃথক মনোযোগ দিয়েই তাদের বোঝার চেষ্টা সমীচীন হবে। এর পরের অধ্যায়ে আমরা ওয়েলশ জাতির অতিক্রম করা ইতিহাসপথকে কিছুটা নিবিড় নিরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছি।

উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে ওয়েলশ ভাষার রক্তক্ষরণ অব্যাহত থেকেছে। সামাজিক ব্যবহারের একের পর এক ক্ষেত্র শুকিয়ে এসেছে, ইংরেজি ভাষা দখল করে নিয়েছে সমাজ-পরিসর, ইংরেজি ভাষায় সরণের মধ্য দিয়ে তার বাচকসংখ্যা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে, সমাজ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রবণতাও ইংরেজি ভাষার আধিপত্যবিস্তারের সহায়ক হয়েছে। ‘আধুনিকতা’ ও ‘উন্নতি’-র পরিপন্থী বলে চিহ্নিত হয়ে ওয়েলশ ভাষার সামাজিক মানেরও পতন ঘটেছে। এই নিরন্তর যমযাতনার মাঝেও ওয়েলশ ভাষাকে ঘিরে প্রতিরোধের উদ্যোগ, পুনরুজ্জীবনের লড়াই দানা বেঁধেছে। সেই ওঠা-পড়ার বন্ধুর যাত্রার সঙ্গেই এবার আমরা পরিচিত হব।

তৃতীয় অধ্যায়

যমের সঙ্গে যুদ্ধ : ওয়েলশদের অভিজ্ঞতা

প্রথম পর্ব

সম্মানহানি ও সংকোচনের উনিশ শতক

এই পর্বের শুরুর একটি সময় ধরা যাক। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ। সেই সময়ে ওয়েলস[১]-এর ছয় লাখের কিছু বেশি জনসংখ্যার মধ্যে পাঁচ লাখের বেশি মানুষই কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতে পারত। বাচিক ভাষা হিসাবে ইংরেজির উপস্থিতি তখন অল্প কিছু শহুরে অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় এতটাই সীমাবদ্ধ ছিল যে তা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। কৃষক-উপকথা, প্রবাদ ও প্রবচনে সমৃদ্ধ, ঐতিহাসিক স্মৃতির সাধারণ উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ ওয়েলশ ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ তখন বড় জনগোষ্ঠীর যৌথ ব্যবহারের জমিতে দাঁড়িয়ে প্রাণবন্ত ছিল।

এবার এই পর্বের শেষ হওয়ার পর একটি সময় ধরা যাক। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় ২৪ লাখ ৪২ হাজার তখন ওয়েলস-এর জনসংখ্যা। তার মধ্যে ৫৬ শতাংশ মানুষ ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পারে না। কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষাতেই কথা বলে এমন মানুষ মোটে ৮.৭ শতাংশ। শুধু বাচক সংখ্যার নিরিখে নয়, সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রেও ওয়েলশ ভাষার অবস্থা খুব করুণ। ওয়েলশ ভাষা তখন অশিক্ষিত পশ্চাৎপদদের ভাষা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে, 'আধুনিকতা'-র আকাঙ্ক্ষীরা তাকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেছে।[২]

একশ বছরের মতো সময়ে ওয়েলশ ভাষার অবস্থার এত বড় পরিবর্তন কীভাবে ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ওয়েলস-এর তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

প্রতিবেশী যখন 'প্রভু'

১৫৫৩ সালের এক চুক্তির মধ্য দিয়ে ওয়েলস ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনস্থ হয়। উনিশ শতক অবধি ওয়েলসকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীন একটি রাজশাসিত

অঞ্চল (প্রিন্সিপালিটি) বা অধীনস্ত উপনিবেশ হিসাবে দেখা হতো। ব্রিটেনে রাজপদের উত্তরাধিকারীকে 'ওয়েলশ'-এর শাসক হিসাবে 'প্রিন্স/প্রিন্সেস অফ ওয়েলশ' বলার রেওয়াজ আজও চলে আসছে। প্রতিবেশী ইংরেজরা ওয়েলশ-এর অধিবাসীদের থেকে নিজেদের বহুগুণ 'উন্নত' ও 'সুসভ্য' বলে মনে করত। ইংরেজ দৃষ্টিতে ওয়েলশ মানুষরা ছিল 'আদ্যিকালের অসভ্য চাষা' (primitive peasants)। ওয়েলশ ভাষাকে ইংরেজরা বলত 'patois', যার অর্থ ইতরজনদের ভাষা। ইংরেজদের মত ছিল যে ওয়েলশ ভাষা নাকি 'উদ্ভট' (absurd)। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রধান ইংরেজরা এভাবে 'ক্ষমাঘেন্না'-র চোখে ওয়েলশদের দেখত।

উনিশ শতকে এসে একটা বদল ঘটল। 'ইতর অসভ্য' ওয়েলশদের আর ক্ষমাঘেন্না করে তাদের মতো ছেড়ে রাখা যায় না, ওয়েলশদের 'সভ্য' করে তুলতে হবে এবং তার দায় ইংরেজদেরই—ইংরেজরা তাদের এই 'মহান কর্তব্য' পালনে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণ ওয়েলস-এর কয়লাখনি অঞ্চলে ওয়েলশ শ্রমিকশ্রেণির দুটি বড়ো আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম ভাগে। একটি হল 'মেরথির গণবিদ্রোহ' (Merthyr Revolt) এবং অন্যটি 'চার্টিষ্ট আন্দোলন'-এর অংশ হিসাবে এক বিপুল গণ আন্দোলন। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইংরেজ শাসককুলের চোখে এইগুলি ছিল 'প্রশাসনিক দুর্যোগ'। এইরকম দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর পন্থা নির্ণয়ের জন্য সরকারি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি তার পেশ করা প্রতিবেদনে দক্ষিণ ওয়েলস-এর কয়লাখনি শ্রমিকদের মানসিকতায় 'ধ্বংসাত্মক, অরাজকতামূলক ও সভ্যতাবিরোধী' ঝোঁকের প্রাবল্য চিহ্নিত করে এবং প্রতিবিধান হিসাবে 'অসভ্য' ওয়েলশদের সভ্য করার জন্য 'ইংরেজায়িত' (anglicize) করার নিদান হাঁকে। 'সভ্য' 'ইংরেজায়িত' ওয়েলশ তৈরির প্রধান উপায় হিসাবে ওয়েলশদের ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তোলার কথা ভাবা হয়। কীভাবে তা করা যাবে তার সুলুকসন্ধানের জন্য ওয়েলশ-এর শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধানকারী প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে তিনজন ইংরেজ ব্যারিস্টারকে নিয়োগ করা হয়, যারা ১৮৪৭ সালে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই তিন ইংরেজ ব্যারিস্টারের নাম আর ডাবলু লিংগেন, জে সি সিমনস এবং এইচ ভন জনসন। বয়সে নবীন হলেও এঁদের ইংরেজ জ্যাত্যাভিমান ছিল প্রচণ্ড এবং তদনুযায়ী ওয়েলশদের ঘৃণার চোখে ছোট করে দেখার প্রবণতা ছিল তীব্র। এ সবই তাদের প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তারা ওয়েলশ মানুষদের বর্ণনা করেছেন নোংরা (squalid), নীতিহীন (immoral), নষ্ট (degraded) মানুষ হিসাবে, যাদের

অদ্ভুত ভাষা (peculiar language)-ই হচ্ছে তাদের প্রগতি (progress)র পথে বাধা। সুচতুরভাবে তারা বর্বরতা/সভ্যতা (barbarism/civilization), অন্ধকার/আলো (darkness/light), নীচ/মহান (low/high)—এহেন বিরোধমূলক দ্বৈতের কাঠামোয় মানবপ্রকৃতি, সমাজ ও ইতিহাসকে বিন্যস্ত করেন এবং ওয়েলশ ভাষাকে 'বর্বরতা, অন্ধকার, নীচতা'-র ধারক ও ইংরেজি ভাষাকে 'সভ্যতা, আলো, মহত্ত্ব'-র ধারক হিসাবে চিহ্নিত করেন। ওয়েলশ ভাষার বর্ণনায় বারবার তারা ব্যবহার করেছেন 'অনিষ্টকর' (evil), 'বাধাস্বরূপ' (barrier), 'প্রতিবন্ধক' (impediment), 'পিছে টেনে রাখে এমন' (drawback) কথাগুলো। অন্তিম সিদ্ধান্ত হিসাবে তারা ওয়েলশ বাচকদের মুখ থেকে ওয়েলশ ভাষা দূর করে তাদের ইংরেজি ভাষার বাচক করে তোলার উপর জোর দেন।[৩]

উপরোক্ত ১৮৪৭ সালের প্রতিবেদন ওয়েলস-এর ইতিহাসে 'নীল বইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই নাম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সমকালে ওয়েলশ জনসাধারণের মধ্যে এই প্রতিবেদন অপমানিত ও প্রতারিত হওয়ার বোধ তৈরি করেছিল। কিন্তু ১৮৫০-এর পর থেকে ওয়েলশ-এর মধ্যে, আয়তনে ছোট হলেও, একটি প্রভাবশালী, 'সফল' পেটি বুর্জোয়া গোষ্ঠী ক্রমশঃ গড়ে ওঠে যারা ওই প্রতিবেদনের সুরেই সামাজিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার নিদারুণ গুরুত্বের পক্ষে ওকালতি করতে শুরু করেন। এদের একজন ছিলেন জন জেনকিনস, ১৮৬১-র নিউকাসল প্রতিবেদনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে ওয়েলশ ভাষা হল 'অতীতের ভাষা, ভবিষ্যতের ভাষা নয়।' যে সমস্ত ওয়েলশরা এই সময়ে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আত্মগ্লানির বোধ থেকে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি অনুকরণ করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাদের মুখপাত্র হিসাবে ধরা যায় ম্যাথু আর্নল্ড-কে। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত 'কেল্টিয় (Celtic) সাহিত্য অধ্যয়ন প্রসঙ্গে, নামক প্রবন্ধে ম্যাথু আর্নল্ডের এই বিষয়ে বক্তব্য প্রচুর প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিম ইওরোপের ওয়েলস, আয়ার্ল্যান্ড ইত্যাদির প্রাচীন অধিবাসীদের 'কেল্ট' জাতি বলা হয়, 'কেল্টিয় সাহিত্য' বলতে সেইসব জাতিদের সাহিত্য। কেল্টিয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে আর্নল্ড উপরোক্ত প্রবন্ধে 'অসভ্য' (barbaric) হিসাবে দেখেছিলেন। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে—(১) 'প্রগতির নির্দয় এগিয়ে চলা' কেল্টিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে 'পরিত্যাজ্য' করে তুলেছে, (২) কেল্টিয়দের 'জাতিয় চরিত্রে' 'ধৈর্য, মানসিক সুস্থতা ও অবিচলতা' (patience, sanity and steadiness)-র খুবই অভাব, তাই তাদের পক্ষে স্বশাসন অর্জন করা সম্ভবপর নয়, (৩) কেল্টিয়দের

অতীতচারী স্বভাবের জন্য তারা সর্বদা অন্যের অধীনস্থ ও প্রান্তীয়' (subordinate and margianl) অস্তিত্ব যাপন করবে।[৪]

ওয়েলশ-এ বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-উদ্গাতা ড. থমাস নিকোলাসও ছিলেন ম্যাথু আর্নল্ডের মতের লোক। 'ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব' ও তার 'রাজকীয় ভাষা'-র গুণমুগ্ধ হিসাবে তিনি ওয়েলশ-ভাষী দেশবাসীর 'সামাজিক প্রতিবন্ধকতা' তুলে ধরে বলেছিলেন:

> "...প্রাচীন সেকেলে প্রথাকে আঁকড়ে থাকা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বাহন কখনও হতে পারবে না এমন এক কথ্যভাষাকে আঁকড়ে থাকার অন্ধতা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছে, তার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকার বদলে অনেক ভালো ইংলন্ডের মেধা ও কর্মশক্তি, সম্মান ও সম্ভ্রম-এর অংশ হওয়ার চেষ্টা করা...। ইংলন্ডের আন্তরিক জীবনীশক্তি, সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্টের লক্ষ্যে তার দৃঢ় অচল ধাবমানতা ওয়েলস জুড়ে স্পন্দিত হোক; চিন্তা, শিল্পকলা ও জাতীয় চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুকৃত হোক; অচিরেই যে ভাষা গোটা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলতে চলেছে, কেবলমাত্র যে ভাষার মধ্য দিয়েই ইংলন্ডের জীবন ও সভ্যতার বীজ ওয়েলস-এর বুকে রোপণ করা যেতে পারে, সেই ইংরেজি ভাষা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ুক।"[৫]

আর্নল্ড ও নিকোলাস-দের আরেকজন বিখ্যাত সহযাত্রী ছিলেন হুগ আওয়েন (Hugh Owen)। তিনি ওয়েলশ-এর ঐতিহ্যমণ্ডিত 'আইসটেডফদ' উৎসব থেকে ঐতিহ্যকে বিদায় দিয়ে আধুনিকীকরণ'-এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আইটেডফদ ওয়েলশ-এর জাতীয় উৎসব—কবিতা, গান, নাটক, বক্তৃতা-র এক খোলামেলা উৎসব যা বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকভাবে হওয়ার পর কেন্দ্রীয়ভাবে কার্ডিফ-এ হয়। এই উৎসবে ওয়েলশ ভাষা ও ওয়েলশ সংস্কৃতির প্রভাব ওয়েলস-এর আধুনিকীকরণ ও অগ্রগতির পরিপন্থী হচ্ছে বলে বিচার করে হুগ আওয়েন উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাতে আইটেডফদ-এর সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত অংশ ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হয় ও ইংরেজের মুক্ত-বাণিজ্য উদ্যোগের (free-enterprise commercialism) আদর্শকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

এইভাবে ওয়েলস-এর প্রভাবশালী অভিজাত একটি অংশ ইংরেজ শাসককুলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতিকে আবর্জনা স্বরূপ বর্জন করার পক্ষে মতামত সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এর প্রভাব পড়ে খুব বেশি। 'শিক্ষিত' হওয়ার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা, আদবকায়দা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ/আয়ত্ত করতে পারা সমার্থক হয়ে ওঠে। ১৮৮৬-৮৭ সালে 'রয়াল কমিশন'। অন এডুকেশন'-এর সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে টি মারচান্ট উইলিয়ামস (T.

Marchant Williams) বলেন যে ইংরেজদের সামনে ওয়েলশরা জড়সড় হয়ে গুটিয়ে থাকে কারণ তারা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের ভাষা 'তাদের একটি দোষ বা অপারগতা' (a disadvantage and a reproach to them)।[৬]

ইংরেজ বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকদের পক্ষ থেকে ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির 'অপদার্থতা' প্রমাণ করার উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালু ছিল—তাদের সংকীর্ণ জাতিগর্বী মানসিকতাকে তারা 'আধুনিক বিজ্ঞান'-এর 'নিরপেক্ষ মোড়কেও হাজির করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। যেমন ধরা যাক বিখ্যাত ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস-এর কথা। ১৯০৪ সালে হ্যাভলক এলিস তার দীর্ঘদিন ধরে করা এক সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। এই সমীক্ষায় তিনি 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'-তে মাপতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলের মেধা/প্রতিভা (genius) উৎপাদনী শক্তি। এই উৎপাদনী শক্তির এক মাপকও তিনি মাথা খাটিয়ে বার করেছিলেন। সেই মাপকের হিসাবে ইংলন্ডের উৎপাদনী শক্তি ৬৫৯ আর ওয়েলশ-এর মাত্র ২৮ । তার বিচারে ইংলন্ডের ৪৪.২% লোকই মেধাবী/প্রতিভাধর (genius), যেখানে ওয়েলশ-এর মাত্র ৩.১% সেই পর্যায়ে পড়ে। হ্যাভলক এলিস এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ওয়েলেস-এর তুলনায় ইংলন্ডের এই বিপুল মেধা-সৃজনী উৎপাদনশীলতার কারণও চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, সভ্যতার মাধ্যম হিসাবেই বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য ওয়েলশ ভাষার কঠিনতা (the difficulty of a language not recognised as a medium of civilisation) হলো ওয়েলশ-এর মেধা-উৎপাদনে ব্যর্থতার কারণ।[৭]

উনিশ শতকে ক্রমবিস্তারমান সাম্রাজ্যের প্রভু হিসাবে আত্মশ্লাঘায় টইটম্বুর ইংরেজরা এভাবে তাদের প্রতিবেশী ওয়েলশ-এর ভাষা ও সংস্কৃতিকে 'আবর্জনা' বলে নস্যাৎ করার জন্য মতবাদিক প্রচার চালিয়েছিল এবং ওয়েলশ-এর মধ্যে একটি ছোট কিন্তু প্রভাবশালী পেটি-বুর্জোয়া অংশ 'প্রভু'-র গৌরবের ভাগ পাওয়ার আশায় তাদের অনুগামী হয়েছিল। এই মতবাদিক প্রচারের ভিত্তিকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ওয়েলস-এর সমাজ-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ইংরেজায়নের উপযোগী করে সংগঠিত করেছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসন

১৮৪৭-এর 'নীল বইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা' হিসাবে পরিচিত কমিশনারদের প্রতিবেদনকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে ব্রিটিশ সরকার ক্রমশ ওয়েলস-এর

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, বিষয়বস্তু নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহ অবধি সমস্ত কিছু নিজেদের ক্ষমতাধীন করে। এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবহার করে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ওয়েলশ ভাষাশিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হয় ও ওয়েলশ ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়। ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ও ইংরেজি ভাষামাধ্যমে শিক্ষাকে বিকল্পহীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্কুলের শ্রেণিকক্ষে কোনো ছাত্র/ছাত্রী ওয়েলশ ভাষায় কথা বললে তাকে 'জঘন্য অপরাধ' (heinous cirme) হিসাবে ধরা হতো এবং তারজন্য শিক্ষক/শিক্ষিকারা কড়া শাস্তি দিতেন ছাত্র/ছাত্রীটিকে তার বদভ্যাস দূর করার জন্য। এইরকম বহু উদাহরণ ওয়েলশভাষীদের লেখা নানা স্মৃতিকথায় ছড়িয়ে আছে।[৮] ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সংস্কৃতিকেও গলাধঃকরণ করানোর চেষ্টা চলত। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর মানসিকতাকে অভ্যাসের মাধ্যমে রপ্ত করানোর জন্য 'সাম্রাজ্যের দিন' (Empire Day) পালনে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে সামিল করা হতো। সেই দিন সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের 'ইউনিয়ন জ্যাক' (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক)-এ সজ্জিত হয়ে এসে ইংরেজ রাজপরিবারের শুভকামনায় প্রার্থনা করতে হতো। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে ইংরেজদের জাতীয় নায়কদের কাহিনি তুলে ধরা হতো, ওয়েলশ-এর ইতিহাসের স্থান ছিল না। এমনকি ভূগোলের পাঠ্যসূচীতেও ইংলন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের মুখস্থ করতে হতো। সংবেদনহীন শিক্ষক/শিক্ষিকারা ওয়েলশ-ভাষী শিশুদের বাধ্য করত না-জানা ভাষা ইংরেজিতে না-বোঝা পড়া মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে, তার উপর আবার এই শিশুদের অনভ্যস্ত উচ্চারণের দোষত্রুটি নিয়ে হাসিঠাট্টা-গালমন্দ করত। খ্যাতনামা পুস্তক-আলোচক বব আওয়েন-এর স্মৃতিচারণ থেকে এই শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ফলাফল সম্পর্কে একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি। বব আওয়েন-এর জন্ম ১৮৮৫ সালে। তিনি যখন মেরিওনেথ-এর ল্যানফ্রথেন (Llanfrothen) স্কুল থেকে পাশ করে বেরোন, তাঁর বাসস্থান ওয়েলস-এর স্নোগোডিয়া অঞ্চলের ভূগোল তিনি জানেন না, কিন্তু ইংলন্ডের 'লেক ডিস্ট্রিক্ট'-এর ভূগোল তাঁর মুখস্থ। তাঁর শৈশব কেটেছে ওয়েলশ ভাষার অত্যন্ত কুশলী কবি রিস গখ এরিরি (Rhys Goch Eryri) এবং ডাফিডল নানমোর-এর জন্মস্থানের এলাকায়। অথচ তাঁদের কোনো কবিতা তাঁর পড়া হয়নি, শ্রেণিকক্ষে তাঁকে গলাধঃকরণ করানো হয়েছে 'নির্দয়, তৃতীয় শ্রেণির ইংরেজ কবিদের' (brutal, third-rate English poets) কবিতা।[৯]

১৮৮০-র দশকের মাঝবরাবর সামাজিক জীবন থেকে ওয়েলশ ভাষা মুছে-দেওয়ায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ সরকারি উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায় ওয়েলশভাষী কিছু বুদ্ধিজীবীর

উদ্যোগ 'ওয়েলশ ভাষা কাজে লাগানোর জন্য সমিতি' (The Society for Utilizing the Welsh Language) গড়ে ওঠে। এই সমিতি সরকারের উচ্চমহলে তদ্বির-তদারক করে ওয়েলশ ভাষাকে একটা পাঠ্যবিষয় হিসাবে কোথাও কোথাও চালু করতে পেরেছিল, যদিও শিক্ষার ভাষামাধ্যম হিসাবে একচেটিয়াভাবে ইংরেজিই ছিল। ফলত ওয়েলশভাষীদের ওয়েলশভাষা পড়ানো হতো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে, ওয়েলশ ভাষার পরীক্ষাও নেওয়া হতো ইংরেজি ভাষায়।

১৮৮৯-এর মধ্যবর্তী শিক্ষা আইন (Intermediate Education Act, 1889)-এর হাত ধরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এমন কিছু স্কুলকে 'আধুনিক স্কুল' তকমা দিয়ে চালু করা হল, যেখানে প্রথম ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ফরাসি পড়ানো হতো, ওয়েলশ ভাষার কোনো ঠাঁই ছিল না। মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহলে বলা হতো যে এইসব স্কুল থেকে পাশ করে বেরোলে দেশের বাইরে উচ্চ রোজগারের শিক্ষক, চিকিৎসক বা পেশাজীবী-র চাকরি বাঁধা! ওয়েলশ ভাষা, ওয়েলশ সংস্কৃতি ও তারপর ওয়েলশ দেশটিকেও পরিত্যাগ করে 'আত্মোন্নতি'-র পথ তুলে ধরা হতো। ১৮৯৩-য়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (National Federal University)-ও শিক্ষার একমাত্র ভাষামাধ্যম এবং একমাত্র প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে নির্ধারিত করা হয়েছিল।

কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা নয়, সমস্ত ওয়েলস জুড়ে যত বিকশিত হয়েছে রেলপথ, ডাকব্যবস্থা, বেতারসংযোগে, বাজারের জন্য গণউৎপাদনের বিভিন্ন উপায় ও তা বিক্রির ব্যবস্থা, ততই কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার নিয়ন্ত্রণকে আরও দৃঢ় করেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রশাসন ভাষা, সংস্কৃতির ব্যাপারে বৈচিত্র্য সম্পর্কে বড়ই অসহিষ্ণু, তার অপরিবর্তনীয় নির্ধারণ হলো এই যে, 'ইংলন্ড ও ওয়েলস অভিন্ন এবং রাণীর ইংরেজি (Queen's English)-ই হলো অভিন্ন প্রশাসনের ভাষা।'

এই একতরফা আক্রমণের মুখে ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির কী অবস্থা হয়েছিল? ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির পালনক্ষেত্র ছিল যে সামাজিক ভূমি সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে বোঝার চেষ্ট করা যাক।

ওয়েলশ ভাষার সামাজিক ক্ষেত্র

(ক) গ্রামাঞ্চল

উনিশ শতকের শুরু থেকে ওয়েলশ ভাষার সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল ওয়েলস-এর গ্রামাঞ্চলগুলো। ওয়েলস-এর উত্তর ও মধ্য অঞ্চল

গ্রাম-প্রধান, শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলো প্রধানত দক্ষিণ ওয়েলস-এ কেন্দ্রীভূত। উনিশ শতক এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলস-এর জনসংখ্যা যেমন দ্রুতহারে বেড়েছিল,[১০] তেমনই জনসংখ্যার বণ্টনে শহর-গ্রাম বৈষম্য ক্রমশঃ বেড়ে গিয়েছিল। ওয়েলস-এর দক্ষিণ অঞ্চলের শিল্পাঞ্চলগুলোয় জনবসতি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং ১৯১১-তে এসে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মূল দুটি শিল্প-এলাকা গ্লামোরগান ও মনমাউথসায়ার-এ কেন্দ্রীভূত। ওয়েলস-এর বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ক্রমান্বয়ে তার জন্যসংখ্যা, বিশেষ করে তরুণ জনসংখ্যা হারাতে থাকে। বিশেষত ১৮৭১-র পর থেকে ক্রমাগত শহরমুখী যাত্রার ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। এই জনসংখ্যা বণ্টনের পরিবর্তন ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কী প্রভাব ফেলেছিল দেখা যাক।

ওয়েলস-এর বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল 'ওয়েলস-র অভ্যন্তর' (Inner Wales) নামে পরিচিত ছিল ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির দৃঢ় উপস্থিতির জন্য। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়েলশ ভাষাই নিত্য ব্যবহৃত হতো। মাঠে, হাটে বা মেলায় ওয়েলশই ছিল প্রায় একমাত্র ভাষা। ফসল, পোষ্যজীব, চাষের উপকরণ ও গাছপালার নাম ওয়েলশ ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। আঞ্চলিক কথনশৈলী ও প্রবাদপ্রবচন বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও ভাষা-ব্যবহারকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। ওয়েলশ ভাষা ব্যবহার ও ওয়েলশ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় অবস্থিতির এক সমৃদ্ধ বোধ অধিবাসীদের মধ্যে জীবন্ত ছিল।

দুর্ভিক্ষ, ফসলের মড়ক, অস্থিরতা, দাঙ্গা গ্রামীণ সমাজজীবনে নিরন্তর খিঁচুনিব্যাধির জন্ম দিচ্ছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। অল্প গুটিকয় ভূস্বামী পরিবারের হাতে জমি ও অন্যান্য সম্পদ ভীষণ কেন্দ্রীভূত ছিল—তারাই 'অভিজাত' হিসাবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছিল। কৃষক, ভূমিহীন মজুর ও কারিগরদের জীবন ছিল দৈন্য ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। যাজক ও ভূস্বামীদের যে কর কৃষক-কারিগরদের দিতে হতো, তা বিলোপের জন্য ও ভূস্বামীদের সমাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সাধারণের আন্দোলন (antitithe campaign, disestablishment campaign) উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামে জন্ম নিচ্ছিল এক ভাষিক বিভাজনও। ভূস্বামী অভিজাতবর্গের কেউ কেউ ওয়েলশ ভাষা বলায় ও চর্চা করায় উৎসাহ দেখালেও, তা ছিল নিতান্ত ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে গ্রামীণ ভূস্বামী অভিজাতবর্গ শহুরে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের মতোই ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও ইংরেজি চর্চা করাকে সামাজিক সোপানতন্ত্রে উপরে ওঠার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং 'ওয়েলশ ভাষা পশ্চাৎপদতার সঙ্গে যুক্ত

ও পরিত্যাজ্য' এই মতাদর্শিক প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রশাসনে নিযুক্ত ইংরেজি-ভাষী উচ্চপদস্থদের ভাষাদম্ভ ও ওয়েলশ ভাষার প্রতি ঘৃণা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করা এই গ্রামীণ অভিজাতদের মধ্যেও। অন্যদিকে গ্রামীণ কৃষক, ভূমিহীন মজুর ও কারিগররা ছিলেন প্রায় পুরোটাই ওয়েলশভাষী। বেরিয়াহ গুইনফে ইভানস (Beriah Gwynfe Evans) এই সময়ের গ্রামীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছেন :

> সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল যে ওয়েলশ ভাষা হল কাঠ-চেরাইকারীদের ভাষা, জলবাহকদের ভাষা, শ্রমের ভাষা, ভারবাহকদের ভাষা, কষ্ট ও অভাবের ভাষা; আর অন্যদিকে ইংরেজি হলো তাদের ভাষা যারা কদাকশ্চিৎই শ্রম করে অথচ মোটা মাইনে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে।[১১]

ভূস্বামী অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সাধারণজনের যে সম্মেলক ডাক এই সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা হলো : 'একটি দেশ তার অভিজাতবর্গের চেয়ে অনেক বড়' (Trech gwald nag arglwydd)। এই সম্মেলক ডাকেও ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত।

১৮৭১-এর পর থেকে ক্রমশ শহর ও শিল্পাঞ্চলমুখী অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা হারালেও, এমনকি ১৯১১ সালে এসেও দেখা যায় যে উত্তর ও পশ্চিম ওয়েলস-এর গ্রাম-প্রধান কাউন্টিগুলোতে (অ্যাংলেসে, কেরনারফনশায়ার, মেরিওনেথ, কারডিগানশায়ার ও কারমারথেনশায়ার)-এর অধিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশই ওয়েলশ ভাষার বাচক। ওয়েলশ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না, এমন বাচকদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট :

কাউন্টির নাম	কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষার বাচক মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে
অ্যাংলেসে	৩৭.৩%
কেরনারফনশায়ার	৩৬.৪%
মেরিওনেথ	৩৭.৫%
কারডিগানশায়ার	৩৪.৮%
কারমারথেনশায়ার	২০.৮%

গোটা উনিশ শতক ধরে গ্রামীণ ওয়েলশ এইভাবে ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির সামাজিক ক্ষেত্র বজায় রেখেছিল।

(খ) শ্রমিক-প্রধান অঞ্চল

গ্রামীণ ওয়েলস থেকে যে বিপুলসংখ্যক মেহনতী মানুষ নতুন জীবিকার খোঁজে দক্ষিণ ওয়েলস-এর শিল্পাঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছিল, তারা বয়ে এনেছিল তাদের ভাষাও। ১৯১১-র জনপরিসংখ্যানের হিসাব থেকে দেখা যায় যে দক্ষিণ ওয়েলস-এর মূল কয়লাখাদান অঞ্চল গ্লামোরগান-এ ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা ৩,৯৩,৬৯২, যা উপরোক্ত পাঁচটি গ্রামীণ কাউন্টির সম্মিলিত ওয়েলশ-বাচকসংখ্যার থেকেও বেশি! গ্লামোরগান ও মনমাউথশায়ার-এর কয়লাখাদান অঞ্চলে গ্রামীণ ওয়েলস ছাড়াও শ্রমিক এসেছিল ইংলন্ড, আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড থেকেও। ফলে বিভিন্ন ভাষার উপস্থিতি ও মিশ্রণ প্রক্রিয়া ছিল। কোথাও কোথাও আইরিশ, স্কটিশ বা ইংরেজ শ্রমিকরা নিজেদের পুঞ্জীভূত বসবাস গড়ে তুলে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির পরিবেশ রক্ষারও চেষ্টা করেছিল। এতদসত্ত্বেও ১৮৯০ অবধি ওয়েলশ ভাষাই শ্রমিক বসতিগুলোর প্রধান ভাষা ছিল। কয়লাখাদান অঞ্চলগুলোর শ্রমিকদের মুখে মুখে ওয়েলশ ভাষার এক বৈচিত্র্যপূর্ণ আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল কয়লাখনির কাজ ও জীবনকে বর্ণনা করতে। বিভিন্ন ধরন ও গুণমানের কয়লাকে বোঝাতে ৬২টি পদ ব্যবহৃত হতো—তার মধ্যে অঞ্চলগত বিভিন্নতাও ছিল। উত্তর-পূর্ব ওয়েলস-এর রসলানেরখ্রুগোয় (Rhosllannerchrugoy)-এর কয়লাখাদানের শ্রমিকরা তাদের তৈরি বিশেষ পদ, রূপক, রূপবন্ধ-এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[১৩]

১৮৯০-এর পর থেকে কয়লাখনি অঞ্চলের পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে সরকার, প্রশাসন ও মালিকদের সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনার ফলে। মেরথির গণবিদ্রোহ ও চার্টিষ্ট আন্দোলনকে ঘিরে কয়লাখাদান শ্রমিকদের আন্দোলন উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠার পর, তা দমন করা ও ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য সরকার-প্রশাসন যে শ্রমিকদের 'ইংরেজায়িত' করার পরিকল্পনা নিয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। কারখানার মালিক ও পরিচালকরাও শ্রমিকদের সংহতিকে ভাঙতে চাইছিল। এই সমস্ত উদ্দেশ্য থেকে সরকার-প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য বেশ কিছু আর্থিক সুবিধাদানের প্রকল্প চালু করে যেগুলোয় ইংরেজি ভাষার বাচকরাই অগ্রগণ্যতা পাবে। পাশাপাশি ইংরেজি থিয়েটার সিনেমা ও অন্যান্য মনোরঞ্জন, রাগবি-সকার প্রভৃতি খেলা যাদের মধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে—সেই সমস্তর আয়োজন করে শ্রমিকদের সেইদিকে আকৃষ্ট করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালু হয়, ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় বাচকতাকে শ্রমিক-নিযুক্তির জন্য একটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। এইভাবে শ্রমিকদের উপর চাপ তৈরি করা হয় ওয়েলশ ভাষা ছেড়ে ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করতে আর নয়তো দ্বিভাষিক

হিসাবে ওয়েলশ এর পাশাপাশি ইংরেজিকে গ্রহণ করতে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনে একমাত্র ভাষামাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষামাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হওয়াও ক্রমশ কয়লা-খাদানের শ্রমিক অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে শক্তিশালী করতে থাকে।

উনিশ শতকের ওয়েলস-এ কয়লাখাদান অঞ্চল ছাড়াও শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল উত্তর-পশ্চিম ওয়েলস-এর স্লেট পাথরের খাদানগুলোয়। এইখানকার শ্রমিকরা ছিলেন পুরোপুরিই ওয়েলশ-ভাষী। চালু বিশ্বাস ছিল যে ওয়েলশ ভাষায় দড় হয়ে উঠতে না পারলে স্লেট কাটার বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করে দক্ষ শ্রমিক হয়ে ওঠা যায় না। আঞ্চলিক আইসটেডফদ-এ নিয়মিতভাবে 'স্লেট কাটার কলাকৌশল'-এর উপর ওয়েলশ ভাষায় রচনা প্রতিযোগিতা হতো, এই শিল্পকে ওয়েলশ ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে মনে করা হতো। অন্যদিকে, এই সমস্ত স্লেট-খাদানের মালিক, ব্যবস্থাপক ও নিযুক্তকরা ছিলেন ইংরেজিভাষী, শ্রমিকরা তাঁদের এই ওয়েলশ ঐতিহ্যগত শিল্পে বহিরাগত বলে মনে করতেন। শ্রম-পুঁজি বিরোধে ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯০৩-এর মধ্যে বেথেসডার পেনরিহন খাদানে সংগঠিত হয় শ্রমিকদের এক বিপুল ধর্মঘট, যা ইতিহাসে 'y Streic Fawr' (বিরাট ধর্মঘট) নামে পরিচিত। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবিপত্রে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার পাশাপাশি ওয়েলশ ভাষা ও ওয়েলশ সংস্কৃতি চর্চার অধিকারের দাবিও স্থান পেয়েছিল। মালিক-প্রশাসন ও সরকারের সুসম্বন্ধ 'ইংরেজায়ন'-এর প্রচেষ্টা এইখানেও লাগু হয়েছিল।

(গ) অসম্মতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন

ইংলণ্ডের গির্জার প্রার্থনা পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজস্ব প্রার্থনা পদ্ধতি পালন করার মধ্য দিয়ে যে ধর্ম-আন্দোলন ওয়েলস-এ বিস্তারলাভ করেছিল তা অসম্মতিবাদী (nonconformist) আন্দোলন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডের গির্জার প্রার্থনা পদ্ধতি অনুসরণকারী গির্জাগুলোর স্যাকসন বিশপেরা গির্জার সমস্ত কাজকর্ম ইংরেজি ভাষায় করার ব্যাপারে অনড় ছিলেন কারণ তাদের চোখে ওয়েলশ ভাষা একটি 'অর্থহীন বন্ধ্যা' (barren nonsense) ভাষা। অন্যদিকে অসম্মতিবাদী অবস্থান থেকে সংগঠিত গির্জাগুলো ওয়েলশ ভাষা ব্যবহার ও ওয়েলশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণের উপর জোর দিয়ে গড়ে উঠেছিল।

জনসাধারণের উপর এদের কার কতটা প্রভাব ছিল? তা বিচার করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কারণ

১৮৫১ সালের জনসমীক্ষা বলছে যে প্রায় ৫০% ওয়েলসবাসী কোনো ধরনের গির্জাতেই প্রার্থনা করতে যেত না। এই গির্জায় অনুপস্থিতদের মধ্যে প্রায় গোটাটাই ছিল গ্রামাঞ্চলের সাধারণজন ও শহরাঞ্চলের নিচের তলার মানুষ। এঁদের ধর্মচর্চার পরম্পরাবাহিত নানা রূপ ছিল যা খ্রিস্টান ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলোর সঙ্গে যুক্ত নয়। এঁদের বাদ দিয়ে বাকি ৫০%-এর মধ্যে ইংলণ্ডের গির্জার অনুসারী গির্জাগুলোয় যেতেন মূলত 'ইংরেজায়ন'-এর মধ্য দিয়ে 'উন্নতির'-র পথ খোঁজা অভিজাতরা। বাকি বৃহৎ অংশ যেত অসম্মতিবাদী গির্জায়। ১৮৮৩ সালে ড. থমাস রিজ হিসাব করেছিলেন যে অসম্মতিবাদী রবিবারের পাঠশালায় (Non-conformist Sunday School) নিয়মিত হাজির থাকেন ৪,৬১,৪৬৮ জন, যা ওয়েলস-এর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০%। এই রবিবারের পাঠশালায় ওয়েলশ ভাষাই ছিল পাঠ্য ও পাঠের মাধ্যম। অসম্মতিবাদী গির্জায় ধর্মোপদেশ দেওয়া হতো ওয়েলশ ভাষায়, তাদের উদ্যোগে আঞ্চলিক আইটেডফদ-এ ওয়েলশ ভাষায় অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হতো, ওয়েলশ ভাষায় ধর্মীয় গান গাওয়ার উৎসব (cymanfaoedd canu), ওয়েলশ গানের চর্চা (ysgolin can) ইত্যাদি সংগঠিত করা হতো। সমাজতন্ত্রী ডেভিড থমাস এই সময়ে মন্তব্য করেন যে অসম্মতিবাদীদের উদ্যোগগুলো, বিশেষত রবিবারের পাঠশালাগুলো ব্যবস্থাপনার কুশলতার বিচারে আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে।

ক্রমশ অসম্মতিবাদী গির্জার প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তাদের সঙ্গে বয়ে আনে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে আত্মগ্লানি ও ইংরেজির প্রতি সমীহের মনোভাবও। এর আগে অবধি অসম্মতিবাদী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রা ছিলেন সব কৃষক-মজুর ঘর থেকে আসা ব্যক্তিত্ব—যেমন, জন ইলিয়াস ও ক্রিস্টমাস ইভানস (দুজনেই পরিচারকের কাজ করতেন), উইলিয়াম রিজ (রাখাল), আওয়েন থমাস (পাথরখাদানের কারিগর), জন জোনস (খাদানশ্রমিক)—তাঁদের গর্ব ছিল যে তাঁদের গির্জা ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ১৮৬০-এর দশকের পরবর্তী মধ্যবিত্ত অভিজাত অংশ থেকে আসা বহুজন নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন, যেমন—জে আর কিলবি জোনস্, লিউইস এডওয়ার্ডস, থমাস রিজ। তারা ক্রমশ প্রশ্ন তুলতে থাকেনঃ 'ওয়েলশ ভাষার কি কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে?' 'ওয়েলশ ভাষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা কি জগতে তাদের জায়গা করে নিতে পারবে?' প্রথম প্রথম এই সমস্ত নিয়ে বেশ বাদ-বিতর্ক হলেও ক্রমশ ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে আত্মগ্লানিতে ভোগা এই নতুন অংশের চাপে ইংরেজিতে প্রার্থনা, ইংরেজিতে

ধর্মোপদেশ ইত্যাদি শুরু হয়। অসম্মতিবাদীরা ওয়েলশ ভাষাসংস্কৃতি নিয়ে গর্বের অবস্থান থেকে সরতে সরতে এই অবস্থানে পৌছে যান যে 'ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি এখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের সামগ্রী, তাকে আঁকড়ে থেকে লাভ নেই।'[১৪]

লক্ষ্যনীয় যে অসম্মতিবাদী আন্দোলন তার এই অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলশ সমাজে তার গুরুত্ব হারায়—অসম্মতিবাদীদের ইংরেজি ধর্মোপদেশের থেকে 'খাঁটি' ইংরেজ গির্জার ইংরেজি ধর্মোপদেশই মধ্যবিত্ত-অভিজাতদের ইংরেজায়নের পক্ষে বেশি কার্যকরী মনে হয়েছিল হয়তো। ১৯১০ সাল নাগাদ দেখা যায় ইংলণ্ডের গির্জার অনুসারী গির্জা সংগঠনই ওয়েলস-এ বৃহত্তম ধর্মীয় সংগঠন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অনুগামী সংখ্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সমস্ত দিক থেকেই এবং তা ইংরেজায়নের প্রক্রিয়ারও গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হয়ে উঠেছে।

(ঘ) আইসটেডফদ

ওয়েলস-এর জাতীয় উৎসব আইসটেডফদ পরম্পরাগতভাবে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে তা আমূল পাল্টে যেতে থাকে। কার্ডিফ-এ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইসটেডফদ হয়ে ওঠে ইংরেজি ভাষা-ব্যবহার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অস্ত্র। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের আঞ্চলিক আইসটেডফদ-এ ওয়েলশ ভাষার গান ও কবিতা তখনও সজীব থাকলেও, ১৮৬১ থেকে শুরু হওয়া কার্ডিফের কেন্দ্রীয় আইসটেডফদ মধ্যবিত্ত ইংরেজ-ইংরেজি-অনুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। হুগ আওয়েন ও থমাস নিকোলাস-এর মতো উপযযাগিতাবাদীরা আইসটেডফদ-এর সাহিত্য প্রতিযোগিতা থেকে ওয়েলশ ভাষায় রচনাকে যথাসম্ভব বাইরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৬৪ সালে একটা প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছিল—'আইসটেডফদ-এ তিনটে জিনিস হওয়া দুষ্কর: সব প্রতিযোগীর সন্তুষ্ট হওয়া, ওয়েলশজাতীয়দের ওয়েলশ ভাষায় কথা বলা আর পপ ও জিনজার বিয়ার-এর আস্বাদ না নিয়ে কবিদের বাড়ি ফেরা।'[১৫]

ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি ধরে রাখা বনাম ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতি আয়ত্ত করা—আঞ্চলিক আইসটেডফদগুলি ছিল এই নিয়ে বিতর্কে মুখর। ১৮৭৬-এর রেক্সহ্যাম আইসটেডফদ-এর কথা ধরা যাক। সেখানে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সেন্ট আসাফ-এর বিশপ জোসুয়া হিউজেস ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজ প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা আর ওয়েলস-এর পক্ষে সম্ভব নয় এবং বলেছিলেন যে তিনি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন সেই ভবিষ্যতের দিকে যেদিন ওয়েলশ ভাষার প্রতিবন্ধকতা

আর ওয়েলসবাসীদের আটকে রাখবে না। তাঁর কথার জবাবে রেক্সহ্যাম-এর ভিকার রেভারেণ্ড ডি হাওয়েল বলেছিলেন যে তিনি ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি নিয়েই গর্বিত কারণ এমন আর কোনো দেশ আছে কিনা সন্দেহ যেখানে হাজার হাজার মেহনতী মানুষ সমবেত হয়ে ২,২৭০ জন প্রতিযোগীর সাহিত্য প্রতিযোগিতা উপভোগ করে—তাই ওয়েলশ ভাষা গুরুত্বে অন্য কোনো ভাষার চেয়ে কম নয়। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন এই স্লোগান তুলে: 'Oes y Byd ir laith Gymrareg!' (ওয়েলশ ভাষা চিরজীবী হোক।') উপস্থিত দর্শকদের বড় অংশ সোল্লাসে সেই স্লোগানে গলা মিলিয়েছিল। আর একটি আইসটেডফদ-এ বিতর্কে বলতে উঠলে ব্যাংগর-এর ডিন হেনরি টি এডওয়ার্ডস-কে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁর বক্তব্য রাখতে বলা হয়। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন যে তাঁর বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত, ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির মৃত্যু সমাসন্ন, সুতরাং আসুন সবাই মিলে পবিত্রভাবে তার মৃত্যুকালীন বিধি-সংস্কারগুলি পালন করি। এরপরে বলতে উঠে অ্যাংলেসে-র বিধায়ক মরগান লয়েড বলেন যে তাঁর দুঃখবাদী বন্ধু বৃথাই এতো নিরাশ হচ্ছেন, ওয়েলশ ভাষা ও ওয়েলশ জনগণ কেউই মরতে বসে নি, বরং ওয়েলশ ভাষা ক্রমশ তার হারানো জায়গা ফিরে পাচ্ছে। এই বিতর্ক ছিল নিরন্তর।[১৬]

১৮৪৭ থেকে ১৮৯৮-এর মধ্যে আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত আইসটেডফদ-এর সংখ্যা ৭ থেকে বেড়ে ৬৮-তে দাঁড়ায় এবং ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দনকে তারা ধরে রাখে।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় এসেই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এই প্রশ্ন : ওয়েলশ ভাষা কি বেঁচে থাকবে, না কি ইংরেজির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে তার মৃত্যু অবধারিত?

দ্বিতীয় পর্ব

সংকট ও সংগ্রামের বিশ শতক

বিশ শতক যত এগোতে থাকে ইংরেজিই হয়ে ওঠে ওয়েলস ভূখণ্ডে ভাষিক বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা, প্রশাসনের ভাষা, রাজনৈতিক তদ্বির-তদারকের ভাষা, এমনকি বিনোদন ও খেলার জগতেরও ভাষা। ওয়েলশ ভাষা ক্রমশ একটার পর একটা সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে, বাচকসংখ্যাও দ্রুত কমতে থাকে। বিশ

শতক জুড়ে এই ক্রমাবনতি ও ক্রমঘনায়মান সংকটের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শতকের দুই পাড়ের দুটো ছবি থেকে:

প্রথম ছবি: ১৯০১-এর ওয়েলস প্রদেশের জনসমীক্ষায় দেখা যায়---

ক) ওয়েলশ ভাষার বাচক সংখ্যা: ৯,২৯,৮২৪ (মোট জনসংখ্যার ৪৯.৯%)।

খ) কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষারই বাচক এমন জনের সংখ্যা ২,৮০,৯০৫ (মোট ওয়েলশ-বাচক-সংখ্যার ৩০.২%)।

গ) কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষার বাচকরা 'Y Fro Gymraeg' বলে পরিচিত উত্তর ও মধ্য ওয়েলস-এর গ্রামঞ্চলগুলোয় কেন্দ্রীভূত, যেখানে তখনও ৯০% অধিবাসী ওয়েলশ ভাষার বাচক এবং যেখানে তখনও সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষামাধ্যমে নির্বাহ করা যায়। দক্ষিণ ওয়েলস-এর কয়লাখাদান অঞ্চলে। তখন ওয়েলশ ভাষার উপস্থিতি প্রবল।

দ্বিতীয় ছবি: ৯০ বছর পরে, ১৯৯১-এর জনসমীক্ষায় দেখা যায়—

ক) ওয়েলশ ভাষার বাচক সংখ্যা মাত্র ৫,০৮,০৯৮ (মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮.৬%)।

খ) 'কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষার বাচক' আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

গ) মোট জনসংখ্যার ৮০%-এর ওয়েলশ ভাষায় কোনো জ্ঞান নেই।

ঘ) গ্রামাঞ্চলে বা অন্য কোথাও এমন কোনো অঞ্চল আর নেই যেখানে কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষা দিয়ে সমাজজীবনের সমস্ত কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

অবশ্য এই সংকটই সব নয়, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে ১৯৬০-এর পর থেকে ওয়েলশ ভাষা-আন্দোলন ক্রমশ সংগঠিত চেহারা নেয়, ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির পরম্পরাকে জীবন্ত রাখা ও ওয়েলশ-ভাষীদের ভাষিক অধিকার আদায়-এই দুই ক্ষেত্রেই বেশ কিছু 'জয়'—ও অর্জিত হয়।

এই সংকট ও সংগ্রামের শতকের যাত্রাপথে এবার মনোনিবেশ করা যাক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ওয়েলস-এর গ্রামাঞ্চল থেকে তার মাসুল আদায় করে নিতে কার্পন্য করে নি। ওয়েলস-এর গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'নিহতদের স্মৃতিরক্ষার্থে বেদি'-তে উৎকীর্ণ আছে সেইসব মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি। প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার পুরুষকে সেনাবাহিনীর জন্য নাম লেখানো হয়েছিল এবং তার মধ্যে ৩৫,০০০ জন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের মধ্যে গরিষ্ঠ অংশই ছিল ওয়েলশ-ভাষী।

ব্রিটিশ সেনা-প্রশাসন ওয়েলশ-ভাষী গ্রামীণদের কামান-গোলা-বারুদের খাদ্য হিসাবে নিযুক্ত করতে খুবই তৎপর ছিল। সেই জন্য তারা সাময়িকভাবে এটাও ভুলে গিয়েছিল যে ওয়েলশ ভাষা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারযোগ্য নয়! ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি ব্যবহার করেই তারা গ্রামীণ ওয়েলশদের সেনাবাহিনীর দিকে আকর্ষণ করেছিল। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ডাক দিয়ে আকর্ষণী দেওয়ালপত্র, 'সভ্যতা বাঁচানোর সংগ্রাম'-এ সামিল হওয়ার আবেগ গড়ে তুলতে আদর্শনৈতিক প্রচারপত্র, সেনায় যোগ দেওয়ার সুযোগ-সুবিধার বিবরণী, এমনকি নিয়োগপত্রও রাতারাতি ওয়েলশ ভাষায় ছাপানো হয়ে গিয়েছিল, ব্যাপকভাবে বিতরিত হয়েছিল। এমনকি সেই সবে ওয়েলশ-এর প্রাচীন রাজপুরুষদের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল আকর্ষণী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ওয়েলশভাষীরা অবশ্য খুব দ্রুতই টের পেয়ে যেতেন যে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণির বলে গণ্য করা হচ্ছে। এমনই এক ওয়েলশভাষী লিউইস ভ্যালেনটাইন-এর কথায়—

> সভ্যতার প্রায় কোনো সংস্পর্শে না আসা জংলি পাহাড়ি লোক হিসাবে সেনার অফিসাররা আমাদের দেখত। এই অতিরিক্ত ওয়েলশিয় ওয়েলশদের ইংরেজি ভাষার উপর দখল না থাকা নিয়ে নিরন্তর ঠাট্টা-মস্করা-টিটকারি করা হতো।[১৭]

যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিম সীমান্তে যে সমস্ত ওয়েলশভাষী তাদের নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নির্বিচার হত্যার অংশ হওয়ার বিরোধে অস্থির হয়ে উঠেছিল, 'শত্রু'-কে হত্যা করতে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সবার সামনে অপমান করা হতো, মারধোর করা হতো, বলা হতো যে 'তাদের এমন অসম্মানের জীবনের থেকে মৃত্যুও ভালো।' এর স্মৃতি রয়ে গেছে অগুন্তি যুদ্ধ-স্মারকে, যার গায়ে খোদাই করা আছে: 'Gwell Angau na Chywilydd' ('অসম্মানের চেয়ে ভালো')।

ওয়েলশভাষী সৈন্যরা তার বাড়ির পরিজনদের ওয়েলশ ভাষায় চিঠি লিখলে, সেনা কর্তৃপক্ষ তা পাঠানোর ব্যবস্থা না করে সেনাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দিত 'অচল ভাষায়' লেখা বলে। ওয়েলস-এর কেবলমাত্র ওয়েলশ-ভাষী অঞ্চলের কোনো পরিবার যুদ্ধক্ষেত্রে তার কোনো সদস্যকে হারালে ব্রিটিশ সেনা-কর্তৃপক্ষ সেই পরিবারকে এই দুঃসংবাদটিও পাঠাত কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার বিজ্ঞপ্তিচিঠিতে। এইসব পরিবারের কাছে তাই অজানা ইংরেজি ভাষায় সরকারি চিঠি আসা হয়ে উঠেছিল প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদের নামান্তর। এমনকি যুদ্ধ শেষ

হওয়ার পর ঘটা করে যে যুদ্ধ-স্মারক প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানগুলো সরকারিভাবে করা হয়েছিল, সেইগুলোও নির্বাহিত হয়েছিল কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ওয়েলস-এ ইংরেজি ভাষার আধিপত্যকে আরও বিস্তৃত করেছিল। কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষাতেই কথা বলতে পারে এমন বাচকের সংখ্যা ১৯১১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ৮.৫% থেকে কমে ৬.৩%-এ দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজি ও ওয়েলশ দুই ভাষাতেই কথা বলেন, ১৯১১ সালে এমন বাচক যারা ছিলেন, তাদের ১০% ১৯২১ সালের মধ্যে ওয়েলশ ভাষাকে পুরোপুরি ত্যাগ করে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার বাচক হয়ে ওঠেন।[১৯]

ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির এই আধিপত্যবিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দানা বাঁধছিল। ১৯১৭-র ডেবিডস দিবসে পূর্বোল্লিখিত লিউইস ভ্যালেনটাইন তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন: 'আজ আমি মজ্জায় মজ্জায় বুঝতে পারছি যে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির স্বার্থে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'[১৯]

দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়ে ওয়েলস-এর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল বিপুল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ যা ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির ভিতটাকেই টলিয়ে দিয়েছিল। গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়া, গণ -বেকারত্ব, সাধারণ জীবনযাত্রার মানের দ্রুত পতন ওয়েলস জুড়ে যেন ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে দক্ষিণ ওয়েলস-এর কয়লাখাদান অঞ্চলের ২৪১টি খনি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে কর্মরত ২,৭০,০০০ শ্রমিকদের মধ্যে ৫০%, অর্থাৎ ১,৩৫,০০০ জনকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওয়েলস-এর গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রেও মন্দা দেখা দেয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে ৪,৪২,০০০ মানুষ ওয়েলস ছেড়ে মধ্য ইংলন্ড বা দক্ষিণ-পূর্ব ইংলন্ডে কাজের খোঁজে চলে যায়। দক্ষিণ ওয়েলস থেকে এইভাবে যারা কাজের সন্ধানে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ৬৬%-এর বয়স ছিল ৩০-এর নিচে আর ৮৭%-এর বয়স ৪৫-এর নিচে।[২০] গ্রামীণ ক্ষেত্র ও শিল্পাঞ্চলের ওয়েলশভাষী পরিবারগুলো থেকে তরুণ সক্রিয় জনদের এভাবে দেশান্তরী হয়ে যাওয়ার প্রভাব ওয়েলশ ভাষার উপর পড়েছিল বিপুলভাবে। ওয়েলস-এ পড়ে ছিল এইসব পরিবারের বেশি বয়স্ক যে মানুষজন, তাদের ওয়েলশ ভাষার বাচক-কুশলতা পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হওয়ার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ইংলন্ডের শিল্পাঞ্চলে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইংরেজি-ভাষী হয়ে গড়ে উঠেছিল।

খোদ ওয়েলস-এও ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির ক্রমাগত প্রভাববৃদ্ধি ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতিকে তার স্বদেশেই বিপন্নতর করে তুলেছিল। ১৯১৪ সাল নাগাদ ওয়েলশ ভাষার কবি হ্যারি ওয়েব লেখেন:

> এর আগে অবধি ওয়েলসবাসীর ৫০% ওয়েলশ-ভাষী ছিল। বাকি ৫০% ছিল সাংস্কৃতিকভাবে নিষ্ক্রিয়, যাদের মধ্যে ছিল এখানে এসে মিশে যেতে না পারা অভিবাসী ও এখানকার নিজ-সংস্কৃতি-খোয়ানো অধিবাসী। কিন্তু এক প্রজন্মের মধ্যেই এক বিপুল জনগোষ্ঠী আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে তারা আবেগে ওয়েলশ হলেও ভাষায় ইংরেজ—যা আমাদের ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায় নি।[২১]

যে সব শহুরে শিল্পাঞ্চল/শ্রমিক-বসতি-আল-এ পরম্পরাগতভাবে ওয়েলশ-ভাষীদের প্রাধান্য ছিল, সেই সব জায়গায় খুব দ্রুত ওয়েলশ ভাষার বাচক সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। গ্লামোরগানের দুটি শহুরে বোরো (borough)-র জনসমীক্ষা তথ্য এর পরিচয় বহন করছে—

বোয়রার নাম	ওয়েলশভাষীদের সংখ্যা		হ্রাসের পরিমাণ (শতাংশ হিসাবে)
	১৯২১	১৯৫১	
মেরথির টিডফিল কাউন্টি	৩০,৯৪৮	১৪,৫৩৮	৫৩%
রহনডা আরবান ডিস্ট্রিক্ট	৬৮,৫১৯	৩১,২১৫	৫৪.৪%

১৯৩১ সালে ডাবলু জে গ্রুফিড-এর লেখনীতেও এই বাস্তব প্রকাশিত—

> অপ্রিয় সত্য হল: (১) নিথ নদীর পূর্বে অবস্থিত গ্লামোরগানের সব অঞ্চলে ওয়েলশ ভাষার মরণ দ্রুতহারে ঘটছে; (২) ওইসব অঞ্চলের বেশ বড় অংশ এখনই র‍্যাডনরশায়ার বা মনমাউথশায়ার-এর মতো ইংরেজায়িত হয়ে গেছে; (৩) এই সত্য ঢাকা দেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা বা 'সব ঠিক আছে' ভান করা আসলে ওয়েলশ ভাষার শবাধারে আর একটি পেরেক ঠোকারই নামান্তর।[২২]

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যম ও গণবিনোদন—রেডিও, বড় সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র—তার বৃহদাকার উৎপাদন ও বণ্টনের কুশলতায়, নতুনত্বের চমৎকারিত্বে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির প্রসারকে ওয়েলস সমাজে সর্বত্রগামী করে তুলতে থাকে। প্রথাবাহিত উৎসব ও বিনোদনের আঞ্চলিক লৌকিক রুপগুলো মুছে যেতে থাকে। 'সেইয়াট' (seiat) বা 'ইসগল গান' (ysgol gan)-এর মতো

লৌকিক বিনোদন চাপা পড়ে যেতে থাকে ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র-জগতের গ্ল্যামার ও ঝলকানিতে।

ক্রমশ এক নতুন প্রজন্মের ওয়েলসদেশীয় লেখককুলের আবির্ভাব হয় যারা সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসাবে ওয়েলশ ভাষা পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করে। তারা যুক্তিবিস্তার করে যে লেখকসত্ত্বার সর্বোত্তম বিকাশ, সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ এবং বৃহৎ পাঠককুলের কাছে পৌঁছোনর জন্য ইংরেজি ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। ইংরেজি মুদ্রণব্যবসার আনুকূল্য পেয়ে তারা তাদের ওয়েলশ ভাষায় রচনাকারী সতীর্থদের থেকে অনেক বেশি খ্যাতি ও সমাদরও লাভ করে, যেমন—জ্যাক জোনস, গ্লিন জোনস, মারগেড ইভানস, আলুন লিউইস, ডিলান থমাস, গুইন থমাস ও ভেরনন ওয়াটকিনস।

এইভাবে বাচকসংখ্যা ক্ষয়ের পাশাপাশি একের পর এক সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রমাগত ইংরেজির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া ওয়েলশ ভাষার মৃত্যু-আশঙ্কাকে আরও ঘনিয়ে তুলছিল।

প্রতিরোধের দানা বাঁধা

যে মধ্যবিত্ত অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবিস্তারের অংশিদার হয়ে দ্রুত 'উন্নয়ন'-এর স্বপ্ন দেখেছিল, ক্রমশ তার ক্রমবর্ধমান অংশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে ওয়েলশ সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটের ঘা খেয়ে সেই স্বপ্নে আস্থা হারাতে শুরু করে। 'ইংরেজায়ন'-এর মধ্য দিয়ে উন্নতির খোয়াব টুটে যাওয়া এই অংশ ক্রমশ ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার সপক্ষে আওয়াজ তুলতে থাকে। বিশ শতকের গোড়ায় এই ভূমিকা পালন করেছিল মূলত 'ওয়েলশ সম্প্রদায়দের জাতীয় সমিতি' (Undeb Cenedlaethol y Camadeithasau Cymraeg) নামক সংগঠন। মূলত মধ্যবিত্ত বর্গের বুদ্ধিবৃত্তি-চর্চাকারী অংশের উপর ভিত্তি করা এই সংগঠন নানাভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় যে 'আধুনিক জীবনচর্যা'-র বিভিন্ন কাজই ইংরেজির মতো ওয়েলশ ভাষাতেও সমভাবেই করা যায়। সরকারের বিভিন্ন মহলে তারা দাবিদাওয়া উত্থাপন করা ও তদ্বির করার কাজ চালাতে থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে ও গণমাধ্যমে ওয়েলশ ভাষার ব্যবহার চালু করার জন্য। অবশ্য এই সমিতির তুলনায় অনেক বেশি মাঠে-ময়দানের সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল ওয়েলশ ভাষিক অধিকারের দাবিতে একটি যুব-আন্দোলন। ইফান আব আওয়েন এডওয়ার্ডস কর্তৃক ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েলশ যুব লিগ' (Urdd Golaith Cymru) ছিল এই যুব আন্দোলনের প্রধান সংগঠন। এই যুব আন্দোলনের

ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ওয়েলস-এর স্বকীয় সাহিত্য, পরম্পরা, ধর্ম ও ভাষার লালন করা। তাদের দীর্ঘ একটানা প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৩৭ সালে বি বি সি রেডিও সম্প্রচারের ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচারের শাখা খুলতে সরকার বাধ্য হয়। যদিও ইংরেজি ভাষায় সম্প্রচারের তুলনায় ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচার ছিল খুবই অল্প ও সীমাবদ্ধ, তা সত্ত্বেও গোটা উত্তর ওয়েলস-এ এই ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচার বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়।

ব্রিটেনের সংসদীয় রাজনীতির মূল দুটি দল হলো রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দল (Labour Party)। ওয়েলস-এর সংসদীয় রাজনীতিতেও এদেরই প্রাধান্য ছিল। বিশেষ করে শ্রমিক দল (Labour Party)-এর বিপুল সমর্থন ভিত্তি ছিল দক্ষিণ ওয়েলস-এর শিল্পাঞ্চলগুলোয়। এই দুটি দলই 'ইংরেজায়নের মধ্য দিয়ে ওয়েলস-এর অগ্রগতি'-র প্রবক্তা ছিল। তাই ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার দাবি বা আন্দোলনের পাশে এই দুটি দল—নিতান্ত সংসদীয় ক্ষমতাদখলের বাধ্যবাধকতার কোনো পরিস্থিতিতে সাময়িক কৌশল হিসাবে বাধ্য না হলে—দাঁড়ায়নি। ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার দাবিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল ওয়েলশ জাতীয়তাবাদী দল (Plaid Genedlaethol Cymru)। এই দলটি ১৯২৫ সালে সামনে আসার পর থেকে মূলত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষার ব্যবহারের প্রসার ঘটানো এবং ওয়েলশীয় ওয়েলস গড়ে তোলা ছিল এই দলের মূল দাবি। বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে কখনওই তেমন ভালো ফল করতে না পারার ফলে সংসদীয় পথে এই সমস্ত দাবিকে জোরদার তারা কখনওই করতে পারেনি। এই জাতীয়তাবাদী দলের সবচেয়ে প্রখ্যাত নেতা সন্ডার্স লিউইস—যিনি দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। সংসদীয় রাজনীতিতে তেমন কোনো ছাপ ফেলতে না পারলেও, ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সনডার্স লিউইস ছিলেন তাঁর সমসময়ে ওয়েলশ ভাষার একজন প্রধান লেখক। ইংরেজায়নের সর্বাত্মক বিরোধিতা করে আত্মসচেতন আত্মসম্মানী এক ওয়েলশ জাতীয় পরিচয় গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রয়াসী ছিলেন। তার মতে, 'শিল্পায়ন' (industrialization) সমাজকে দূষিত করেছে ও সামাজিক সংস্কৃতিকে দুর্বল করেছে, তাই 'শিল্পায়ন' বর্জন করে কৃষিভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ—এই দুই মতাদর্শকেই তিনি সমালোচনা করেছিলেন 'অবাধ শিল্পায়ন'-এর উদ্গাতা হিসাবে। সমসাময়িক ওয়েলস-এ তাঁর মতাদর্শগত অবস্থান খুব বেশি

অনুগামী আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৩৬ সালে তাঁর একটি কাজ ওয়েলশ সমাজ জুড়ে তীব্র নড়াচড়া তৈরি করে। ১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বরে ওয়েলস-এর উপর ইংরেজদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি পেণিবার্থ-এ অবস্থিত বোমারু শিক্ষালয় (bombing school)-এ আগুন ধরিয়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে তা সংসদের ওয়েলস-জাত রাজনীতিবিদদের ঠুটো জগন্নাথ চরিত্র এবং ওয়েলশ ভাষার অসম্মান—এই দুইটি বিষয়কেই সমাজজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে চলে আসে। সনডার্স লিউইস সহ যে তিনজনকে গ্রেফতার করে আসামী হিসাবে কাঠগড়ায় তোলা হয়, বিচারপতির সামনের তাঁরা তিনজনই ইংরেজিতে কোনো কথা বলতে ও ইংরেজিতে বলা কোনো কথায় সাড়া দিতে অস্বীকার করেন এবং ওয়েলশ ভাষায় নিজেদের বক্তব্য রাখার অধিকারের দাবিতে অনড় থাকেন—বহু সাধারণ মানুষের সহানুভূতি এভাবে তাঁরা জয় করে নেন। এর প্রতিক্রিয়ায় কার্ডিফ-এ অনুষ্ঠিত ১৯৩৮-এর কেন্দ্রীয় আইসটেডফদ-এ দাফিদ জেনকিস নামক এক আইনজীবী একটি জাতীয় আবেদন (national petition) সংগঠিত করার লক্ষ্যে সই সংগ্রহ শুরু করেন। সেই আবেদনে দাবি ছিল যে ওয়েলস-এর ব্রিটেনে অন্তর্ভুক্তির ১৫৩৬-এর চুক্তির ভাষা বিধিটি বাতিল করতে হবে, কেবলমাত্র ইংরেজিতে নয়, ওয়েলশ ভাষাতেও আদালতের ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ করার অধিকার দিতে হবে। দাফিদ জেনকিনস আশা করেছিলেন যে তিনি ১০ লাখের মতো সই সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত আশাকে ছাপিয়ে গিয়ে ৩৬ লাখ সই সংগ্রহ হয় এবং ১৯৪১ সালে এই ৩৬ লাখ সই সংবলিত দাবিপত্র সংসদের নিম্নকক্ষ (House of Commons)-এ পেশ করা হয়। এই বিপুল গণউদ্যোগের চাপে সংসদে ১৯৪২ সালে 'ওয়েলশ বিচারালয় আইন, ১৯৪২' (The Welsh Courts, Act, 1942) পাশ হয়। কিন্তু তা ওয়েলশ জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে এতোটাই ব্যর্থ হয়ে যে তা 'রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসহানি' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই আইনে বিচারালয়ে ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারযোগ্য বলে ঘোষণা করা হলেও কোনো বাদী বা প্রতিবাদীকে কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষাতেই গোটা বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নি, ১৫৩৬-এর ভাষা-বিধি বাতিলের দাবিকে তো পুরোপুরি উপেক্ষাই করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান পরিস্থিতি ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ওয়েলশ ভাষায় বেতার সম্প্রচারের জন্য সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে ব্যাপক কাটছাঁট করা হয় এবং 'ব্রিটিশ জাতির' স্বার্থে সম্প্রচারের নামে ইংরেজি ভাষায় 'দেশপ্রেমিক' সম্প্রচারের ঢলে ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচারের পক্ষে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

এই অশান্ত সময়ে ওয়েলশ-ভাষী জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক স্থিতি টালমাটাল হয়ে ওঠে। ইংলন্ডের বিভিন্ন শহরাঞ্চল, বিশেষ করে লন্ডনের চারপাশে যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে শত্রুর আক্রমণের বিপদ বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চল ফাঁকা করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে ওয়েলস-এর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। হাজার হাজার শহুরে ইংরেজ ওয়েলস-এর গ্রামীণ অঞ্চলগুলোয় এসে বাসা বাঁধে। তাদের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও বিশেষ প্রস্বরযুক্ত উচ্চারণের ইংরেজি কথ্যভাষা ওয়েলশ গ্রামীণ মানুষদের কাছে ছিল অজানা ও অপরিচিত। এই নবাগত ইংরেজরা ওয়েলশদের থেকে নিজেদের অনেক বেশি 'সভ্য' ও 'উন্নত' মনে করার জাত্যাভিমানের কারণে নতুন জায়গায় এসেও সেখানকার ভাষা-সংস্কৃতি উপেক্ষা করে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি ধরে রাখতে দৃঢ়মনা ছিল। এর প্রভাব সেখানকার ওয়েলশভাষীদের উপরও পড়েছিল, তরুণদের মধ্যে প্রথানুগ ওয়েলশ ভাষার বাচকতা ছেড়ে নবাগত ইংরেজদের বাচকতা অনুসরণ করে কুলীন হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল।

এই সময়েই ওয়েলশভাষী জনগোষ্ঠীরা তাদের দীর্ঘদনের বাসভূমি থেকেও উচ্ছিন্ন হতে থাকে। হিটলারের বিরুদ্ধে 'মানব সভ্যতা রক্ষার্থে' যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে প্রচুর ওয়েলশভাষী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তাদের বাসভুমি থেকে উচ্ছেদ করে সেই সব জমি ব্রিটিশ সরকার দখল করতে থাকে। এর একটা বড় উদাহরণ ১৯৩৯-১৯৪১-এ ব্রেকনশায়ার-এর এপিন্ট পাহাড় (Epynt Mountain)এর অধিবাসীদের উচ্ছেদ। এই এপিন্ট পাহাড়ে বহু প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী ৫৪টি ওয়েলশ পরিবারের ২১৯ জনকে সরকার উচ্ছেদের নোটিশ ধরায় কোনোরকম বিশদ কারণ না দেখিয়ে, শুধুমাত্র এইটুকু বলে যে সামরিক প্রয়োজনে সেই জমি দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালে গড়ে ওঠে 'ওয়েলশ সংস্কৃতি প্রতিরক্ষা সমিতি' (Committee for the Defence of the Culture of Wales)। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই সমিতি এপিন্ট পাহাড়ের অধিবাসীদের বাসভূমি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ২১৯ জন মানুষকে উচ্ছেদ করে ৪০,০০০ একর জমি সরকার দখল করে নেয় সেনা-প্রতিষ্ঠানের জন্য। বহু প্রজন্মের ওয়েলশ-ভাষী সম্প্রদায়ের একটি গ্রাম

ধ্বংস হয়। এরপর 'ওয়েলশ সংস্কৃতি প্রতিরক্ষা সমিতি' শক্তিবৃদ্ধির জন্য 'ওয়েলশ সম্প্রদায়দের জাতীয় ঐক্যসমিতি' (National Union of Welsh Societies)-এর সাথে যুক্ত হয়ে ১৯৪১ সালে 'নব ওয়েলশ ঐক্যসমিতি' (Undeb Cymru Fydd) গঠন করে ওয়েলশভাষী পরিবারদের উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের একরোখা আক্রমণকে তারা খুব একটা প্রতিহত করতে পারেনি।

বহু প্রজন্ম ধরে স্থিত ওয়েলশভাষী সম্প্রদায়ের বাসভূমি এভাবে ভেঙে যাওয়ার প্রভাবে ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যার হ্রাস দ্রুততর হয়েছিল। ১৯৫১-তে ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৭,১৪,৬৮৬ (যা তিন বছরের বেশি বয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ২৮.৯%)। কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষাতেই কথা বলে এমন লোক বিরল হয়ে উঠেছিল শহর ও আধা-শহরগুলোয়, যেখানে প্রধান ব্যবহারের ভাষা ছিল ইংরেজি আর ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারকে অশিক্ষার চিহ্ন হিসাবে দেখা হতো। সারা দেশে সরকারি-প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ওয়েলশ ভাষার কোনো স্থান ছিল না। কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বা রাস্তাঘাটের দিক নির্দেশে। ওয়েলশ ভাষা ব্যবহৃত হতো না। সমস্ত ছাপানো আবেদনপত্র (form)-ও কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই ছাপা হতো।

ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি ও ওয়েলশভাষী মানুষের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ল্যাঙ্গেনেখ (Llangennech)-এর এইলিন বিসলি ও ট্রেফর বিসলি আইন-অমান্য শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের পাশে না দাঁড়িয়ে বহুজন তাঁদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ-মস্করা করতে থাকে।[২৩]

ওয়েলশ ভাষার এই মর্মান্তিক অবস্থা ওয়েলশ ভাষার লেখক ইসলউইন ফোয়ে এলিস (Islwyn Flowe Elis) ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর কল্পকাহিনীধর্মী 'ভবিষ্যতের ওয়েলস-এ এক সপ্তাহ' উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন। উপন্যাসটিতে বলা হয়েছে তার মুখ্য চরিত্রের ভবিষ্যৎ ওয়েলস-এ দুটি বিকল্প ভ্রমণের কথা। প্রথম ভ্রমণটি স্বস্তিজনক, কারণ সেখানে পাওয়া যায় এক স্বাধীন সার্বভৌম ওয়েলস, যেখানে দ্বিভাষিকতা দস্তুর এবং সমস্ত ওয়েলশ মানুষ তাদের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চর্চা করে। দ্বিতীয় বিকল্প ভ্রমণটি ভয়াবহ কারণ সেখানে পাওয়া যায় এমন এক ওয়েলস-কে, যার কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তা পশ্চিম ইংলন্ডের একটি প্রদেশ মাত্র এবং যেখানে ওয়েলশভাষায় আর কেউ কথা বলে না। এই দ্বিতীয় যাত্রায় প্রধান চরিত্রটির সঙ্গে বালা নামক স্থানে দেখা হয় এক বৃদ্ধার--যাকে সবাই 'পাগল' বলে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রধান চরিত্রটি বুঝতে পারে

যে এই বৃদ্ধার স্মৃতিতে তখনও ওয়েলশ ভাষার কিছু অবশেষ রয়ে গেছে, তাই সে ওই বৃদ্ধাকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে ওয়েলশ ভাষায় প্রাচীন ধর্মীয় প্রার্থনা আবৃত্তি করতে। বৃদ্ধা কিছুটা আবৃত্তি করার পরই থেমে গিয়ে ইংরেজিতে বলে ওঠে, 'আমি আমার নিজের এই দুই চোখে দেখেছি কীভাবে ওয়েলশ ভাষার মৃত্যু ঘটলো।'[২৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে এই দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেশি বেশি করে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির মৃত্যুসম্ভাবনার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের ডাক আবারও জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসেন বর্ষীয়ান ভাষা-যোদ্ধা সনডার্স লিউইস ১৯৬২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বি বি সি সম্প্রচারে বার্ষিক ওয়েলস-বিষয়ক বক্তৃতা দিতে রাজি হন এবং 'Tynged yr laith' ('ভাষার নিয়তি') শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে একুশ শতকের শুরুতেই ওয়েলশ ভাষার মৃত্যু ঘটে যাবে, আর সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে ওয়েলশ জনগণের উদাসীনতা এবং নিজের ভাষা নিয়ে ভ্রান্ত আত্মগ্লানি। এই উদাসীনতা এবং ভ্রান্ত আত্মগ্লানি ঝেড়ে ফেলে ওয়েলশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য সুসংহত ও কার্যকরী রণকৌশল নির্ধারণ করে সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তিনি তাঁর ওয়েলশ সহনাগরিকদের কাছে আবেদন রাখেন। তিনি বলেন যে ওয়েলশ ভাষা-পুনরুজ্জীবন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের সামিল এবং দেশের সার্বভৌমত্বের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের ভাষার বেঁচে থাকা।[২৫] প্রবীণ ভাষা-যোদ্ধা সল্ডার্স লিউইস-এর এই ভাষণ ওয়েলশ সমাজ জুড়ে গভীর অভিঘাত ফেলে, ভাষা-সংস্কৃতির সংকটের বিষয়টিকে জনসাধারণের মধ্যে বিতর্ক-বিবেচনার কেন্দ্রীয় বিষয় করে তুলতে সফল হয়। ১৯৬০-এর দশকে ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা আরও ১৭.৩% হ্রাস পেলেও, 'ভষার নিয়তি'-র অভিঘাতে এই দশকেই ভাষা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে নতুন ধরনের দায়বদ্ধতা নিয়ে একঝাঁক তরুণ ওয়েলশ তাদের কার্যকলাপ শুরু করেন। নাগরিক অধিকারের জন্য আন্দোলনেও ওয়েলশ ভাষা পুনরুজ্জীবন একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে গঠিত হয় 'ওয়েলশ ভাষা সমিতি' (Welsh Language Soceity) যা প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গণ-কর্মসূচি নিতে থাকে।

তাদের সদস্যসংখ্যা কোনো পর্যায়েই ২০০০-এর বেশি ছিল না, কিন্তু ওয়েলশ সমাজের উপর তাদের প্রভাব কেবলমাত্র তাদের সংখ্যার বিচারে বোঝা যাবে না। তাদের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বদলকে সূচিত করেছিল। এর আগে পর্যন্ত ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে আন্দোলনকারীরা মূলত সংসদীয় পন্থায় আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ওয়েলশ ভাষা সমিতি এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে জঙ্গি অহিংস কর্মসূচি নিতে থাকে এবং পুলিশি দমন, গ্রেফতার ও আইনি শাস্তির চোখে চোখ রেখে অবিচল থাকার মধ্য দিয়ে তা ক্রমাগত আরও বেশি বেশি মানুষের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিতর্ক ছড়িয়ে দেয়। আন্দোলনের প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে বেরিয়েও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তারা সরকারকে বাধ্য করতে থাকে ভাষা বিষয়ে গুরুত্ব দিতে। একটা বড় সময় পর্যায় জুড়ে ওয়েলশ ভাষাসমিতি নানা ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। এই পুস্তিকাগুলির মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ও তার জন্য (তা নিজেরা করা ও সরকার-প্রশাসনকে করতে বাধ্য করার জন্য) বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। তাদের চালিকাশক্তি ছিল এই ভাবনা যে একটি ভাষার মৃত্যু ধ্বংস করে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এবং তার ফলে মানবসভ্যতার সম্পদহানি ঘটে। এই সমিতির মতাদর্শগত ভাবনার বুনোট গড়ে তুলেছিলেন দার্শনিক জে আর জোনস, যিনি সজাগ করেছিলেন যে:

> যে অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে, তা এই নয় যে আমরা আমাদের দেশকে ছেড়ে যাচ্ছি, বরং তা এই যে আমাদের দেশই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, আমাদের পায়ের নীচে আমাদের দেশ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এক লোলুপ সর্বগ্রাসী বাতাস যেন তাকে শুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে, অন্য এক দেশ ও অন্য এক সভ্যতার করতলে আমরা গচ্ছিত হচ্ছি।[২৬]

ভাষাসমিতির আন্দোলনের ধাক্কা সংসদীয় রাজনীতিবিদদের উপেক্ষার নীতিতে যেমন চিড় ধরাচ্ছিল, তেমনই ব্যাপক সাধারণ মানুষকেও টেনে আনছিল ভাষা-সংস্কৃতি বিতর্কে। এর ফলে সরকার বাধ্য হয়েছিল কিছু ছাড় দিতে। রাস্তা-নির্দেশক, গাড়ি-ভাড়া-নির্দেশক ও সরকারি নথিপত্রে দ্বিভাষিকতা চালু হয়ে ইংরেজির পাশাপাশি ওয়েলশ ভাষা ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতাতেই ১৯৬৭ সালে সংসদে গৃহিত হয় ওয়েলশ ভাষা আইন, ১৯৬৭' (Welsh Language Act, 1967)। এই আইন ওয়েলশ ও ইংরেজি—উভয় ভাষার সম গ্রহণযোগ্যতা ঘোষণা করলেও ভাষা-আন্দোলনকারীরা তাতে সন্তুষ্ট হননি। ভাষাআন্দোলনকারীদের

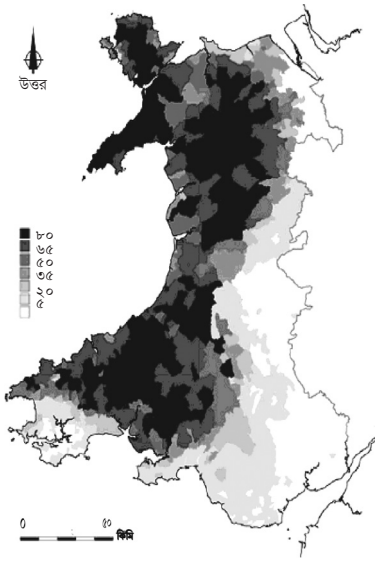

ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতে পারে কত শতাংশ বাসিন্দা—১৯৭১

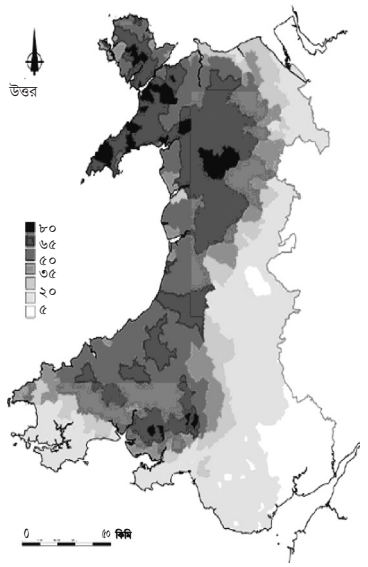

ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতে পারে কত শতাংশ বাসিন্দা—১৯৯১

ওয়েলশ

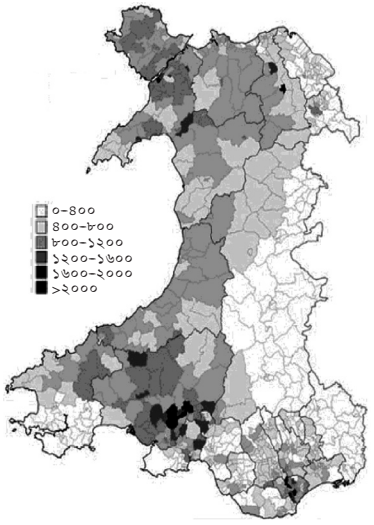

ওয়েলশ ভাষায় বাচক সংখ্যা, ২০১১

ওয়েলশ ভাষার বাচকহ্রাসের চিত্র ১৯৭১–২০১১

সূত্র: জ্যানেট ডেভিস, দি ওয়েলশ ল্যাঙ্গুয়েজ: এ হিস্ট্রি, ইউনিভারসিটি অফ ওয়েলস প্রেস, কার্ডিফ, ২০১৪।

বক্তব্য ছিল যে তাদের দীর্ঘ দিনের দাবি অনুযায়ী প্রশাসনিক বিভিন্ন সংস্থার ওয়েলশ ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা ও ওয়েলশ নাগরিকদের যে কোনো পরিষেবা ওয়েলশ-ভাষা-মাধ্যমে পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা—এই দুটি যদি করা না হয় তাহলে 'সম-গ্রহণযোগ্যতা' কেবল কথার কথাই থেকে যায়। ১৯৬৭-র আইন এই দুটি বিষয়কেই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে এই আইন দিয়ে সাংসদরা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলেও, সেই চেষ্টায় তারা বিফল হয়। প্রশাসনিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার দাবিতে আন্দোলন আরও শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এর ফলে ওয়েলশ সমাজে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির মৃত্যুযাত্রা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কিছু প্রাথমিক লক্ষণও ফুটে ওঠে। সেই লক্ষণগুলি এবার দেখা যাক।

মুমূর্ষুভাষার নবজীবনে ফেরার কিছু লক্ষণ

ক) দূরদর্শন

১৯৭০-এর পর থেকে ওয়েলশ ভাষা আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্রমশ এই চেতনা দৃঢ়মূল হয় যে ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজায়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হল দুরদর্শন সম্প্রচার যা প্রায় সম্পূর্ণতই ইংরেজি ভাষার দখলে। সুতরাং ওয়েলশ ভাষায় দূরদর্শন সম্প্রচারের জন্য একটি পৃথক 'চ্যানেল'-এর দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে। এই চাপের মুখে সরকার ওয়েলশ ভাষায় পৃথক চ্যানেল চালু করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা কার্যকরী করার জন্য কোনো পদক্ষেপই করে না। সরকারের এই সচেতন নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালে ওয়েলশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ গুইনফোর ইভানস আমৃত্যু অনশন শুরু করেন সরকারকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধ্য করতে। অবশেষে এর মধ্য দিয়ে সরকার বাধ্য হয় ওয়েলশ ভাষার চ্যানেল চালু করতে। ১৯৮২-র নভেম্বর থেকে 'সিয়ানেল পেদওয়ার সিমরু' (এস ফোর সি) নামে এই চ্যানেল দৈনিক ২২ ঘণ্টার ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচার শুরু করে। সামাজিক- অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার শক্তিবিচারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এক ভাষায় দৈনিক ২২ ঘণ্টা সম্প্রচার নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনকারীদের উদ্যোগ ও সৃজনশীলতার কারণেই।

খ) শিক্ষা

১৯৪৫-এর পর থেকে আঞ্চলিক শিক্ষা অধিকর্তাদের এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল যে তারা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ওয়েলশ ভাষা-শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। 'অশিক্ষিত', 'পশ্চাৎপদ'-দের ভাষা হিসাবে তকমা পড়ে যাওয়া ওয়েলশ ভাষা শিক্ষার অঙ্গনে অচ্ছুৎ-ই থেকে গিয়েছিল। ১৯৬১ সাল নাগাদ দেখা যায় যে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক ওয়েলশ পরিবারের বাচ্চাদের ৮০%-এরও বেশি ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতে বা বুঝতে পারে না। ওয়েলস-এর মধ্যে ওয়েলশ-ভাষী অঞ্চলও তখন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।[২৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা-আন্দোলনকারীরা উপলব্ধি করে যে কেবলমাত্র ওয়েলশ-ভাষী গ্রামাঞ্চলে ওয়েলশ ভাষা-শিক্ষা চালু করে তরুণদের মুখ থেকে ওয়েলশ ভাষার হারিয়ে যাওয়া রোধ করা যাবে না, বরং গোটা ওয়েলস জুড়েই দ্বিভাষিক (ইংরেজি এবং ওয়েলশ দুই ভাষা মাধ্যমে) অথবা ওয়েলশ ভাষা মাধ্যমে শিক্ষা চালু করতে হবে যাতে শহরাঞ্চলের যে সমস্ত শিশুরা তাদের পরিবারের কাছ থেকে ওয়েলশ ভাষার প্রাথমিক পাঠ ও পরিচয় পাচ্ছে না, তাদের কাছেও ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা পৌঁছে দেওয়া যায়। শিক্ষাব্যবস্থার এইরূপ সংস্কারের দাবি ভাষা-আন্দোলনকারীরা ওঠাতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় এই ভাবনা উঠে আসে যে জন্ম থেকে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত শিশুর যে বয়সকাল, তখন যদি সে এমন পরিবেশে নিমজ্জিত না থাকে যেখানে ওয়েলশ ভাষা কথোপকথনে ও অন্যান্য দৈনিক কাজকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরও তার ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা-শিক্ষা বা ওয়েলশ ভাষামাধ্যমে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হতে পারে না, ভাষা শেখা বা শেখার পর তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এই ভাবনা থেকে ১৯৭১ সালে জন্ম নেয় 'ওয়েলশ ভাষা মাধ্যম নার্সারি স্কুল আন্দোলন' (Mudiad Ysgolion Meithrim)। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনকারীরা উদ্যোগ নেন ওয়েলশ ভাষা মাধ্যমে শিশুদের প্লেগ্রুপ, স্কুল-পূর্ববর্তী সমস্তরকম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠদল, অভিভাবক ও শিশুদের ওয়েলশ ভাষায় মেলামেশা, সময় কাটানো, কথাবার্তা বলার দল গড়ে তুলতে। ১৯৮৮-৮৯এর মধ্যে তারা এইরকম দল প্রায় ১০০০-টা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকগুলো দলই ছিল ওয়েলশ ভাষা প্রায় মুছে যেতে বসা শহরাঞ্চলে। ক্রমশ এর ধারবাহিকতায় কিছু ওয়েলশ ভাষা মাধ্যম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলও চালু হয়। এই স্কুলগুলো লোকমান থেকে এই অতিকথা দূর

করতে সাহায্য করে যে ইংরেজি ভাষা মাধ্যম ছাড়া আধুনিক শিক্ষা সম্ভব নয়। ভাষা-আন্দোলনকারীদের এই সমস্ত উদ্যোগ ও আন্দোলনের একটি বড় ফলপ্রাপ্তি হিসাবে আসে ১৯৮৮-র শিক্ষা সংস্কার আইন (Education Reform Act of 1988) যার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্কুলের শ্রেণিতে ও মাধ্যমিক স্কুলের প্রথমদিকের শ্রেণিতে ওয়েলশ ভাষাকে প্রথম ভাষা অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পাঠক্রমের অন্তর্গত করা বাধ্যতামূলক হয়। অবশ্য, ওয়েলস-এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ওয়েলশ ভাষা কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষাচর্চা বিভাগ, ওয়েলশ-এর ইতিহাস চর্চা বিভাগ ও অল্প কয়েকটি কলাবিদ্যার বিভাগেই আটকে থাকে। ভাষা-আন্দোলনকারীদের তোলা ওয়েলশ ভাষা মাধ্যম কলেজের দাবি অধরাই থেকে যায়।

গ) সাহিত্য

ভাষা-আন্দোলনকারী কলিন বেকার বলেছিলেন, 'ওয়েলশ ভাষায় লিখন-অভ্যাস ছাড়া কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষায় কথন-অভ্যাস হল হাত-পা-কাটা দেহের মতো।' গুইনফোর ইভানস বলেছিলেন যে যতদিন না ওয়েলশ ভাষার বই-পত্রিকা-সংবাদপত্র স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন ইংরেজি শব্দ, বাক্যবন্ধ ও প্রবাদ-প্রবচনের 'দৈনিক হামলা' চলতে থাকবে এবং ওয়েলশ বাচনভঙ্গি ও আঞ্চলিক ভাষারূপসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। এহেন ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওয়েলশ পুস্তক পরিষদ' (Cyngor Llyfrau Cymraeg)। এর প্রধান সংগঠক ছিলেন কার্ডিগানশায়ার যুক্ত পাঠাগার-এর প্রধান গ্রন্থাগারিক আলুন আর এডওয়ার্ডস। 'ওয়েলশ মাধ্যম শিক্ষার যুক্ত কমিটি' (১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত) ও 'ওয়েলশ শিল্পকলা পরিষদ' (১৯৫৭-তে প্রতিষ্ঠিত)-র সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে 'ওয়েলশ পুস্তক পরিষদ' ওয়েলশ ভাষার পুস্তক প্রকাশনে জোয়ার আনে। ওয়েলশ ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ১৯৬৩-তে ১০৯ থেকে বেড়ে ১৯৮৮-৯৯-তে ৫৭৩-এ পৌছয়। ওয়েলশ পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র সংগঠিত করতেও পুস্তক পরিষদ দেশজুড়ে ভূমিকা নেয়। প্রথমদিকে শিশুপাঠ্য ও স্কুলের বইপত্র প্রকাশে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ক্রমশঃ সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হতে থাকে। যেমন, ১৯৮৬ সালে ওয়েলস-এর ইতিহাস নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ 'Cof Cenedl' এক গবেষকদলের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৯০ সালে জন ডেভিস রচিত 'Hanes Cymru প্রকাশিত হয়, যা ওয়েলশ জাতির সমগ্র ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি আকরগ্রন্থের স্বীকৃতি পায়। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কেট রবার্টস, ইসলউইন ফ্লোয়ে

এলিস (Islwyn Flowe Elis) গল্পকার-ঔপন্যাসিক হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পরীক্ষামূলক গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে রবিন ল্যিওয়েলিন (Robin Llywelyn), মিহাঞ্জেল মরগান ও উইলিয়াম আওয়েন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি করেন।

ঘ) সংবাদপত্র

১৯৭০-এর পর 'পাপুরাউ ব্রো' (paprau bro) নামে এক ধরনের আঞ্চলিক সংবাদ সাময়িকী ওয়েলশ ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে, যেমন—YCardi Bach, Eco'r Wyddfa, Y Gloran ও Llanw Llyn। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৮-র মধ্যে ৫২-টি 'পাপুরাউ ব্রো'-এর প্রকাশনা শুরু হয়েছিল। প্রতি মাসে তাদের গড় বিক্রি ছিল ৭০,০০০ ও গড় পাঠক সংখ্যা ২,৮০,০০০। ১৯৯০ নাগাদ এদের পাঠকসংখ্যা 'ডেইলি পোস্ট'ও 'ওয়েস্টার্ন মেল'-এর মতো দেশজোড়া ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর যুক্ত পাঠকসংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। দেশজোড়া সংবাদপত্র বা জনপ্রিয় সাময়িকীর ক্ষেত্রে অবশ্য ইংরেজি ভাষার, বিশেষ করে ইংলন্ড থেকে ব্যবসায়িক ভাবে প্রকাশিত পত্রিকারাই বাজার ছেয়ে ছিল এবং ইংরেজায়নের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিল।[২৮]

ঙ) আইসটেডফদ

হুগ আওয়েন-এর সময় থেকেই আমরা দেখেছি যে আইসটেডফদগুলি, বিশেষ করে কেন্দ্রীয়ভাবে কার্ডিফে অনুষ্ঠিত আইসটেডফদটি, ক্রমশ ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছিল। এই ধারায় ছেদ ঘটে ১৯৫০ সালে যখন কেয়ারফিলি আইসটেডফদ-এ নীতি হিসাবে গৃহিত হয় যে গোটা ওয়েলস-এ আইসটেডফদগুলোকে ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও প্রকাশক হিসাবে সংগঠিত করা হবে। এর পরে থেকে আইসটেডফদগুলি ওয়েলশ ভাষায় সাহিত্য, সংগীত, কাব্য ও নাটক বিষয়ে মেধার স্ফুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ওয়েলশ ভাষার প্রাচীন প্রথানুগ ছন্দ ও কাব্যরীতিতে কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা ও তার মধ্য দিয়ে ওয়েলশ ভাষার 'prifeirdd' (প্রধান কবি) নির্বাচন প্রতি বছর উৎসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ওয়েলশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে নতুন আগ্রহ গড়ে তোলে।

মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে জীবনের দিকে ফেরার এই লক্ষণগুলো যখন ফুটে উঠছে, মারণরোগও কিন্তু নতুন পথে সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে—এইবার সেই দিকটা দেখা যাক।

১৯৬০-এর দশকের পর থেকে ওয়েলশ ভাষা পুনরুজ্জীবনের জন্য সামাজিক আন্দোলন ক্রমশ সংগঠিত রূপে একের পর এক সামাজিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লেও ১৯৭১, ১৯৮১ ও ১৯৯১-এর ওয়েলস-এর জনগণনার তথ্য থেকে দেখা যায় যে ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা হ্রাসের ধারা তখনও শেষ হয়নি, যদিও ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এর মধ্যে সেই হ্রাসের গতি অনেকটাই স্তিমিত হয়েছিল বলা যেতে পারে:

বছর	ওয়েলশ ভাষার বাচক সংখ্যা	বাচকসংখ্যার হ্রাস (শতাংশ হিসাবে)
১৯৭১	৫,৪২,৪২৫	–
১৯৮১	৫,০৮,২০৭	৬.৩%
১৯৯১	৫,০৮,০৯৪	০.০২%

১৯৮০-র দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তন ভাষার সংকটকে নতুন জায়গায় গভীর করে তোলে। ১৯৮০-র দশকে ব্রিটেনে সংঘটিত হয় মার্গারেট থ্যাচার (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)-এর পৌরোহিত্যে নব্য উদারনীতিবাদী (neo-liberal) 'বিপ্লব'। ওয়েলস-এর উপর এই রূপান্তরের প্রভাব পড়ে বিপুলভাবে। দক্ষিণ ওয়েলস-এর বড় কয়লাখনি, কয়লাকোম্পানি সহ প্রায় সব উৎপাদন শিল্প (manufacturing industries) বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে সহায়তাদানকারী সরকারি ব্যবস্থাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ওয়েলস-এর কৃষি ও উৎপাদন শিল্প উভয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে এবং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেহনতী মানুষ জীবিকা হারিয়ে স্থিতিহীন হয়ে পড়ে। উৎসাহিত করা হতে থাকে গ্রামাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমির ক্রয়বিক্রয় ও পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে বিকাশ আর অন্যদিকে শহরাঞ্চলে আর্থিক পুঁজি (financial capital)-এর অনুসারী ব্যাঙ্ক, আর্থিক বিনিয়োগ ও পরিষেবার বিভিন্ন শিল্প। এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার একটি বড় মাপের গণ-স্থানান্তর, জনবসতির ভাঙন শুরু হয়। গ্রামীণ ওয়েলশ থেকে বহু প্রজন্মের বাসিন্দারা হয় গোটা পরিবার, নয়তো পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া বাকিরা ওয়েলস-এর বাইরে পাড়ি দেয় জীবিকার খোঁজে। দীর্ঘ দিনের ওয়েলশভাষীদের বসতিগুলো ভেঙে বিপুল পরিমাণ জমি বিক্রির জন্য জড়ো হয়। অন্যদিকে, ইংলন্ড ও তার সংলগ্ন অঞ্চল থেকে থ্যাচারিয় অর্থনীতিতে উপকৃতরা, অর্থাৎ আর্থিক পুঁজির লগ্নী থেকে বিপুল মুনাফা অর্জনকারীরা সেই সব জমি

কিনে নিয়ে হয় নিজেদের বিকল্প বাসভবন/প্রমোদভবন আর নয়তো ব্যবসায়িক পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে খুব দ্রুত জনবসতির চরিত্র বদলে যেতে থাকে। ১৯৯০ সালে চারটি গ্রামীণ কাউন্টিতে করা সমীক্ষায় এইরকম মন্তব্য উঠে এসেছিল: 'ইংরেজ অভিবাসীরা গ্রাম ছেয়ে ফেলছে আর তার চরিত্র বদলে দিচ্ছে', 'গ্রাম এখন আগন্তুকে ভরে গেছে।'[২৯] এই ইংরেজ অভিবাসীদের খুব অল্প সংখ্যকই তাদের সন্তানদের ওয়েলশ ভাষা শেখাতে বা দ্বিভাষিক (ওয়েলশ ও ইংরেজি) শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আগ্রহী। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ও শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় বাচকতাতেই তারা আগ্রহী। গ্রামীণ সভা-সমিতি, ডাকঘর, দোকান-বাজারেও এদের হাত ধরে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার আবার বেড়ে গিয়ে ওয়েলশ ভাষা-ব্যবহারকে কোণঠাসা করে দিতে শুরু করল।

দীর্ঘকালের ওয়েলশভাষীদের বসবাস স্থানগুলো, তাদের বাস-সমষ্টিগুলো ভেঙে যাচ্ছে, ওয়েলশভাষী মানুষজন আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। পাশাপাশি সরকারের সামাজিক খাতে খরচ কমানো'-র থ্যাচারিয় নিদান কার্যকরী হওয়ার ফলে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল (ওয়েলশ ভাষায় দূরদর্শন সম্প্রচার, ওয়েলশ প্রকাশনা, ওয়েলশ মাধ্যম বিদ্যালয়, ইত্যাদি), সেগুলোর সরকারি বরাদ্দ কাটছাঁট হয়ে গেছে, তাদের বলা হচ্ছে মুনাফাচালিত বাজারী সংস্থার মতো চলার ব্যবসায়ী পথ তৈরি করে নিতে হবে।

এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ওয়েলশ ভাষা পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলনকারীরা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হল। 'ওয়েলশ ভাষা সমিতি' ক্রমশ বিকল্প তৈরির উপায় হিসাবে সর্বগ্রাসী বাজার-অর্থনীতির থ্যাচারিয় নিদানকে পরিত্যাগ করা ও সমষ্টিগত সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতি-সমাজনীতি গড়ে তোলার কথা বলতে থাকে। ওয়েলশভাষী গ্রামীণ মানুষদের বসবাসস্থানগুলো ভেঙে যাওয়া আটকানোর উপায় হিসাবেও এই বিকল্প সমাজনীতি-অর্থনীতির রূপ নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়।[৩০]

ভাষা-আন্দোলনকারীদের চাপে ১৯৮৮ সালে সরকার বাধ্য হয় 'ওয়েলশ ভাষা পর্ষদ' (Burdd yr Jaith Gyimraeg) গঠন করতে। তার ৫ বছর পর 'ওয়েলশ ভাষা আইন, ১৯৯৩' ঘোষিত হয়। এই আইনের সূত্র ধরে ১৯৯৬ সালে ভাষা পর্ষদ তার পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়, তা হল: ১। ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা বাড়ানো, ২। ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারের সামাজিক ক্ষেত্র বাড়ানো, ৩। সেইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দান, ৪। ওয়েলশ ভাষা ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত জীবনচর্চার রক্ষা ও বিকাশ। নীতি ঘোষণার ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা আন্দোলনকারীরা নিশ্চিতভাবেই

তাদের প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়, প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে এই নীতি রূপায়ণের উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন।

আর্থিক পুঁজি (financial capital)-র বিধান অনুযায়ী অর্থনীতি সমাজনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য থ্যাচার-সরকার যে তুমুল কেন্দ্রীভূত শাসন জারি করেছিল তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-প্রতিক্রিয়া ক্রমশ আঞ্চলিক স্বশাসনের দাবিকে জোরদার করে তোলে। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি বাধ্য হয় সমঝোতার পথে গিয়ে 'অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া' (devolution)-র প্রক্রিয়া চালু করার। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সরকারি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে বা বিপক্ষে 'হ্যাঁ' বা 'না' গণভোট হওয়ার কথা ঘোষিত হয়। এই গণভোট হওয়ার প্রাক্কালে, ১৯৯৭-এর আগস্টে ওয়েলশ ভাষাআন্দোলনকারীরা একটি বিশাল জাতীয় মিছিল সংগঠিত করেন। কেরনারফন (Caernarfon) থেকে কার্ডিফ অরধি হাঁটা এই মিছিলের মূল স্লোগান ছিল 'Mwy Nag le' (হ্যাঁ-এর চেয়ে বেশি)। অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসককুল সমঝোতা হিসাবে যতটুকু স্বশাসন দিতে রাজি, তার থেকেও বেশি স্বশাসন তারা ওয়েলশ-এর জন্য চায়। ওয়েলশ ভাষা-আন্দোলনকারীরা বিশেষ করে স্বাধীনভাবে কর আদায় ও তা ব্যয়ের অধিকারে এবং ভাষা-সংক্রান্ত নীতি স্বাধীনভাবে গ্রহণ করা ও কার্যকরী করার অধিকারে গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯৯৭-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর গণভোটে ওয়েলশ ভোটদানকারীরা 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে অর্থাৎ 'অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া' (devolution)-র পক্ষে রায় দেন। এর সূত্র ধরে ওয়েলশ 'জাতীয় বিধানসভা (National Assembly) গঠিত হয় এবং ১৯৯৮ সালে সেই 'জাতীয় বিধানসভা' 'অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আইন' (devolution Legislation) তৈরি করে। কিন্তু তা ভাষা আন্দোলনকারীদের আরও একবার হতাশা-ই উপহার দেয়, কারণ 'হ্যাঁ'-এর চেয়ে বেশি'-র বদলে ওয়েলশ জাতীয় বিধানসভার বিধায়করা 'হ্যাঁ-এর চেয়ে কম'--এই নিজেদের সীমায়িত রাখেন-- ওয়েলশ স্বশাসনকে তারা নানা আইনি ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ঠুটো করে রাখেন ও কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণকে মূলত অপরিবর্তিত রাখেন।[৩১] ব্রিটেনেরই অন্য একটি প্রদেশ, স্কটল্যান্ডের জাতীয় বিধানসভার করা 'অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার। আইন' (devolution legislation)-এর সঙ্গে তুলনা করলেই ওয়েলশ-এর বিধায়কদের স্থিতিজাড্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩২]

ফলে, ওয়েলশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের যে স্বাধীনতা তারা চেয়েছিলেন, সেই 'হ্যাঁ-র চেয়ে বেশি'-র জন্য ভাষাআন্দোলনকারীদের এখনও পথ পাড়ি দেওয়া বাকি পড়ে রইল।

১৯০০ সালের তুলনায় ২০০০ সালে ওয়েলশ ভাষা কিছুটা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে—তার প্রধান লক্ষণ হল ওয়েলশ ভাষা-আন্দোলনের গড়ে ওঠা, তাতে তরুণ প্রজন্মকে জড়িয়ে নিতে পারা ও তত্ত্বে-কর্মে সংগতি রাখার চেষ্টা জারি রাখা। এর ফলে ওয়েলশ ভাষা-ব্যবহার রক্ষা ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং দৈনিক জীবনে—রাস্তা-ঘাটের নামে ও স্থান নামে, সরকারি আবেদনপত্রে ও বিজ্ঞপ্তিতে—ওয়েলশ ভাষা ব্যবহার বেড়েছে। শিক্ষায় ও গণমাধ্যমেও তা স্থান করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মূল চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে ওয়েলশ ভাষার বাচকসংখ্যা হ্রাস অব্যাহত থাকা এবং দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে ওয়েলশ-ভাষী সম্প্রদায়ের বসতস্থানগুলো ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া।

অধুনাতে শহরাঞ্চলগুলোয় ওয়েলশ বাচক সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। ১৯৮১-তে যেখানে ৩-১৫ বয়সী শহরবাসীর ১৮% ছিল ওয়েলশ বাচক, সেখানে ১৯৯১ সালে তা ২৪.৯%। ওয়েলশ ভাষা-বাচকতাকে কেন্দ্র করে পরিষেবা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সংরক্ষণ ও সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য কিছু আন্দোলন ও তার সাফল্যও দেখা গেছে। কিন্তু শহরাঞ্চলের এই বৃদ্ধি কি গ্রামাঞ্চলের বিপুল হ্রাস ও ঘনীভূত উপনিবেশ ভেঙে যাওয়াকে ছাপিয়ে সামগ্রিকতায় সদর্থক ছাপ ফেলতে পারবে? সন্দেহ থেকেই যায়।

সন্দেহকে আরও গভীর করে তোলে সাম্প্রতিক আরও কিছু প্রবণতা। তেমন তিনটে প্রবণতা হলো—

১. ১৯৯৯-তে করা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ওয়েলস-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ২০% ১১ বছর বয়সে ওয়েলশ ভাষায় অনর্গল কথা বলার দক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারে। ক্রমশ শিক্ষার উপরের দিকের স্তরে গেলে এই হার আরও কমতে থাকে—জি. সি. এস. ই. অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই হার মাত্র ৫.৭% এবং উচ্চ-মাধ্যমিক (Advanced Level Examinations) স্তরে তা আরও কমে মাত্র ১.৬%। বয়স্কদের মধ্যে ওয়েলশ ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থাপনাগুলোয় ভর্তির হার খুব কম, আর তার ওপর ভর্তি হওয়াদের মধ্যে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।[৩৩] ছোটবয়সে যারা ওয়েলশ ভাষা শিখছে, তাদেরও একটা বড় অংশ ক্রমশ এই ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা হারিয়ে ফেলছে কারণ

পরিবারের মধ্যে তারা এর ব্যবহারের ক্ষেত্র পাচ্ছে না—এই কথাও উঠে এসেছে একটি সমীক্ষায়, যা দেখাচ্ছে : ৫১% পরিবারে কেবলমাত্র ১ জন ওয়েলশ ভাষার বাচক আছে। এছাড়া ৭০% পরিবারে ওয়েলশ ভাষার বাচক কোনো শিশু নেই।[৩৪] সুতরাং এই সমস্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রবৃদ্ধি হলেও বাচকগোষ্ঠীর ঘনীভূত উপনিবেশ ভেঙে যাওয়া, পরিবার ও বাসক্ষেত্রে ওয়েলশ ভাষা-পরিবেশ না পাওয়া ক্রমশ ছোটদের মুখে ওয়েলশ ভাষার বেঁচে থাকাকে কঠিন করে তুলছে।

২. ওয়েলশ ভাষা-আন্দোলনকারীদের বহু উদ্যোগ-সক্রিয়তা-সৃষ্টিশীলতার ভিতের উপর গড়ে উঠেছিল ওয়েলশ ভাষায় বেতার সম্প্রচার (রেডিও সিমরু) এবং দূরদর্শন সম্প্রচার (এস ফোরসি)। কিন্তু ক্রমশ সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কাটছাঁট হয়ে গিয়ে বাণিজ্যিক উপায়ে অর্থসংগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়ার পর থেকে এরা ধীরে ধীরে কেবলমাত্র ওয়েলশ ভাষায় সম্প্রচার ও ওয়েলশ সংস্কৃতি তুলে ধরা থেকে সরে আসছে বাণিজ্যিক সাফল্যের (রেটিং উন্নত করা, বিজ্ঞাপন আরও জোগাড় করা) খোঁজে। ক্রমশঃ এই দুটিই দ্বিভাষিক (অর্থাৎ ইংরেজি সম্প্রচার শুরু করা) হয়ে উঠে ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় তাদের ভূমিকা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিচ্ছে।

৩. ওয়েলশ জাতীয় বিধানসভা ওয়েলশ ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সত্যিই কতটা আগ্রহী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায় যখন দেখা যায় যে বিধায়করা তাদের স্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিধানসভার কাজে ওয়েলশ ভাষা ব্যবহারে মোটেই উৎসাহী নন—১৯৯৯ সালে ওয়েলশ জাতীয় বিধানসভার সমস্ত আলাপ-আলোচনার মাত্র ১০% থেকে ১২% ওয়েলশ ভাষায় হয়েছিল।[৩৫]

ওয়েলশ ভাষার মৃত্যু-সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনা তাই এখনও দূর হয়নি। যমের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ এখনও বাকি। ১৯৭২ সালে 'ভাষার নিয়তি' (Tynged yr laith)-র পুস্তকাকারে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সনডার্স লিউইস যা লিখেছিলেন, আজও তা প্রাসঙ্গিক—

> ওয়েলশ ভাষাকে একটি কথ্য ও লিখন মাধ্যম হিসেবে সংরক্ষিত করার জন্য যতদূর পর্যন্ত সম্ভব সংগ্রাম করা হল ঠিক কাজ কারণ একমাত্র তার মধ্য দিয়েই সেই সমস্ত মানুষদের সম্মান জানানো যেতে পারে যারা পৃথিবীর এই অঞ্চলটিতে মানবসমাজ গড়ে তুলেছিল এবং এখনও যারাই এই অঞ্চলের দাবিদার। এক হাজার পাঁচশ বছর

> ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া যে ভাষা, সেই ভাষার মৃত্যুতে বিনা আপত্তিতে সায় দেওয়া মানে মানুষকে ঘৃণা-অবজ্ঞা করা। যে সমাজ মানুষকে ঘৃণা-অবজ্ঞা করে, দুঃখে নিমজ্জিত হওয়াই তার ভবিতব্য।

টীকা/তথ্যসূত্র

১. ইংরেজিতে ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম অর্থে বিশেষ্য হিসাবে 'Wales' লেখা হয় এবং ওই অঞ্চলের বেঝাতে বিশেষণ অর্থে 'welsh' লেখা হয়। এই লেখায় বিশেষ্য অর্থে 'ওয়েলস' ও বিশেষণ অর্থে 'ওয়েলশ' ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এই অংশে উদ্ধৃত তথ্যের সূত্র :
জেরিয়ান্ট এইচ. জেনকিনস (সম্পাদিত), A Social History of the Welsh Language (Vol. 5): The Welsh Language and its Social Domains : 1801—1911, ওয়েলস ইউনিভার্সিটি, কার্ডিফ দ্বারা প্রকাশিত, ২০০০ সালের সংস্করণ।

৩. Report of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales, 18471

৪. ম্যাথু আর্নল্ড, On the Study of Celtic Literature, ১৮৬৭।

৫. থমাস নিকোলাস, The Pedigree of the English People, ১৮৬৭, পৃ. ৯৭-১১৬।

৬. ২-এর অনুরূপ।

৭. হ্যাভলক এলিস, A Study of British Genius, ১৯০৪, পৃ. ২৩-২৪।

৮. ওয়েলশভাষীদের লেখা এমন কিছু স্মৃতিকথার উদাহরণ :
ক) ও. এম.এডওয়ার্ডস, Clych Atgof, ১৯২১, চ্যাপ্টার-১।
খ) হেনরি জোনস, Old Memories, ১৯২২, পৃ. ৩০-৩২।
গ) ডাবলু. সি. এলভেল থমাস, Tyfun Gymro, ১৯৭২, পৃ. ১০১, ১০৭-১০৮।
ঘ) ডি. টেচউইন লয়েড, Dynch O Genedl, ১৯৮৭, প. ৪৮।

৯. দিফেদ ইভানস, Bywya Bob Owen, ১৯৭৭, পৃ. ১৩।

১০. ১৮০১-এ ওয়েলস-এর জনসংখ্যা ছিল ৬,০১,৭৬৭। ১৮৫১-য় তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে হয়েছিল ১১, ৮৮, ৯১৪। তার পরের ৬০ বছরে তা আবার দ্বিগুণ হয়ে ১৯১১-য় হয়েছিল ২৪, ৪২, ০৪১। তথ্যসূত্র ২-এর অনুরূপ।

১১. বেরিয়াহ গুইনফে ইভানস, 'Cymro, Cymru a Chymraeg', yn eu cysylltiad ag Addysg, পৃ. ৬৭-৬৮।

১২. ২-এর অনুরূপ।

১৩. উৎকৃষ্টমানের কয়লাকে ল্যাঙ্গনেখ-এ বলা হতো 'gwitho fel flowd' (আটার মতো কার্যকরী), পন্টিবেরেম-এ বলা হতো 'gwitho fel dwr' (জলের মতো কার্যকরী) এবং গ্লামোরগান ও কারমারথেনশায়ার-এর বহু খনিতে বলা হতো 'gwitho fel menyn' (মাখনের মতো কার্যকরী)।

১৪. ২-এর অনুরূপ।

১৫. Y Punch Cymraeg, ১২ মার্চ ১৮৬৪, পৃ. ৬।

১৬. ২-এর অনুরূপ।
১৭. লিউইস ভ্যালেনটাইন, Dyddiadur Milwr a Gweithiau Eraill (জন এমির সম্পাদিত) ১৯৮৮, পৃ. ১১।
১৮. এখানে উদ্ধৃত তথ্যের সূত্র:
জেরিয়ান্ট এইচ জেনকিনস ও মারি এ উইলিয়ামস সম্পাদিত, A Social History of Welsh Language, Volume-6; 'Let's, do our best for the ancient tongue': The Welsh Language in the 20th Century, ওয়েলস ইউইনভার্সিটি, কার্ডিফ, ২০০০।
১৯. ১৭-এর অনুরূপ, পৃ. ৪৩।
২০. ১৮-এর অনুরূপ।
২১. হ্যারি ওয়েব, মেইক স্টিফেনস-এর কাছে চিঠি, Poetry Wales, II, no. 3, ১৯৬৬, পৃ. ৩৭।
২২. ডাবলু জে গ্রুফিড, Y Llenas, ১৯৩১।
২৩. ১৮-এর অনুরূপ।
২৪. ইসলউইন ফোয়ে এলিস, Wynthos yng Nghymru Fydd, ১৯৫৭।
২৫. সন্ডার্স লিউইস, Tynged yr laith, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২।
২৬. জে আর জোনস, Gwaedd yng Nghymru, ১৯৭০, পৃ. ৮১-৮২।
২৭. ১৮-এর অনুরূপ।
২৮. ১৮-এর অনুরূপ।
২৯. ১৮-এর অনুরূপ।
৩০. ১৮-এর অনুরূপ।
৩১. জে. বি. জোনস ও ডি. বালসম (সম্পাদিত), The Road to National Assembly, কার্ডিফ, ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
৩২. স্কট এল. গ্রিয়ার, Nationalism and Self-Government, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক প্রেস, ২০০৭, পৃ. ১৪৬, ১৮১-১৮২।
৩৩. এই সমীক্ষাটির প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এই বইতে: কলিন বেকার ও মেইরিওন প্রিস জোনস, Dilynist mewn Addysg Gymraeg, ওয়েলশ ভাষা পর্ষদ, ১৯৯৯।
৩৪. এই সমীক্ষাটির প্রতিবেদন পাওয়া যাবে:
জন এইচিসন ও হ্যারল্ড কার্টার, Household Structures & the Welsh Language, Planet, ১১৩, ১৯৯৫।
৩৫. ১৮-এর অনুরূপ।

চতুর্থ অধ্যায়

শিকার ও শিকারী

এলিয়াস কানেট্টি তাঁর ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'মাসসে উন্ড মাখট' (ভিড় ও ক্ষমতা) বইয়ে লিখেছিলেন:

> যখন কেউ জনগোষ্ঠীর উপর শাসন কায়েম করতে চায়, তখন সে কী করে? প্রথমে সে সেই জনগোষ্ঠীকে অপমান-অপদস্থ করার চেষ্টা করে, কৌশলী উপায়ে তাদের সমস্ত অধিকার হরণ করে নিতে চায়, প্রতিরোধের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে চায়, যাতে তারা তার সামনে জানোয়ারের মতো ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। সে সেই জনগোষ্ঠীকে জন্তুদের মতো কাজে লাগিয়ে নিতে চায়, সরাসরি তাদের মুখে না বললেও, নিজের মনে সে স্পষ্টভাবেই মনে করে যে জন্তুদের থেকে উৎকৃষ্টতর কিছু তারা নয় এবং ঘনিষ্ঠ স্যাঙাতদের সঙ্গে কথোপকথনে তাদের গরু বা ভেড়া বলেই উল্লেখ করে। তাদের সমস্ত সারবস্তু শুষে নিয়ে নিজদেহে আত্মীকৃত করে নেওয়াই হয়ে ওঠে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।... নিজদেহে আত্মীকৃত করে নেওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথে এই জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার চাপ বহাল রাখে যা শিকারীর খাদ্যে পরিণত হওয়া সেই জনগোষ্ঠীকে গলিয়ে-পচিয়ে পাচকক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিকারীদেহের কোষগুলিতে নিঃশেষে শুষে নিতে চায়। এ এক সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ধ্বংসপ্রক্রিয়া। প্রথমে ধ্বংস হয় তাদের স্বতক্রিয়ার সক্ষমতা, তারপর ধংস হয় তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। জনগোষ্ঠীটি এভাবে শিকারী খাদকের দেহে বিলীন হয়ে যায়, অর্থাৎ, আগে থেকেই হাজির থাকা বর্গে আত্মীকৃত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া হয়ত চোখের আড়ালে থেকে যায়, কিন্তু এটাই হল যে কোনও ক্ষমতাপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় পন্থা।[১]

জাতি রাষ্ট্র যখন জাতি-আত্মম্ভরিতার আস্ফালন করে অন্যান্য জনজাতির উপর শাসন কায়েম করতে চায়, তখন সেই প্রক্রিয়ায় যেভাবে তা শাসিত জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারকে হেয় প্রতিপন্ন করে ধ্বংস করে দিতে চায়, কানেট্টি যেন এখানে তাই-ই বর্ণনা করছেন। ভাষার মৃত্যু, সংস্কৃতির অন্তর্ধান, পরম্পরার ধারা শুকিয়ে যাওয়া, জনজাতির স্বতন্ত্র পরিচয়ের বিলুপ্তি—এই পথ ধরে শাসিত জনজাতিকে গলিয়ে-পচিয়ে দুর্বল অনুকরণকারী হিসেবে শাসক জাতির মধ্যে

তলার ধাপে শোষণ করে নেওয়াই হল এই শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আগের অধ্যায়ে তার এক মূর্ত উদাহরণ আমরা দেখেছি। এই রাহুগ্রাসে পতিত জনজাতি সর্বত আত্মসমর্পণ করে না, রাহুগ্রস্ত হওয়ার নিয়তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও দেখা যায়। আগের অধ্যায়ে যেমন আমরা দেখেছি আগ্রাসী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়েলশদের প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবাদের বিকাশ, ওয়েলশ ভাষা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন আন্দোলন দানা বাঁধা ও অবশেষে স্বশাসনের অধিকার আদায়ের জন্য প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা। শিকারীর গ্রাস থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটি প্রাথমিক শর্ত নিশ্চয়ই শিকারীর শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়া। এই অব্যহতির পথ কী?

ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ, স্প্যানিশ—এই ইউরোপিয় জাতিরাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিক শাসনবিস্তারের মধ্য দিয়ে এহেন যে শিকারী শাসনের জাল বিশ্বজুড়ে বিস্তার করেছিল, তা আজ আর সেই রূপে তাবশিষ্ট নেই। উপনিবেশগুলোর পতন ঘটেছে। সেখানে শাসিত জনজাতিগুলোরই কেউ কেউ নিজেদের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে কি রবীন্দ্রনাথ কথিত আত্মহত্যার বহ্নুৎসবের অবসান ঘটেছে? কানেট্টি বর্ণিত ক্ষমতাপ্রক্রিয়া শাসনের কেন্দ্র থেকে অন্তর্হিত হয়েছে?

দুটি দৃষ্টান্তকে ধরে আমরা এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করব এর পরের দুটি অধ্যায়ে। প্রথম দৃষ্টান্তটি হল বাংলাভাষীদের ভাষিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান, বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন ও এতাবধি তার পরিণতি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর তৎকালীন বর্মায় (বর্তমান মায়ানমারে) বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের শাসনকথা।

সূত্রনির্দেশ

১। এলিয়াস কানেট্টির 'মাসসে উন্ড মাখট' বইটির মূল জার্মান ভাষা থেকে ক্যারল স্টিউয়ার্ট-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'ক্রাউডস অ্যান্ড পাওয়ার' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ইংরেজি অনুবাদের ২১০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি বর্তমান লেখক বাংলায় অনুবাদ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা, জাতীয়তাবাদ, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

অবতরণিকা

১৯৫২ ও ১৯৭১ বাংলা ভাষার ইতিহাসের আধুনিক কালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৫২ সালে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠা ও সেই সূত্রে ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সেনার গুলিতে ভাষাশহিদদের মৃত্যু বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠান্দোলনে জোয়ার এনেছিল। সেই জোয়ারের ভাটি বেয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার নির্ধারণ বাংলা ভাষার সামনে এক নতুন সম্ভাবনা খুলে দিল। এতাবৎ কাল বৃহৎবঙ্গের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হলেও প্রশাসনিক রাজকাজে ক্ষমতার অলিন্দে বাংলা ভাষা ছিল ব্রাত্য। মধ্যযুগে ফারসি ভাষা ও আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষা প্রশাসন, রাজদরবার ও ক্ষমতার অলিন্দের ভাষা ছিল। সেই অলিন্দে প্রবেশাধিকার বা এক কোণায় একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য বাঙালির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ফারসির সময়ে ফারসি ও ইংরেজির সময়ে ইংরেজি আয়ত্ব করা ও তা ফলাও করে আত্মউন্নতির চেষ্টার ইতিহাসও দীর্ঘ। সেই ইতিহাসে যেন বা ছেদের সম্ভাবনা নিয়ে এল ১৯৭১। বঙ্গদেশের একাংশে হলেও, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর অবধি সমাজের সমস্ত স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনের প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হল। তারপর কেটে গেছে ৫০ বছর, অর্থাৎ অর্ধ শতাব্দী। এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন কোন পথে এগোল এই আধা শতকে? কী কী টানাপোড়েনে বোনা হল বাংলা ভাষার সামাজিক অস্তিত্বের জমি এই সময়কালে? এই প্রশ্নগুলো ধরেই বর্তমান আলোচনার বিস্তার।

আলোচনা শুরু করা যাক এইটা স্পষ্ট করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে কোনো ভাষার সর্বস্তরে প্রচলন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। সমাজে ভাষা-ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে। একটি ক্ষেত্র হল ভাষা-ব্যবহারকারীর নিজস্ব পরিবার ও নিজস্ব ঘনিষ্ঠ মণ্ডলীর মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্র। এর বাইরে হল ভাষা-ব্যবহারের বিস্তৃততর সামাজিক ক্ষেত্রগুলি, যাদের এইভাবে ভাগ করা যায়—

১. দাপ্তরিক যোগাযোগ বা জ্ঞাপনের ক্ষেত্র, যা আবার সরকারি ও বেসরকারি এই দুই দাপ্তরিক ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।
২. আদালত বা আইনি বোঝাপড়া ও মোকাবিলার ক্ষেত্র।
৩. শিক্ষাক্ষেত্র, যার মধ্যে যেমন একদিকে আছে লোকশিক্ষার ক্ষেত্র, তেমন অন্যদিকে আছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মতো বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্র।
৪. গণযোগাযোগ মাধ্যম, যা মুদ্রিত, দৃশ্য, দৃশ্য-শ্রাব্য ও বৈদ্যুতিন, এমন নানা ভাগে বিভক্ত।
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য।
৬. সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা প্রদত্ত সেবার নিরিখে বিদ্যুৎ, গ্যাস, দূরভাষ, স্বাস্থ্যপরিষেবা, পরিবহন ও জ্ঞাপন, এমন নানাভাগে ভাগ করা যায়।

কোনো ভাষার সর্বস্তরে প্রচলন বলতে এই সবকটি ক্ষেত্রে প্রচলন বোঝায়। দীর্ঘকাল ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসনের পদানত থাকার মাসুল স্বরূপ ভারতের দাপ্তরিক যোগাযোগ, আইন-আদালত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, গণযোগাযোগ মাধ্যম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষার প্রায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারস্বরূপ বাংলাদেশের ঘাড়েও চেপেছিল এই বোঝা। তাছাড়া ১৯৪৭-এর পর হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারী পাকিস্তানপন্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে 'মুসলমানের ভাষা' উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও বাংলা ভাষার সামাজিক অস্তিত্বকে খর্বিত করতে চেয়েছিল। এই দুইয়ের বিপরীতে নিজস্ব সামাজিক শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটাতে পারলে তবেই সম্ভবপর ছিল সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন। বাংলাদেশের মাটিতে বাংলা ভাষা প্রচলনের পক্ষে এই নিজস্ব সামাজিক শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশ কি ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য প্রথমে অবলম্বন করা যাক আনিসুজ্জামানের একটি

পর্যবেক্ষণকে। আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের এক অগ্রগণ্য গবেষক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক, যিনি ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশে শিক্ষা ও ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, বাংলা একাডেমির কাজেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০০৮ সালে ১৯৭১-পরবর্তী অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে 'বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। ১৯৭২ সালে বাংলায় সংবিধান রচিত হল। তাতে বলা হল, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। পরিকল্পনার দলিল বাংলায় প্রণীত হল, বিপুল উৎসাহে সরকারি দপ্তরে বাংলায় নথিপত্র লেখা শুরু হয়ে গেল, উচ্চশিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে বাংলা হয়ে উঠল বাহন। উচ্চ আদালতে বাংলা প্রবেশাধিকার পেল না বটে, কিন্তু নিম্ন আদালতে তা হয়ে গেল একচ্ছত্র। বড়ো বড়ো চিকিৎসক বাংলায় ব্যবস্থাপত্র লিখতে শুরু করে দিলেন। পাঠ্যপুস্তক কিছু কিছু বাংলায় লেখা হল বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা পাঠ্যপুস্তক লেখায় তেমন করে এগিয়ে এলেন না কিংবা বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও ভাষা-বিশেষজ্ঞের তেমন সহযোগ ঘটল না। এমন অবস্থায় উপায় একটাই—ইংরেজিতে বইপত্র পড়ে বাংলায় পড়ানো এবং পরীক্ষা দেওয়া। কিছুকালের মধ্যে আবিষ্কৃত হল যে, ইংরেজিতে আমাদের দখল ক্রমে কমে আসছে। তখন দোষ পড়তে শুরু করল বাংলার ঘাড়ে: বাংলা-বাংলা করে আমরা ইংরেজিকে অবহেলা করেছি, তাতে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সংযোগ নষ্ট হতে চলেছে। এই ত্রুটি দূর করতে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের প্রাদুর্ভাব ঘটল। স্বাধীনতার কল্যাণে ততদিনে বাঙালি মধ্যবিত্তের কিঞ্চিৎ ধনাগম হয়েছে। এক পুরুষ আগে যে-মধ্যবিত্ত বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, এখন আন্তর্জাতিকতার খাতিরে সে নিজের সন্তানদের বাংলা ভাষা থেকে দূরে রাখতে প্রবৃত্ত হল। আমার সন্তানেরা সবাই বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছে, আমার নাতি-নাতনিরা সবাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে। ইংরেজি স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়ানোর সামর্থ্য যার নেই, সেও অতি কষ্ট করে সেখানেই ছেলেমেয়ে পাঠাচ্ছে এই আশায় যে, সেখানকার শিক্ষাই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এখানকার শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের অধিকাংশের চোখে স্বপ্ন পাশ্চাত্য জগতে স্থিতিলাভ করার, মন্ত্র অনেকটা 'আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি'। এদিকে বাংলা বিদ্যালয়গুলো ক্রমশ হতশ্রী হয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে ছাত্রসংখ্যা সর্বত্র বাড়ছে, তাদের চাহিদা মেটাতে অধিকসংখ্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক সবসময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ভাষাশিক্ষার পদ্ধতিও নেহাত ত্রুটিপূর্ণ। ফলে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী বাংলা ও ইংরেজি কোনোটাই ভালো করে শিখছে না। আমরা ইংরেজিতে দক্ষতাহীনতার জন্য আপশোস করি, বাংলার অদক্ষতা আমাদের চোখ-কান এড়িয়ে যায়। দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাষাশিক্ষার কাজটায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিকার হিসেবে আমরা ভিনদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে বসে আছি।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে একসময়ে সিদ্ধান্ত হল, রাষ্ট্রপতির কাছে যেসব নথি যাবে, তার সারমর্ম ইংরেজিতে তৈরি করতে হবে (কারণ ওই বিশেষ রাষ্ট্রপতি বাংলা তেমন ভালো জানতেন না)। এই সুযোগে যেসব নথি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে না, তাতেও ইংরেজি লেখা শুরু হল। ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের অভাব, কিন্তু ফাইলে ইংরেজি লেখার লোকের অভাব নেই। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, এমন এক রাজনীতিবিদ, হাইকোর্টে মামলা করে রায় পেয়ে গেলেন যে, নিম্ন আদালতেও ইংরেজিতে লেখা আরজি গ্রহণ করা হবে। উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের কেউ কেউ বাংলায় রায় লিখতে অগ্রসর হলেন বটে, কেউ কেউ আবার বলে দিলেন, তাঁর আদালতে বাংলা চলবে না। পরিভাষার প্রশ্ন নতুন করে উঠেছে। কেউ কেউ যুক্তি দিচ্ছেন যে, শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে এসে যখন অক্সিজেন-হাইড্রোজেন নিতে হবে, তখন নিম্নপর্যায়ে আর অম্লজান-উদ্‌জান রেখে কী হবে, গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক পরিভাষার মধ্যে থাকাই শ্রেয়।[১]

আনিসুজ্জামানের এই বক্তব্য থেকে বেশ কিছু বিষয় সামনে উঠে আসে, যেমন:

১. ১৯৭১-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পর সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ বেশ উৎসাহের সঙ্গে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন, দাপ্তরিক কাজে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নিম্ন ও মধ্য স্তরে, নিম্ন আদালতে, চিকিৎসা-পরিষেবায়)।
২. কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সেই উৎসাহের ধারা ক্ষীণতর হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের পরের প্রজন্মের কাছে বাংলাভাষা একই কদর পায়নি। বাংলা ভাষা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের কাছে স্বরূপশনাক্তির উপাদান, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ইংরেজি আয়ত্ত করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবহার করে আত্মউন্নতির স্বপ্ন দেখেছে।
৩. রাজনৈতিক পরিবর্তনও এই ক্ষেত্রে কাজ করেছে।
৪. ফলস্বরূপ, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা যেমন হতোদ্যম হয়েছে, তেমনই বাংলা-প্রচলনের পূর্বপ্রচেষ্টার বেশ কিছু অর্জনও হাতছাড়া হয়েছে। দাপ্তরিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, আদালতে ইংরেজির মহিমা আরও গেঁড়ে বসেছে।
৫. বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা অবহেলিত তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে অবহেলিত হচ্ছে বাংলা ভাষাশিক্ষাও।

সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের প্রয়াসের এই প্রাথমিক এগোনো ও তারপর বিপুল পিছানোর ঘটনা ঘটল কীভাবে? প্রাথমিকভাবে এগোলই বা কীসের

জোরে, আর পরবর্তী বিপুল পশ্চাদগতিই বা কোন দুর্বলতায়? কোন সময় থেকেই বা পশ্চাদগতির শুরু বলে ধরা যায়? এই প্রশ্নগুলোকে বিচার করার জন্য আনিসুজ্জামান যে সময়কাল ও বাস্তবতাকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে হাজির করেছেন, তার আরও কিছুটা কাছাকাছি গিয়ে আরও কিছুটা নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক।

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সময়পর্যায়কে তিন ভাগ করে নেওয়া

হুমায়ুন আজাদ যেমন বাংলাদেশের এক কৃতী ভাষাতাত্ত্বিক, তেমনই তিনি বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি ও প্রাবন্ধিক। ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার নাম 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র'। প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁর অননুকরণীয় তীব্র, আবেগদীপ্ত অথচ বিশ্লেষণী ভঙ্গি ও ভাষায় বাংলা-প্রচলনের বিরুদ্ধশক্তিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সেখানে তাঁর লেখায় আমরা পাই:

স্বাধীনতার (১৯৭১-এর) অব্যবহিত পরে বাংলা প্রচলনে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল...। কিন্তু পঁচাত্তরের পর স্রোত বিপরীতমুখি হয়ে ওঠে—উগ্র হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতা—'বাংলাদেশ বেতার', 'চালনা বন্দর', 'পৌরসভা', 'রাষ্ট্রপতি' প্রভৃতি 'রেডিও বাংলাদেশ', 'পোর্ট অব চালনা', 'মিউনিসিপাল কর্পোরেশন', 'প্রেসিডেন্ট' হয়ে উঠতে থাকে। বাংলার মর্যাদা হ্রাস পায়, তার অর্থমূল্য ক্রমশ কমতে থাকে এবং উৎসাহীরাও পুনরায় ইংরেজিমুখি হয়ে ওঠেন।[২]

এখানে আমরা আনিসুজ্জামানের প্রাথমিক উদ্দীপনা ও পরবর্তী পশ্চাদগতির বক্তব্যের সমর্থন পাই এবং এই পশ্চাদগতি শুরুর সময়বিন্দু সম্পর্কেও একটি নির্দেশ পাই—১৯৭৫। ১৯৭৫-এর আগে ও পরে পরিস্থিতির কী পার্থক্য ঘটে গেল যাতে হুমায়ুন আজাদের কাছে তা একটি মোড় ঘোরার সূচক হয়ে উঠল, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ১৯৭৫ পূর্ববর্তী সময়পর্যায়েও ১৯৭১-এ বাংলাদেশ-এর আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক বিভাজিকা হিসাবে কাজ করছে। ফলে আলোচনার জন্য আমরা গোটা সময়পর্যায়কে তিন ভাগে ভেঙে নিচ্ছি—১৯৭১-পূর্ববর্তী কাল, ১৯৭১-১৯৭৫ ও ১৯৭৫ পরবর্তী কাল।

১৯৭১-পূর্ববর্তী কাল

১৯৪৭ সালে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতের গর্ভ থেকে যখন ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল, তখন পাকিস্তানের যে শাসকগোষ্ঠীর হাতে ঔপনিবেশিক প্রভুরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেল, তারা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব

পাকিস্তান, এই দুই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের মানুষদের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বাঁধনে একত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। এই পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল মুসলমান হিসাবে স্বরূপ-শনাক্তি বা স্বপরিচয়-নির্মাণ। এই স্বরূপ-শনাক্তি বা স্বপরিচয়-নির্মাণের প্রমিতিকৃত অবয়বে মুসলমানের যে ধারণাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল তা উর্দু-ব্যবহারকারী আশরফদের ধারণা। এই আশরফরা মুসলমানদের মধ্যের অভিজাতবর্গ, যারা নিজেদের ইরান বা পারস্য থেকে আসা মহম্মদ বা তার মেয়ের বংশের উত্তরপুরুষ বলে মনে করত। বাকি মুসলমানদের তারা হীন ও অশুদ্ধ হিসাবে আজলফ বা আতরফ হিসাবে ঘৃণা করত। আশরফি কেতা অনুযায়ী গোঁড়া শরিয়তী ধর্ম ও উর্দু ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বঙ্গের মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশের কাছে এই জাতীয়তাবাদ কীভাবে দেখা দিয়েছিল, তা বোঝার জন্য বঙ্গের মুসলমানদের নিজস্ব ইতিহাস ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নেওয়া দরকার। বাংলাদেশের বরিষ্ঠ গবেষক আহমদ শরীফের মতে:

> প্রমাণে-অনুমানে বোঝা যায়, তেরো শতকে গাঁয়ে-গঞ্জে ইসলাম প্রচার শুরু হলেও চোখে পড়ার মতো মুসলিম গাঁয়ে গাঁয়ে দুর্লভ ছিল।... আমরা যদি অনুমান করি যে, তেরো শতকে শতকরা একজন, চৌদ্দ শতকে তিনজন, পনেরো শতকে ছয়জন, ষোলো শতকে বারোজন, সতেরো শতকে পনেরোজন, আঠারো শতকে বাইশজন, তাহলে উনিশ শতকের শেষপাদের শুরুতে উভয় বঙ্গে শতকরা বত্রিশ জন মুসলিম পাওয়া সম্ভব।...
>
> এদের ও এদের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত জ্ঞাতিদেরও কোনো লেখাপড়ার অধিকার বা ঐতিহ্য ছিল না। সুনির্দ্দিষ্ট বৃত্তিজীবীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত সমাজে বৃত্তিগত ও অর্থসম্পদগত দুঃস্থতার দুরবস্থার এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য।...
>
> কেনা-বেচা, জমি-জমা সম্পর্কিত হিসেব-নিকেশের প্রয়োজনবোধে এবং কোরআন পড়ার ও নামাজ-রোজা সম্বন্ধীয় আবশ্যিক নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি জানার-জানানোর গরজ-চেতনাবশে কেউ কেউ সন্তানকে বিদ্যালয়ে, মক্তবে, পাঠশালায় পাঠাত। এমন লোক ছিল হয়ত হাজারে একজন। এরাই মোল্লা, মুয়াজ্জিন, খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি, উকিল-মোক্তার, মুনশী-মৌলবী, আমিন প্রভৃতি এবং কিছু লোক দফতরের আদালতের নায়েব, গোমস্তা, সরকার, পাটোয়ারি-মৃধা-বন্দুকশি, সিপাহী হতো।...
>
> গাঁয়ে গাঁয়ে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা শাস্ত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি ও স্বাতন্ত্র-চেতনা জাগানোর মতো বৃদ্ধি পেল সম্ভবত পনেরো শতকের শেষপাদ থেকে।... দেশজ বৌদ্ধ হিন্দু যোগ-তন্ত্র প্রভাবিত সুফীবাদের সঙ্গে শরীয়ত-সম্মত ইসলামের এবং স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস-আচার-সংস্কারের অসঙ্গত অসমঞ্জস মিশ্রণে-

> সমন্বয়ে এক লৌকিক ইসলামই ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বাবধি বাংলাদেশে প্রজন্মক্রমে চালু ছিল।... কোরআন-হাদিস অনুগ বিশুদ্ধ ইসলাম বিশ্বাসে ও আচরণে মানা সম্ভবও ছিল না দুটো কারণে। প্রথমত, শাস্ত্র ছিল আরবি ভাষায় লিখিত, বিদেশির বিভাষা আয়ত্ত করা বিদ্যালয়-বিরল সে যুগে ক্বচিৎ কারও পক্ষে সম্ভব ছিল, আলিম মৌলবী আজও সর্বত্র শত শত মেলে না। দ্বিতীয়ত, স্থানিক কালিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পরিবেশে মানুষ আশৈশব লালিত হয়, তার প্রভাব এড়াতে পারে না। শাস্ত্রীয় গোত্রীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্যের আচারের, সংস্কারের মিশ্র ও সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মন-মনন-আচার-আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে বাঙালির ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ 'ইসলাম' নয়—তা মুসলমান ধর্ম যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন-হাদিসের পাশে পীর-দরবেশ-দরগাহ, মন্ত্র, মাদুলী, তাবিজ, দোয়া, ঝাড়-ফুঁক-তুক-তাক।[৩]

অতি অল্প সংখ্যক কিছু আশরফদের বাদ দিয়ে বাংলার ব্যাপক মুসলমানের কাছেই তাই গোঁড়া শরীয়ত ও উর্দুভাষা কেন্দ্রিক স্বপরিচয়-নির্মাণ ছিল নিজেদের জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে বেখাপ্পা। তাছাড়া এই স্বপরিচয়-নির্মাণের উদগাতাদের সঙ্গে তাদের সামাজিক দূরত্বও ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসকদের বংশ বা রাজপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে প্রচুর সম্পত্তির মালিক, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক বা গ্রামের অন্যান্য নিম্ন-মর্যাদার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গীয়দের সমকক্ষ হিসাবে দেখত না, দেখত অশুদ্ধ মুসলমান হিসাবে যাদের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের মাপে শুদ্ধীকরণ করে পাকিস্তানের পাক (যার অর্থ পবিত্র) নাগরিক করে তুলতে হবে।

পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের কাছে পাকিস্তানের আকর্ষণের উৎস ছিল অন্য সমাজ-অর্থনৈতিক কারণ, যা আহমদ শরীফ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

> বাঙালি মুসলমান জন্মাবধি দেখছিল—জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, শিক্ষিতেরা হিন্দু, চাকুরেরা হিন্দু, উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ীরা হিন্দু, অফিস হিন্দুর, প্রশাসনও হিন্দুর। স্কুল-কলেজের বাংলার বইগুলোতে ছিল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা। ফলে অর্থে বিত্তে বেসাতে ও শিক্ষায় বঞ্চিত মুসলমানের হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ঘন হয়ে ওঠে। এ কারণে পাকিস্তান হয়েছিল তাদের কাম্য। মুসলিম লিগের আহ্বানে নির্দ্বিধায় মুক্তিসনদরূপ পাকিস্তান আদায়ের সংগ্রামে তাই সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালিরাই। তারপর কোলকাতার, নোয়াখালির ও বিহারের দাঙ্গা হিন্দু-বিদ্বেষ করেছিল তীব্র। এখন এখানে মুসলিম ও পাকিস্তানপন্থী প্রায় সমার্থক, কখনও কখনও এবং কারুর ক্ষেত্রে অভিন্নার্থকও। তাই সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে শত্রু ছিল কেবল হিন্দুই।[৪]

কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র তার স্থিতির খোঁজে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে শরিয়তী আচরণ ও উর্দু ভাষার ভিত্তিতে দাঁড় করানোর সাথে সাথে বাঙালি মুসলমানরা আবার নিক্ষিপ্ত হল বৈষম্যভিত্তিক এক সোপানতন্ত্রে সবার তলায়। তাদের সংস্কৃতি, তাদের অভ্যস্ত জীবনাচার, তাদের ভাষা, সবকিছুকেই চিহ্নিত করা হল তাদের খামতি হিসাবে, এবং এইসব খামতিকে পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকর হিসাবে তুলে ধরা হল। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন :

> সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের প্রভুরা যে সমস্ত ভাষণ দিয়েছেন, সেগুলোর পংক্তিতে পংক্তিতে দেখেছেন তাঁরা শত্রু কম্যুনিস্টদের, বিদেশের অনুচরদের, ইসলামবিরোধীদের। তাঁদের দুঃস্বপ্নে ঢুকে গিয়েছিল বাঙালি ও বাংলা ভাষা।[৫]

শাসকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্ববাংলার উপর সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রয়াস পূর্ব বাংলার অগণিত মানুষের বোধে এক ঔপনিবেশিক শাসনের (ইংরেজ শাসনের) কবলমুক্ত হয়ে আরেক ঔপনিবেশিক শাসনের (পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের) কবলে পড়ার যন্ত্রণা তৈরি করেছিল। পাকিস্তানী শাসকদের এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কেন্দ্রে চলে এসেছিল বাংলা ভাষার প্রশ্ন।

দুই পাকিস্তান মিলে বাংলাভাষীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের কেউ কেউ বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের উদগাতারা উর্দুকেই মুসলমানের ভাষা বলে ঠাউরেছেন আর তাই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা থেকে পিছু হঠতে রাজি নয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাবকরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। এই দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাকিস্তানী সরকারের প্রতিনিধি নিজামউদ্দিন ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে দুটি দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেগুলি হল :

১. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে এদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাওয়ার পরই বাংলা তার জায়গায় সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃত হবে। তা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হবে বাংলা।
২. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হয়েছে, সেদিন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার এবং তাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটা বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

ছাত্রদের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষায় উর্দুর সঙ্গে সমমর্যাদায় বাংলা রাখার দাবি বিশেষভাবে থাকা দেখায় যে নতুন রাষ্ট্রে প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নিযুক্তির সুযোগ করে নেওয়া তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ধরনের নিযুক্তি শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী অংশের কাছে সামাজিক সোপানতন্ত্রে উপরে ওঠার এক নিশ্চিত উপায়। উর্দুতে দখল না থাকার জন্য যাতে এই উপায় হাতছাড়া ন হয়ে যায় তা নিয়ে উদ্বেগ এই দাবিটিকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু খাজা নিজামুদ্দিন তাঁর কথা রাখেননি। বরং ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের শীর্ষনেতা জিন্না ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন যে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দুই, অন্য কোনো ভাষা নয়, আর যারা বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন করছেন তাঁরা নানা বিদেশী এজেন্সির অর্থসাহায্যপুষ্ট চর'। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের বিপুল প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়।

পাকিস্তানপন্থী নেতা-মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও হরফের সংস্কার করে তার ইসলামিকরণের চেষ্টাও এইসময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান চট্টগ্রামের ইস্কুল-শিক্ষক আবদুর রহমান বেখুদ-কে দিয়ে 'হুরফুল কোরান'-এর নামে আরবি বর্ণমালা দিয়ে বাংলা বর্ণমালাকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রণোদনায় এক উর্দুভাষী জনশিক্ষা পরিচালক প্রস্তাব পেশ করেন যে বাঙালি মুসলমানদের ভাষা উর্দুরই একটি রূপান্তরমাত্র এবং উর্দু হরফে লিখলে তা উর্দু বলেই মনে হবে। এছাড়াও বাংলার নানা প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন ও বাক্‌ধারকে বদলে আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকিয়ে ইসলামিকরণের চেষ্টা করা হয়।[৬]

ভাষা, হরফ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে। একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে, অন্যদিকে তেমনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে হিন্দু ঐতিহ্যানুসারী পৌত্তলিকতার অভিযোগ ওঠে এবং তার ইসলাম-অনুগ সংস্কারের নানা প্রস্তাব আসতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যেও কোনটা বর্জনীয় আর কোনটা গ্রহণীয় সেই বিতর্ক ওঠে, যার প্রতিনিধিমূলক উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি ১৯৫১ সালে

'মাহে নাও' পত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসান লিখিত 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধের অংশবিশেষ:

> প্রাক্তন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ভান্ডার কখনও নিঃশেষিত হবে না। সেগুলোর উপর উভয় বাংলারই পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, এই সাহিত্যের ট্র্যাডিশনও আমরা গ্রহণ করব। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজব। সে সঙ্গে একথা সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এবং হয়ত বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি।... পূর্ব বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার হল ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, অগণিত অমার্জিত পুঁথিসাহিত্য, অজস্র গ্রাম্যগাথা, বাউল ও অসংস্কৃত অঙ্গের পল্লীগান।[৭]

অগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেই সময়েই এই ঢালাও ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন:

> আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।... আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।

পরবর্তীকালে, ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে শহীদুল্লাহ এই সময়পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে:

> ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি পারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ কেউ মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন।[৮]

পাকিস্তানী রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ নির্মাণের এই প্রচেষ্টা পূর্ব বাংলার মুসলমানের বৃহত্তর অংশ, যাঁরা বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা অন্য গ্রামীণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আজলফ বা আতরফ, তাঁদের মধ্যে শিকড় ছড়াতে পারেনি। এর কারণ শুধু এই নয় যে তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে মারফতি ও অন্যান্য নানা লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। এর কারণ তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল। সেইদিকটা এবার দেখা যাক।

১৯৪০-এর দশকে পূর্ব বাংলার জনজীবন একাধিক সংকটের ঝাপটায় বেসামাল হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২-এ এক বিধবংসী ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে পূর্ববাংলার দক্ষিণতটে যা হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সে বছরের আমন ধানের চাষ নষ্ট করে দেয়। এর উপর আবার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা জাপানি বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় যুদ্ধপ্রস্তুতি হিসাবে গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য তুলে নিয়ে জমা করতে থাকে। এই দুইয়ের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে বাংলার গ্রামে গ্রামে দেখা দেয় ভয়ংকর মন্বন্তর, যাতে প্রাণ হারায় ১৫ লাখ থেকে ৩৫ লাখ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ। এর ক্ষত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ও পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের আর্থসামাজিক জীবনে বিরাজ করছিল। ব্যাপক কৃষি ও অন্য বৃত্তিজীবী মানুষ মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দু জমিদারদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি ও সেই সুবাদে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার হাল ফেরার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে পড়ে যখন দেখা যায় যে পাকিস্তানের শাসক হিসাবে উঠে আসা পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত আশরাফরা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণের বন্দোবস্তগুলোকেও জোরদার করতে সমান আগ্রহী। পাকিস্তানের নয়া আর্থিক ব্যবস্থায় দেখা গেল যে পূর্ব বাংলার পাটচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকদের কারখানার মুনাফা বাড়াতে অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে রাখা দামে তাদের পাট বেচতে বাধ্য করা হচ্ছে। পূর্ব বাংলার অন্যান্য কৃষি রফতানির ক্ষেত্রেও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কায়েম হয়। সরকারি ব্যায়বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানেই প্রায় সবটুকু কেন্দ্রীভূত করা হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আয়ের পার্থক্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ছিল ২% বেশি, ১৯৬০-এর দশকের শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫% বেশি।[৯] ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুক্তিসনদের বদলে নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়িই তাদের হাতে উঠল বলে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও

অন্যান্য গ্রামীণ বৃত্তিজীবীদের উপলব্ধি ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে। পাকিস্তানী রাষ্ট্র ও তার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভও ক্রমশ প্রকাশের পথ খুঁজেছে নানাভাবে। এই ক্ষোভপ্রকাশের অন্যতম পথ হয়ে উঠল পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে বিরোধিতা করে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন।

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চেহারা পেতে শুরু করে যখন ১৯৪৯-এর জুন মাসে মুসলিম লিগের পাকিস্তানপন্থার বিরোধিতা করে একটা অংশ মুসলিম লিগ থেকে বেরিয়ে আসে এবং প্রবীণ নেতা সোহরাবর্দির নেতৃত্বে আওয়ামি মুসলিম লিগ গঠন করে। সোহরাবর্দি পাকিস্তান গঠনের আগেই সমগ্র বাংলাকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব আনায় ভূমিকা নিয়েছিলেন, এখন তিনি আওয়ামি মুসলিম লিগের ভিত্তি হিসাবে পূর্ব বাংলার বাংলাভাষীদের বাঙালি পরিচয়ের উপর জোর দিয়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্মাণের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্মাণকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আওয়ামি মুসলিম লিগের নাম থেকে মুসলিম কথাটা বাদ দিয়ে আওয়ামি লিগ নাম করা হয়, মুসলিম পরিচয়কে পিছনে ঠেলে বাঙালি পরিচয়কে আরও সামনে আনতে এবং অমুসলমান বাঙালিদের জন্য সংগঠনকে উন্মুক্ত করে দিতে। কৃষকদের জনপ্রিয় নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন গণস্তরে কৃষকদের মধ্যে আওয়ামি লিগের শিকড় ছড়াতে।

এই অবস্থায় ১৯৫২ সালে কেবলমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সরকারি বাহিনী তার উপর গুলি চালালে ১২ জনের মৃত্যু হয়। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে পুঞ্জিত ক্ষোভ এই ঘটনার অভিঘাতে সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৫৩ সালে ফজলুল হকের পুনর্গঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টি-র সঙ্গে আওয়ামি লিগ যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলে এবং 'একুশ দফা' দাবি সামনে নিয়ে আসে, যার মধ্যে মূল দুটি দাবি হল--- বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (পৃথক সেনা ও পৃথক মুদ্রা এই দুটি ছাড়া) ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা। এছাড়াও দাবি করা হয় যে বাংলা ভাষার চর্চার জন্য একটি বাংলা একাডেমি গঠন করতে হবে এবং ৫২-র ভাষাশহিদদের সম্মানে ওইদিনটিকে জাতীয় ছুটি বলে ঘোষণা করতে হবে। এই একুশ দফা দাবি গণস্তরে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই দাবিকে সামনে রেখে ১৯৫৪

সালের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পূর্ববঙ্গের ২৩৭টি মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে ২২৮টি জিতে নেয়, মুসলিম লিগকে পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় মুছে দেয়। যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সেই সরকারকে কোনো কাজ করার সুযোগ না দিয়েই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ভেঙে দেয়। ফজলুল হক কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে দুই বাংলার মধ্যের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর বাঙালি ঐক্যের কথা বলেছিলেন। সেই বক্তব্যের জন্য তাঁকে পাকিস্তান-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে পাকিস্তান সেনা গৃহবন্দী করে রাখে এবং রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করতে বাধ্য করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দশ হাজার সেনা পাঠানো হয় পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা গণতন্ত্রের চেয়ে তাদের আধিপত্য রক্ষাকে যে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দেয় তা তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় ও তাদের উপর বাঙালিদের আস্থা-বিশ্বাসের তলানিটুকুও নিঃশেষিত হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা মুজিবর রহমান আওয়ামি লিগের নেতা হিসাবে বাঙালি আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ আদায়ের আন্দোলনের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। তিনি ছয় দফা কর্মসূচি সামনে নিয়ে আসেন যেখানে বলা হয় যে বাঙালি হিসাবে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা-সংস্কৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হয়ে উঠেছে সময়ের দাবি। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় পাকিস্তানী সরকার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করার প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়। তার প্রতিক্রিয়ায় শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, বাংলার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই অখণ্ড রূপে নিজেদের উত্তরাধিকার হিসাবে দাবি করার মনোভাব জোরদার হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রোত তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৯৬৭ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ। পরের মাসে পূর্ব বাংলায় প্রথমবার বিশেষ সমারোহে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় সরকারি নিষেধ ও অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে। এইভাবে ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নায়কগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসকদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। এই পর্যায় সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন:

> ১৯৬৯ সালের গণভ্যুত্থানের সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শোনা গেল স্লোগান: 'জাগো, জাগো, বাঙালি জাগো' এবং 'তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা মেঘনা যমুনা'।

বোঝা গেল বাঙালি আত্মপরিচয় ক্রমশ জোরালো হচ্ছে এবং তার একটা আঞ্চলিক ভিত্তি দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানে যখন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে, তখন ১৯৭০সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব দাবি করলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম হোক 'বাংলাদেশ'। এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন দুটি স্লোগান ধ্বনিত হল দেশজুড়ে: 'জয় বাংলা' এবং 'তোমার দেশ, আমার দেশ/বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঝড়ঝঞ্ঝা যখন সমূহ ক্ষতিসাধন করল এ অঞ্চলের, তখন ঢাকায় সবকটা বাংলা পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে শিরোনাম দিয়েছিল: 'কাঁদো, বাঙালি, কাঁদো'। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যুবকদের মুখে ধ্বনিত হল আহ্বান: 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।[১০]

এভাবে বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ঘিরে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ব বাংলার গণমানস অধিকার করে নিল, তা আধিপত্যবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আয়ুধ হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। তাই পাকিস্তানী শাসকদের অবলম্বন করা শরিয়ত ও উর্দু ভিত্তিক প্রমিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আত্মপরিচয় নির্মাণের গরজও তার ছিল।

১৯৭০ সালে ঝড় ও বন্যা যখন পূর্ব বাংলার ব্যাপক গ্রামাঞ্চলকে ছিঁড়েকুটে দিচ্ছে, তখন পাকিস্তানী প্রশাসকরা যে নির্লিপ্ততার সঙ্গে কেবলমাত্র দর্শক হয়ে থাকলেন তা ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র করে তুলেছিল। এর পরপরই মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার এবং পূর্ব বাংলা জুড়ে হিংস্র সেনা-অভিযান চালিয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পদক্ষেপ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে চরম লড়াই 'মুক্তিযুদ্ধ'-এর আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের আগুনে ঝালাই হয়ে পূর্ব বাংলা যখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হল ১৯৭১-এ, তখন সেই নবজাতক রাষ্ট্র সর্বাঙ্গচিহ্নিত ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের গর্ভচিহ্নে। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল বাংলাদেশ। সংবিধান রচিত হল বাংলায় (যদিও প্রথমে তা ইংরেজিতেই রচিত হয়েছিল, তারপর তার বাংলা ভাষান্তর হয়)। সংবিধানে বাংলা ভাষা ঘোষিত হল রাষ্ট্রভাষা হিসাবে। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হল। সংবিধানে ঘোষিত হল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' হল জাতীয় সংগীত।

পূর্ব বাংলার মানুষের গোষ্ঠীগত আত্মপরিচয় নির্মাণের সংগ্রামে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়লাভই সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের প্রাথমিক উদ্যোগ-উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভূমিকায় একটি

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে দেয়। ১৯৭১ অবধি যা ছিল আধিপত্যকামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার-আদায়ের আয়ুধ, ১৯৭১-এর পর তা হয়ে দাঁড়াল নতুন একটি জাতি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য মান্যতা উৎপাদনের আয়ুধ। এর ফল কী হল তা দেখার জন্য আমাদের ঢুকতে হবে ১৯৭১-১৯৭৫ সময়পর্যায়ের আলোচনায়।

১৯৭১-১৯৭৫

১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। তার প্রভাব সবার আগে পড়ার কথা যেখানে সেই সরকারি দাপ্তরিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার কিন্তু আটকে গেল প্রতিবন্ধকতার জালে। কী সেই প্রতিবন্ধকতা? হুমায়ুন আজাদ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলোতে একটি মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়, ব্যাধিটির নাম 'ঔপনিবেশিক ঘোর' বা 'কলোনিয়াল হ্যাং ওভার'। এ-ব্যাধিতে সবচেয়ে দুরারোগ্যভাবে যাঁরা আক্রান্ত, তাঁরা আমলাসম্প্রদায়; অসুস্থ স্বার্থপরায়ণ চতুর কপট বিবেকহীন গোত্র। পাকিস্তানী আমলারা চলে যাওয়া শাদা আমলাদের গুণগুলো পরিহার করে সুচারুরূপে আয়ত্ত করেছিল তাদের দোষগুলো, এবং বাংলাদেশের উদ্ভবের পরে বাঙালি আমলাদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, বরং তাঁদের পতন ঘটে আরো। স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোতে তাঁরা ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের প্রচণ্ড নেতা-উপনেতা প্রভৃতি দ্বারা এতো লাঞ্ছিত-অপমানিত হন যে মনে মনে তাঁরা প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে, এবং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে, একটি শক্তিশালী দলরূপে সংহত হন ক্রমশ; মুঠোতে নেন সমস্ত ক্ষমতা। পাকিস্তানকালে উচ্চ আমলা হওয়ার জন্য ইংরেজিদক্ষতাই ছিল প্রধান যোগ্যতা; সাধারণ বিশ্ব-ও সমকালীন-জ্ঞান ও ভালো ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে পাকিস্তানকালে আমলাশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া যেত। ইংরেজি যেহেতু তাঁদের সমস্ত প্রতিষ্ঠার মূলে, তাই ইংরেজির জন্য তাঁদের রয়েছে গভীর দরদ-আবেগ। গরিব দেশগুলোতে আমলাসম্প্রদায় অত্যন্ত 'স্নবিশ' হয়ে থাকেন বাংলাদেশেও তাই। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের উন্নাসিকতা প্রকাশ পায়, এবং ইংরেজি ব্যবহারে তা চূড়ান্ত রূপ পায়, যদিও তাঁদের ইংরেজি অনেকদিনের বাসি। বাংলা আমলাদের কাছে মর্যাদার ভাষা নয়, ইংরেজিকেই তাঁরা মর্যাদার আধাররূপে জ্ঞান করেন, কারণ এটাই তাঁদের অস্ত্র। বাংলা ভাষার সঙ্গে সাধারণত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শত্রুতায় লিপ্ত হন। কিন্তু তাঁরাই অবস্থান করেন রাষ্ট্রযন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে, এবং জড়িত থাকেন সামাজিক অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে। প্রধানত আমলাদের অবহেলা-বিরোধিতার জন্যই এখনও সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।[১১]

সরকারের নেতৃত্বের সঙ্গে আমলাদের এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭৫-এর ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতি হিসাবে মুজিবর রহমানের জারি করা একটি কঠোর নির্দেশের মধ্য দিয়েও। নির্দেশটি এইরকম :

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা
সংখ্যা ৩০/১২/৭৫, সাধারণ—৭২৯/১(৪০০) ১২ই মার্চ, ১৯৭৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।

এ আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোনো অন্যথা হলে উক্ত বিধিলঙ্ঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এ আদেশ কার্যকরী করবেন। তবে কোনো বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্র যোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে ইংরেজি অথবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিদেশের কোনো সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময়ও বাংলার সাথে অনুমোদিত ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

শেখ মুজিবর রহমান
রাষ্ট্রপতি

কিন্তু এই আদেশ যখন মুজিবর রহমান জারি করছেন, তখন তিনি আর সেই ১৯৭১-এর বিপুল জনসমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানী আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতার অবস্থানে নেই, তিনি তখন ক্রমশ জনসমর্থন হারানো কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাথায় বসে থাকা এক নেতা। কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটে গেল সেইদিকে তাকানো যাক।

আওয়ামি লিগ ১৯৬৬ সালের দলীয় ঘোষণাপত্রেই লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলে। ১৯৬৯ সালে প্রচারিত নীতি ও কর্মসূচিতেও আওয়ামি লিগের কর্তব্য

হিসাবে বর্ণিত হয় 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজতন্ত্র কায়েম'। ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণে মুজিবর রহমান জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রকে জনগণের মালিকানায় আনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ করাচির ডন পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি দৃঢ়সংকল্প।

মুজিবর রহমান ও আওয়ামি লিগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলতে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে একটি দৃঢ়সংকল্প পার্টির (রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ) নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধীন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা চালিত অর্থনীতিকেই যে বুঝেছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের কাজের মধ্য দিয়ে। ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার ৭০০-র উপর শিল্পসংস্থাকে অধিগ্রহণ করে। এই সংস্থাগুলির মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পর তারা এগুলোকে পরিত্যক্ত হিসেবে ফেলে রেখে পাকিস্তানে ফিরে যায়। শিল্পমন্ত্রকের অধীনে এগুলোকে গ্রহণ করা হলেও এদের পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয় আওয়ামি লিগের প্রভাবশালী নেতা ও সমর্থকদের হাতে। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করা হয় ও সোভিয়েত মডেলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্ধারণ করার ভার তার হাতে সঁপা হয়। ১৯৭২-এর মার্চে এই পরিকল্পনা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী কেবলমাত্র পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া ব্যবসাপত্রই নয়, সমস্ত বড় শিল্প-কারখানা, বড় ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও বীমাক্ষেত্রকে জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়। এই সমস্তর মাথায় আওয়ামি লিগের নেতা-সমর্থকদের আরও গোষ্ঠী গেঁড়ে বসে। এইসব নেতা-সমর্থকরা দ্রুতই এইসব সংস্থাকে দোহন করে নিজেদের হাতে পুঁজি জমিয়ে তোলে এবং সংস্থাগুলোকে রুগ্নতার পথে ঠেলে দেয়। হুমায়ুন আজাদ এই অংশের শুরুতে উদ্ধৃত বক্তব্যে এদেরকেই রাজনৈতিক দলের প্রচণ্ড নেতা-উপনেতা বলেছেন। গোটা দেশের অর্থনীতিকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত বিত্ত পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

আমরা এর আগের পর্বে আলোচনায় দেখেছিলাম যে বাংলা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রথম থেকেই দুটি অংশ ছিল--- একটি অংশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত আর একটি অংশ বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী। ১৯৭১-এর পর এই প্রথম অংশ অওয়ামি লিগের প্রচণ্ড নেতা উপনেতা হয়ে উঠেছে আর নয়তো সরকারে প্রশাসনে আমলা হিসাবে যোগ দিয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছে এই দেখতে দেখতে যে ৭০-এর প্রাকৃতিক

বিপর্যয় বা ৭১-এর মরণলড়াইয়ের ক্ষত জুড়িয়ে তাদের জীবনকে আবার নতুন মর্যাদায় দাঁড় করানোর বদলে দেশে লাগু হয়েছে নয়া ক্ষমতাবানদের আস্ফালন।

একদিকে আমলারা তাদের পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষার দখল থেকে উপজাত সামাজিক সুবিধা বজায় রেখে তাদের সামাজিক ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে বদ্ধপরিকর, যেমন হুমায়ুন আজাদ বলেছেন:

> উর্দি অস্ত্র দারোয়ান দিয়ে শক্তিমানরা যেমন 'সাধারণ'-দের সন্ত্রস্ত করে রাখেন, তেমনই ইংরেজি দিয়েও তাঁরা শক্তিহীনদের ভয় দেখান: জানিয়ে দেন যে তাঁরা উচ্চ ও অন্যভাষী—অন্যশ্রেণির মানুষ।[১২]

অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষগুলো দখল করা নেতা-উপনেতারা সমাজের উপর নিজেদের কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে লুঠ করে জমানো পুঁজি খাটানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের বেসরকারীকরণের দাবি তুলতে লাগল। এইভাবে এই দুই অংশই, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা-ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, ক্রমশ মুজিবর রহমানের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রের উপর মুজিবর রহমানের নিয়ন্ত্রণ কমানোর লক্ষ্যে অন্তর্ঘাতে সামিল হল।

খোলাখুলি পুঁজিবাদী বাজার প্রক্রিয়ার সুযোগ নেওয়ার এই প্রত্যাশীরা সমর্থন পাচ্ছিল বিশ্বব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকেও। বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য সাহায্যের নামে তার দেওয়া অনুদানের শর্ত হিসাবে সেও বেসরকারিকরণের দাবি তুলছিল, খোলাখুলি পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু করার উপদেশ দিচ্ছিল। তাছাড়াও, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্রাক (বাংলাদেশে রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি, পরবর্তীকালে নাম পাল্টে ব্রিজিং রিসোর্সেস অ্যাক্রস কমিউনিটিস) নামক এনজিও (নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশন)-র মাধ্যমে তার অনুদানের সিংহভাগ নিযুক্ত করে বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতেও ভূমিকা নিয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্ক।

আওয়ামি লিগের ভিতর থেকেই বা প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে থেকেই এই ক্ষমতাবানেরা কাজ করায় এদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ সাধারণ মানুষকেও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল আওয়ামি লিগ থেকে ও মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব থেকে।

মুজিবর রহমান এই প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করার পথ ধরে। সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্তগ্রহণকে কেন্দ্রীভূত করে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা, অন্যসব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, নিজের আস্থাভাজনদের নিয়ে একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতার চক্র তৈরি করার চেষ্টা, সেনাবাহিনীর থেকে পৃথক নিজের একটি ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী

('জাতীয় রক্ষীবাহিনী' নামে) তৈরি করা—এই সবই মুজিবর রহমানের সেই অতিকেন্দ্রীভূতকরণের্ চেষ্টার নিদর্শন।

তাঁর ১৯৭৫ সালের যে বাংলা প্রচলনের নির্দেশটি এই অংশের শুরুতে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যেও এই অতিকেন্দ্রীভূতকরণের্ ছাপ দেখা যায়। যেভাবে তিনি সরকারি নির্দেশের যৌক্তিকতা নির্মাণে নিজের বিশ্বাসের প্রশ্ন হাজির করেছেন ('মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়'), তাঁর নির্দেশ অমান্যকে অভিভাবকীয় ভাষায় 'উচ্ছৃঙ্খলতা' বলে ভর্ৎসনা করে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে এই নির্দেশের বয়ান সরকারি নির্দেশের প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক ধরনকে অতিক্রম করে গিয়ে ব্যক্তি হিসেবে নির্দেশদাতাকে সামনে নিয়ে আসে।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কাঠামোকে আরও কেন্দ্রীভূত করার এই প্রচেষ্টা ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা-চক্রের আবির্ভাব ও তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি অগণতান্ত্রিক প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়েছিল। ফলে যে সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেই সামাজিক ভিত্তির শুকিয়ে যাওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণ। মেহনতী সাধারণ মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা আর এর মধ্যে খুঁজে না পেয়ে এর থেকে মুখ ঘুরিয়েছিল। সুবিধাভোগী অংশও তার সুবিধা আদায়ের আয়ুধ হিসাবে একে ব্যবহার করার পর নিঃশেষিত আয়ুধকে ত্যাগ করেছিল।

মুজিবর রহমানের বাংলা প্রচলনের কড়া নির্দেশ তাই কোনো কাজে আসেনি, বরং এই নির্দেশ প্রদানের কয়েক মাসের মধ্যেই ক্ষমতা-চক্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলী হয়েছিলেন তিনি বিদ্রোহী সেনাদের হাতে প্রাণ হারিয়ে। আওয়ামি লিগও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়, জারী হয় সেনা-শাসন।

এই পরের পর্যায়ের আলোচনায় এবার ঢোকা যাক।

১৯৭৫-এর পর

স্বরোচিষ সরকার বাংলাদেশের একজন কৃতী ভাষাতাত্ত্বিক, বাংলা একাডেমির 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'-এর সহকারী সম্পাদক। ২০১৫ সালে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

> ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার পর যে খুনিচক্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে যেমন তাঁরা আলাদা ছিলেন, তাঁদের

ভাষানীতিও আলাদা ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে প্রেসিডেন্ট, বেতারকে রেডিও করেই ক্ষান্ত হয়নি। সমাজতন্ত্রকে যেমন তাঁরা দূর করে দিয়েছেন, একই সঙ্গে গরিবের ভাষা বাংলাকেও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। লিখতে শুরু করেছেন ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো ইংরেজিতে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষা নতুন এক লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়।[১৩]

বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয়ে সরকারি নির্দেশ, প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহিদদের স্মরণে সরকারি অনুষ্ঠানের ঘটা, রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাংলা ভাষা নিয়ে আবেগায়িত বিবৃতি—বাংলাদেশের এইসব পরিচিত ছবির সঙ্গে উপরের বক্তব্যটি মেলানো একটু কঠিন। তাই একটু বিশদে আলোচনা করা যাক।

মুজিব-হত্যার পর ১৯৭৫ সালেই ২৩শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ সরকারের দাপ্তরিক কাজ বাংলায় করার নির্দেশ দিয়ে একটি নতুন আদেশপত্র জারী করেন। এই আদেশপত্রটির বক্তব্য পূর্বে উল্লিখিত মুজিবর রহমানের জারী করা নির্দেশের অনুরূপ, কেবল কয়েকটি বিষয় ছাড়া, যেমন, আদেশপত্রটি সরকারি নির্দেশের প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে রচিত, ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেম সংক্রান্ত বিশ্বাসের কথা বর্জিত, নির্দেশ অবমাননায় কোনো শাস্তির হুমকিও নেই।[১৪] এই নির্দেশের কোনো প্রভাবই পড়েনি, বরং, সরকারি দাপ্তরিক কাজে আগের আমলে যতটুকু বাংলার প্রচলন হয়েছিল, তাও কমতে কমতে সরকারের চূড়ান্ত পর্যায়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ইংরেজিতে রাখার চল হয়।

এর ফলে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিষয়ে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটিও ইংরেজি ভাষায় জারী হয়! এইটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশে অনুষ্ঠিত ১৯৭৮ সালের ১২ই জানুয়ারি ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে জারি হওয়া আদেশ। লক্ষ্যণীয় যে পূর্বের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ আর মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ নেই, ক্যাবিনেট ডিভিশন হয়ে গেছে। আদ্যন্ত ইংরেজি ভাষায় রচিত এই নির্দেশটি আগের দুটি নির্দেশের তুলনায় বেশ দীর্ঘ এবং চারটি ধারায় বিভক্ত।[১৫] প্রথম ধারায় সরকারের মন্ত্রীপরিষদের সব কাজ ও নথিনির্মাণ বাংলায় করা যেতে পারে বলে বলা হয় (লক্ষ্যণীয় যে ভাষাটি ছিল 'may be conducted in Bengali from now onwards'; 'should be conducted...' নয়)। দ্বিতীয় ধারায় বাংলায় স্কুলপাঠ্য বই তৈরি করার জন্য একটি দায়িত্ববান কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়। তার সঙ্গে দুটি লক্ষ্যণীয় মন্তব্য করা হয়। প্রথম মন্তব্যটি হল এই যে পাঠ্যপুস্তকের বাংলা ভাষা সহজ-সরল (simple and lucid) করতে হবে, আর দ্বিতীয় মন্তব্যটি এই যে উপর থেকে ভাষা-ব্যবহার চাপিয়ে দেওয়া ফলদায়ক হবে না ভিত্তিস্তরে পর্যাপ্ত

প্রস্তুতি ব্যতিরেকে। মন্তব্যদুটির আগামাথা বোঝা দুষ্কর! সেই পূর্ব পাকিস্তানের আমল থেকেই স্কুলস্তরে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা চালু ছিল এবং তার জন্য যথেষ্ট বাংলায় লেখা পাঠ্যবইও চালু ছিল। সে সব বইয়ের ভাষা ছাত্রদের কাছে অবোধ্য ঠেকছে এমন আগে শোনা যায়নি। তাই হঠাৎ বাংলা ভাষার ঘাড়ে দুর্বোধ্য আখ্যা চাপিয়ে তাকে সহজ-সরল করার অভিপ্রায় ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-আমলে উর্দুপন্থীদের বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষাকে কমজোরি ও অনুপযুক্ত প্রমাণ করার অপচেষ্টারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কি! আরও চমকপ্রদ দ্বিতীয় মন্তব্যটি! যে দেশের শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, সেখানে বাংলা ভাষা-ব্যবহারকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা আসে কোথা থেকে, আর ভিত্তিস্তর (অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরর প্রাত্যহিক জীবনের স্তর) থেকেই তো মাতৃভাষার ব্যবহার উৎসারিত, তাই ভাষা-ব্যবহারের জন্য ভিত্তিস্তরে কী প্রস্তুতির কথা যে মন্ত্রীপরিষদের মান্যবররা ভাবলেন তা বুঝি ভাষাতত্ত্বিকদেরও বোধের অগম্য! এরপর আসা যাক তৃতীয় ধারায়। এই ধারা শুরু হয়েছে পূর্বে নিযুক্ত এক 'জাতীয় শিক্ষা কমিটি'-র তখনও পেশ না হওয়া প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করা ও তা পেশ না হওয়া অবধি অন্য কোনো কমিটির গঠনের পথে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে। তারপর সেই অবধি বাংলা প্রচলনের একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বাংলাতেই শ্রেণিকক্ষে পড়ান হয়, যদিও ছাত্ররা ইংরেজিতেও পরীক্ষা দিতে পারে। সেনাবাহিনী ও পুলিশে বাংলায় নির্দেশ চালু হয়েছে। জনসেবা নিয়োগ আয়োগ (পাবলিক সার্ভিস কমিশন)-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তারা বাংলাতেও পরীক্ষাগ্রহণ শুরু করতে পারে, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলার আরও প্রচলনের পথ সুগম করবে। সরকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণেও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার করা যেতে পারে বলে বলা হয়েছে। এরপর আরেকটি অদ্ভুত মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে বাংলা ভাষাকে পণ্ডিতদের কবলমুক্ত হতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য (The language must rid itself of the grip of the 'pundits' and must reach for the people)। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কার্যত বলা হয়েছে যে বাংলা ভাষা আপামর জনগণের ভাষা নয়, তা গুটিকয় পণ্ডিতের ভাষা! এমন অত্যাশ্চর্য ভাষণ শুনে সন্দেহ হয় যে মন্ত্রীপরিষদের মান্যবরেরা আদৌ বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের সঙ্গে পরিচিত তো! সর্বশেষে আদেশটির চতুর্থ ধারা। এই ধারায় মোক্ষম যে কথাটি বলা হয়েছে তা এই যে ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় কাজকর্ম শুরু করার জন্য কোনো সময়সীমা ঠিক করার দরকার নেই (There is

no need to fix a target date for the eventual switch-over to Bengali.)। লক্ষ্যণীয় যে আগের দুটি সরকারি নির্দেশেই অবিলম্বে বাংলা প্রচলনের কথা বলা হয়েছিল, আর এই নির্দেশে অবিলম্বে তো নয়ই, বরং বাংলা প্রচলনকে অনির্দিষ্টকালের বিষয় করে দেওয়া হল। একই সঙ্গে বাংলা প্রচলনের নির্দেশগুলো দেওয়া হল করা যেতে পারে এমনভাবে, করতে হবে এইভাবে নয়, যার মধ্য দিয়ে করা যে নাও যেতে পারে তার পথ খোলা রাখা হল। তাছাড়া বাংলা ভাষার কাঠিন্য, পণ্ডিতদের কবলে বাংলা ভাষার বন্দি থাকা ইত্যাদি একগুচ্ছ বানানো কথা বলে বাংলা-ব্যবহারের নানা কাল্পনিক প্রতিবন্ধকতাও আমদানি করা হল।

এরপর কিছুদিন সরকারি স্তরে বিতর্ক চলল বাংলা ভাষার কোন রূপ ব্যবহারযোগ্য তা নিয়ে। ১৯৭৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব স্বাক্ষরিত 'অফিস-আদালতের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে' শিরোনামে একটি বহুধারাবিশিষ্ট নির্দেশ প্রাচারিত হয়।[১৬] নির্দেশটি লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে। এই ভাষারীতি বহু সরকারি আমলার কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ফলে সচিব কমিটির সভা থেকে ১৯৭৯-র ৩১শে মার্চ ও ২৭শে নভেম্বর বিশদ আলোচনার পর বাংলা ভাষা ব্যবহার করলে তার সাধু রীতি ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। আশ্চর্যের যে নির্দেশের ভাষারীতি নিয়ে বহু চাপান-উতোর হলেও স্বয়ং নির্দেশগুলি আদৌ কার্যকরী হল কি না সে নিয়ে কোনো পর্যালোচনা দেখা গেল না।

এর পরের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ সালে, হুসেইন মহম্মদ এরশাদের আমলে। এই আইনে পুনরায় দাপ্তরিক কাজ বাংলায় অবিলম্বে চালু করার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়। নির্দেশটি এইরকম:

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭
১৯৮৭ সালের ২ নং আইন (৮ মার্চ, ১৯৮৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের[১৭] বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধানবলী পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। (১) এই আইন বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে 'অনুচ্ছেদ' অর্থে সংবিধানের অনুচ্ছেদ বুঝাইবে।

৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩(১) উপধারায় উল্লেখিত কোনো কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৪। সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

আইনের ভাষা বেশ শক্তপোক্ত ও আন্তরিক হলেও এর আন্তরিক প্রয়োগের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। দাপ্তরিক কাজে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের মাঝে এই আইনের বলে সরকারি-বেসরকারি কোনো পর্যায়ে বাংলা না ব্যবহার করার জন্য কেউ আইনলঙ্ঘনকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন বলে জানা যায় না, এমনকি ৪র্থ অনুচ্ছেদ সরকারকে যে প্রয়োজনানুযায়ী প্রাসঙ্গিক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে, তাও কোনোদিন ব্যবহৃত হয়নি।

বাংলা প্রচলনের জন্য আইন করা ও আন্তরিকভাবে তা কাজে পরিণত করার মধ্যে এই যে বিস্তর যোজন ফাঁক থেকে গেছে, বা ইচ্ছাকৃতভাবেই রাখা হয়েছে, এ সম্পর্কে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করা বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা ১৯৮২ সালে বলেছেন:

> বাংলা প্রচলনের জন্য বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতিরা একাধিকবার নির্দেশ জারি করেছেন, সচিবরা বাংলা প্রচলনের জন্য 'সচিব কমিটি' গঠন করেছেন, সরকারি কাজে বাংলা চালু করার জন্য সংস্থাপন বিভাগে বাংলা সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এক মফস্বল আদালতের মুন্সেফ আদালতে বাংলা প্রচলন না করার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করেছেন এডভোকেটদের।... বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল কোনো না কোনো সময়ে বাংলা প্রচলনের দাবি করেছেন।... বাংলা প্রচলনের ব্যাপারে এগুলো হচ্ছে নির্দেশপ্রদান ও দাবি উত্থাপনের দিক। এ নির্দেশ মান্য করার ও কার্যকর করার আর একটি দিক আছে, এবং সেদিকটি নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়,

তাহলে দেখা যাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশ কার্যকর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো আর্থিক বরাদ্দ, নেই কোনো সুসংহত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। আইন-আদালত, অর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদি—সর্বক্ষেত্রেই অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। সুতরাং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বাংলা প্রচলন আশানুরূপ না হওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন।... ভাষা প্রচলন নামক ব্যাপক সামাজিক কর্মকাণ্ডকে কার্যে রূপান্তর করার জন্য যে সরকারি আর্থিক বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন, তা বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন কখনও উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, পশু মন্ত্রণালয় আছে, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ও আছে, কিন্তু ভাষা প্রচলন করার জন্য কোনো কিছুই নেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গঠনের মধ্যে ভাষা প্রচলনের কোনো স্থান নেই, আইন মন্ত্রণালয়েও নেই। অর্থাৎ বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য বাংলাদেশে কোনো সরকারি সংগঠন নেই, সংস্থাপন বিভাগে যে 'বাংলা সেল' আছে, সেটা অত্যন্ত শক্তিহীন, দুর্বল ও ক্ষুদ্র সংগঠন। সংস্থাপন বিভাগের 'বাংলা সেল' যদি দিনরাত প্রাণপাত করে, তবু তার বর্তমান সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে বাংলা প্রচলনে কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। আর আছে একটা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার নাম 'বাংলা একাডেমি'। সবে-ধন-নীলমণি এই বাংলা একাডেমির উপর বাংলা প্রচলনের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে বাংলাদেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা কুম্ভকর্ণের অঘোর নিদ্রায় মগ্ন আছেন এবং বাংলা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হলে তাঁদের নাসিকাগর্জন প্রবলাকার ধারণ করে।[১৮]

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয়ে বাংলাদেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের মনোভাবকে কেবলমাত্র উপেক্ষা নয়, তার চেয়েও বেশি প্রতারণা বলে বর্ণনা করেছেন হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৩ সালে:

> ... বাংলাদেশের কোনো মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা বযবহার করেন না, যতটুকু করেন তা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই।... কারও পক্ষেই এখন প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করা সম্ভব নয় এবং অনেকেই, যদিও বাংলাবিরোধী, প্রকাশ্যে বাংলার স্তুতি করেন।... রাজনীতিকেরা, ক্ষমতালব্ধ ও প্রলুব্ধ উভয় শ্রেণির, জনসভায় বাংলায়, সাধারণত বিকৃত বাংলায়, বক্তৃতা দেন, জনতাকে উত্তেজিত করেন, অনেক আশার বাণী শোনান। যদি কোনো ইংরেজিমনস্ক রাজনীতিক দুঃসাহস করেন তাঁর প্রিয় ভাষাটি জনতাকে শোনাতে, তাহলে তা হবে প্রকাশ্য জনসভায় আত্মহত্যা। কিন্তু ওই বক্তা রাজনীতিক, অর্থাৎ চতুর প্রতারণাদক্ষ, তাই তিনি আঞ্চলিক ও কথ্যমিশ্রিত বাংলা বক্তৃতায় মাত্র সে-কটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবেন, যা ব্যবহার না করলে জনগণ তাঁকে 'অশিক্ষিত' ভাবতে পারে। রাজনীতিকদের সমস্ত বক্তৃতার সার কথা সকলেরই জানা: তোষণ আর প্রতারণা

> হচ্ছে তাঁদের বক্তৃতার মর্মকথা। বক্তৃতা শেষে রাজধানিতে ফিরে তাঁরা ইংরেজিচর্চায়, সাধারণত বিকৃত, মনোযোগ দেন।... রাজনীতিক আমলা বিচারপতি শিক্ষাবিদ আইনজীবী ডাক্তার ঠিকাদার সবাই (ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তার শহিদদের স্মরণে) বন্দনা-প্রতারণার উৎসবে যোগ দেন, কেউ কেউ সাড়া-জাগানো ভাষণ দেন, কিন্তু সবাই ব্যক্তিগত-পারিবারিক-পেশাগত জীবনে আবদ্ধ থাকেন রূপসী ইংরেজির অচ্ছেদ্য বাহুপাশে। তাঁদের পুত্রকন্যারা ইউরোপ-আমেরিকায় বিদ্যার্জন করে, নইলে অন্তত ঢাকা শহরেই কোনো ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ে। এ শ্রেণিটি বাংলা ভাষাকে এখন তোষণ- প্রতারণার ভাষা হিসেবেই ব্যবহার করছেন।[১৯]

ইংরেজি ভাষার এই মোহময়ী আকর্ষণ কেবল ঔপনিবেশিক ঘোরের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নেই, তা ইতিমধ্যে আরো শক্তপোক্ত ভিত্তি অর্জন করে নিয়েছে দেশের সুবিধাভোগী অংশের মধ্যে। সেই ভিত্তি ১৯৭৫-পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক নীতির রূপান্তরের মধ্যে নিহিত। ১৯৭৫-এ ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই জিয়া উর রহমানের সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক ও সরকারি ক্ষেত্র দোহন করে পুঁজি জমানো হর্তা-কর্তাদের দাবি মতো অর্থনীতিতে বেসরকারী পুঁজির ক্ষেত্র প্রসারিত করতে থাকে। ঢাকা স্টক মার্কেটকে আবার পুরুজ্জীবিত করা হয়। ১৯৮২ থেকে শুরু হওয়া এরশাদের আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য সব খুলে দেওয়া হয়। বেসরকারি পুঁজিকে তার ইচ্ছামতো ব্যবসা করতে দেওয়ার জন্য নানা সংস্কার করা হয়। ১৯৯০-এর পর থেকে নানা জমানার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এই পুঁজিবাদী নয়াউদারনীতির পথেই তার গতি বজায় রেখেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজে তৈরি হয়েছে এক ভয়ংকর বৈষম্য। একদিকে সামাজিক সম্পদ ভোগদখলকারী একটি উপরের তলার সুবিধাভোগী অংশ, যাদের ছেলেমেয়েরাই লন্ডন বা আমেরিকায় পড়তে যায়, এমনকি সপ্তাহান্তের 'শপিং'-এর জন্যও যারা আকাশপথে বিদেশ পাড়ি দেয়, আর অন্যদিকে আছে বিদেশী নামি বস্ত্রনির্মাতাদের জন্য কম মজুরীতে রফতানির পোষাক তৈরি করে নেওয়ার জন্য নরকের সারি যেখানে কোথাও না কোথাও প্রতি বছর আগুন লেগে বা ধ্বসে পড়া কারখানার দেওয়াল চাপা পড়ে হাজার হাজার শ্রমিক মারা যায়, যে নরকে সম্পূর্ণ অধিকারহীন শ্রমিকরা কোনো দাবি তুললেই মালিকের পোষা গুন্ডাবাহিনী হামলে পড়ে। চরম সোপানতান্ত্রিকতায় বিন্যস্ত এই সমাজে উপরমহলের ক্ষমতাভোগীরা যেহেতু তাদের শাসন-প্রশাসন, ব্যবসা-মুনাফা সব কিছুর পরামর্শ বা পরিচালনার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান-সরকারগুলোর সহায়তা-সমর্থন-অনুদানের উপর নির্ভরশীল, তাই ইংরেজিকেই

তারা তাদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ভাষা বলে মনে করে। আর এই সোপানতন্ত্রে চাপা পড়া মানুষদের ভাষা বাংলা, তার কোনো ইজ্জত নেই।

ক্ষমতার সোপানতন্ত্রে চাপা পড়া মানুষ পাকিস্তানী আমলে প্রতিরোধ তৈরির জন্য যে বাঙালি আত্মপরিচয়কে অন্যতম অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করেছিল, সেই বাঙালি আত্মপরিচয়কেও ১৯৭৫ সালের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে নাকচ করার প্রক্রিয়া চলেছে। বাঙালি আত্মপরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে নাকচ করে মুসলিম ধর্মকেন্দ্রিক আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালেই খোন্দকার আবদুল হামিদ বাঙালিত্বকে নস্যাৎ করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন এইভাবে:

> বাঙালি জাতীয়তা বললে মাল্টি-স্টেট-ন্যাশনালিজম-এর কথা এসে পড়ে। কারণ, বাংলাদেশের বাইরেও কয়েক কোটি বাঙালি আছেন। আমরা কি সেসব বাঙালিকে বাংলাদেশের জাতির শামিল করতে পারি? জটিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রশ্নের ঝুঁকি না নিয়ে অমন (প্যান-বেঙ্গলজিম বা সুপ্রান্যাশনালিজম-এর) কথা আমরা কি ভাবতে পারি? পারি না। আর তাই আমাদের জাতীয়তাকে বাঙালি জাতীয়তা বলে অভিহিত করতে পারি না।... এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে তেমনই চিরন্তন তফাৎ। সে প্রভেদ রগের, রক্তের, মনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, কর্মের, এবাদৎ-বন্দেগির, নামের, নিশানের, ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, খোরাকের, পোশাকের, আদরের, লেহাজের, কায়দা-কানুনের, জীবনবোধের, জীবনধারার, জীবনদর্শনের এবং জীবনসাধনার। হৃদয়ানুভূতির নিবিড় বন্ধন দুয়ের মধ্যে চিরকাল অবর্তমান। এমনকি উভয় বাংলার ভাষা মূলত একটা হলেও বড়লোকদের বৈঠকখানা, বিদগ্ধদের সাহিত্য-অঙ্গনের বাইরে জনগণের যে ভাষা তা যবানে-লিসানে, মুখরেজে-তালাফ্‌ফুজে পর্যন্ত আলাদা।... কাজেই 'বাঙালি জাতীয়তা' কথাটা শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অবাস্তব। এমনকি রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেও এর অসারতা স্বপ্রমাণিত। 'বাঙালি জাতীয়তা' তাই মিসনোমার। আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এ্যাপ্রোপিয়েট বা সঙ্গত।... এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা-ওয়ারিসী উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-সঙ্গীত সবকিছু।... এদের জীবনে ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্রদান করেছে—এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলাভাষী ও ইসলাম-অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম, এ জন্যে যে এ দেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'-র উপাদান, এগুলি নকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ।[২০]

বোঝা যায় যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের নির্মাণপ্রচেষ্টায় যেমন মুসলিম ধর্মের একটি প্রমিত রূপকে ধরে আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ-এর ক্ষেত্রেও তেমন একটি চেষ্টার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, যদিও আগের থেকে আরও সতর্কভাবে। সুকৌশলে আড়াল করে দেওয়া হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে এবং এই আড়ালের উপর তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে বাংলাদেশী বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সরাসরি উর্দু ভাষাকে মুসলমানের ভাষা হিসাবে দাঁড় করানো থেকে এখানে সংযত থাকা হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাভাবিক আঞ্চলিক লৌকিক বৈচিত্র্যকে ভাষার ভিন্নতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে বাংলাভাষা-ভিত্তিক আত্মীয়তাকে নাকচ করতে চাওয়া হয়েছে। এহেন প্রচেষ্টা হর্তা-কর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ১৯৮০-র দশক থেকে বাংলাদেশী সুধীমহলে বেশ বিতর্ক ঘনিয়ে তোলে।[২১]

ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করে মুসলমান ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আসনে বসার পরের দিনই জিয়াউর রহমান এক ঘোষণাপত্র মারফত সংবিধান সংশোধন করেন। সেইসব সংশোধনীর অন্যতম হল সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষদেশে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরেপক্ষতাকে নাকচ করে তার জায়গায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' নিয়ে আসা, ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ ও ৩৮ অনুচ্ছেদের আংশিক বিলুপ্তি। ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদের আংশিক বিলুপ্তির ফলে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল-ও আদর্শদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়া হল। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ অবধি এরশাদের আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হল এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ প্রকট করে তোলা হল। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রচার চলল যে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এলে 'বিসমিল্লাহ' উঠে যাবে, এই প্রচারের মোকাবিলা করতে আওয়ামি লিগও প্রচারে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুলল, ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পোস্টারে-প্রচারপত্রে-বিজ্ঞাপনে সেই 'আল্লাহু আকবর' একেবারে মুদ্রিত আকারে দেখা দিল। ১৯৯১ সালে এমনকি বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারপত্রে 'আল্লাহু আকবর' যোগ করা হয়েছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নীতির ইসলামিকরণ আরও তীব্র হল

ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও তসলিমা নাসরিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণতাবাদী ইসলামি চিন্তাধারাকে দাপিয়ে বেড়াবার জায়গা করে দিয়ে। তারপর থেকে ইসলামের নামে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও অন্য ধর্মাবলম্বী এমনকি অন্য মতাবলম্বীদের উপর আক্রমণ অবিরত ঘটে চলেছে।

এইভাবে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ হিসাবে ইসলামকে বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি আত্মপরিচয় ক্রমশ পিছু হঠতে হঠতে আজ ইতিহাসের দিগন্তে অপস্রিয়মাণ এক ছায়াবিশেষ। তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ভাষা-ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এখন ক্রমশ পিছু হঠছে। কীভাবে তার কিছু নমুনা দেখা যাক।

বাংলা ভাষার পিছু হঠা

বাংলাদেশে বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক অবস্থা বাংলাদেশের দুই ভাষাতাত্ত্বিক গুলশন আরা বেগম ও স্বরোচিষ সরকারের পর্যবেক্ষণে এভাবে ধরা পড়েছে:

১. **ভাষার প্রতি মনোভাব, ভাষার ব্যক্তিগত ব্যবহার**
বাংলাদেশে এখন প্রাক্তন রাজভাষা ইংরেজির দাপট দেখা যাচ্ছে। ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা ব্যক্তির আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে সাহায্য করে, তাই অনেক অভিভাবকই সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন, একই সঙ্গে তা সামাজিক মর্যাদার একটি সূচকে পরিণত হয়েছে। ফলে একশ্রেণির লোকের মধ্যে ভাষাসরণ ঘটার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।... অনেক ক্ষেত্রে (বাংলা) ভাষার প্রতি মনোভঙ্গি নেতিবাচক হয়ে পড়েছে।[২২]

২. **সরকারি দাপ্তরিক কাজে**
সরকারি অফিসসমূহে নানা অজুহাতে যাঁরা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে নথিপত্র লিখতে চাইতেন ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন প্রণীত হওয়ার পর তাঁরা খানিকটা সংযত হন।... তবে নব্বই দশকে কমপিউটার যন্ত্রের আবির্ভাবের পর সরকারি অফিসসমূহে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।... ২০০২ সালে প্রশাসনকে জনগণের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে 'বাংলাদেশ সরকার ন্যাশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি পলিসি ২০০২' প্রণয়ন করে (নীতির

নামও ইংরেজিতে!)--- ই-গভর্ন্যান্স-এর এই পদক্ষেপ পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষার বিপক্ষে যায়, প্রয়োজনীয় সফটওয়ার-এর অভাব দেখিয়ে কমপিউটার সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ইংরেজিকেও অপরিহার্য করে তোলা হয়।... এভাবে জনগণের কাছে যাওয়ার কথা বলে কার্যত জনগণের থেকে সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলতে থাকে।

...প্রসঙ্গত ২০১১ এবং ২০১২ সালের নির্দিষ্ট দিনে প্রচারিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি ম্যাসেজের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সব মোবাইলে সরবরাহকৃত এই ম্যাসেজে লেখা হয়: 'Deworm your children'। সরকারি এই ম্যাসেজটির অর্থ সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, উচ্চশিক্ষিত মানুষদের পক্ষেও বোঝা মুশকিল। কৃমির দ্বারা যারা বেশি আক্রান্ত, তাদের কাছে worm শব্দই অপরিচিত, deworm তো দূরের কথা।[২৩]

৩. **বেসরকারি দাপ্তরিক কাজ**
বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে থাকে আবার এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সত্তরের দশকে বাংলা ভাষায় কাজ শুরু করলেও, আন্তর্জাতিকতার ছুতোয় আশির দশক থেকে বাংলা ভাষা বর্জন করতে শুরু করে, নববইয়ের দশকে কমপিউটারের আগমনের পর যে সামান্য কাজও তারা বাংলায় করত, তাও বর্জন করে।[২৪]

৪. **বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও**
...এন জি ও প্রধানত গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। তার ফলে তাদের মাঠ পর্যায়ের কাজকর্মে বাংলা ভাষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এইসব এনজিও-র দাপ্তরিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা একরকম অনুপস্থিত, এইসব প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করেন, তাদের নিয়োগপত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম ইংরেজিতে হয়। অনেক সময়ে এইসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি দাতা সংস্থা থেকে, জাতিসংঘের সংস্থা থেকে সরাসরি আবার কখনও বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অর্থ পায়—যেভাবেই পাক, এইসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে, তাদের দাতা যেহেতু ইংরেজিভাষী, তাই ইংরেজিতে কাজকর্ম করলে দাতাদের নিকট নিজেদের স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে পারবে। সম্ভবত এই মনস্তত্ত্ব থেকে ইংরেজি ভাষার প্রতি এন জি ও-দের এমন দুর্বলতা।[২৫]

৫. **আদালত**

বাস্তবে নিম্ন আদালতসমূহের যাবতীয় কার্যাবলি বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে। তবে উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এখনও সার্বজনিক হয়ে উঠতে পারেনি। হাইকোর্টের কিছু কিছু রায় বাংলায় লেখা শুরু হলেও সুপ্রিম কোর্ট বা তার আপিল বিভাগের ভাষা এখনও ইংরেজি।[২৬]

৬. **প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা**

একুশ শতকের সূচনায় বিত্তবান শ্রেণির মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। শিক্ষা খানিকটা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হওয়ার কারণেও এই প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে খানিকটা গৌণ করে তুলেছে বলে মনে হতে পারে। সেইটি হলো বড় বড় শহরগুলোতে মূল ধারা শিক্ষাক্রমকে ইংরেজি ভাষায় পড়ানোর উদ্যোগ। এইটি বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ধারার লঙ্ঘন (বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ ধারায় সবার জন্য সমান শিক্ষার কথা বলা হয়েছে) হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। কেননা এর ফলে সবার জন্য সমান শিক্ষার বদলে বিশেষ একটি শ্রেণির জন্য আলাদা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, এমন মনে করা যায়। প্রসঙ্গত 'এসএসসি' ও 'এইচএসসি' পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের ভাষা-মাধ্যমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের সার্টিফিকেট, মার্কশিট প্রভৃতি প্রধানত বাংলা ভাষায় প্রদান করা হতো। তবে প্রয়োজনে তা ইংরেজি ভাষায় প্রদান করার বিধান ছিল। একুশ শতকে এসে সেখানে একটা অভাবনীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে। এখন বোর্ডগুলো শুধু ইংরেজি ভাষায় সার্টিফিকেট ও মার্কশিট দিতে শুরু করেছে।[২৭]

৭. **মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা**

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষামাধ্যমকেও স্বীকার করা হয়। প্রায় সমকালে (১৯৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স, এমএ, এমএসসি, এমকম প্রভৃতি পরীক্ষায় বাংলা মাধ্যমকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হতে

থাকে।... বাংলা একাডেমি ঢাকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি একে একে অনেকগুলো পরিভাষাকোষ প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলা একাডেমিতে পাঠ্যপুস্তক নামে আলাদা একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে কয়েক হাজার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে...। আশির দশকে ব্যাপক চাহিদাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এগিয়ে আসে। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচুর সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে নব্বইয়ের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বাংলা ভাষায় প্রচুর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। একুশ শতকের সূচনায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ভাষামাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের পাঠক্রমের দিকে তাকানো যেতে পারে। বিজ্ঞান অনুষদের অধীনস্থ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগের উপযুক্ত বাংলা ভাষায় রচিত প্রচুর পাঠ্যপুস্তক বাংলা একাডেমি সহ বিভিন্ন প্রকাশনসংস্থা থেকে প্রকাশিত আছে। এমনকি বাংলা ভাষায় পাঁচ খণ্ডের একটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষও বাংলা একাডেমির রয়েছে। কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিজ্ঞান অনুষদের কোনো বিভাগের সিলেবাসেই এসব বইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করে না।... রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা যায়, সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও যতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার বিধান ছিল, ততদিন পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ছাত্ররা পড়ত। কিন্তু ২০০৭ সালে এই বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি একমাত্র ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার বিধান জারি করার পর বাংলা বইগুলো একেবারেই অপাঠ্য বইয়ে পরিণত হয়েছে। আশির দশক বা নববইয়ের দশকে সরকারি বিশ্বিবিদ্যালয়গুলো বাংলা ভাষাকে যতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখত, নতুন শতাব্দীতে এসে সে শ্রদ্ধাবোধও অবসিতপ্রায়...।

ফলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে দাপ্তরিক কাজকর্ম ছাড়া এবং ক্লাস-লেকচারে শিক্ষকের আঞ্চলিকতা মিশ্রিত মাতৃভাষা ছাড়া... বাংলা ভাষার কোনো ব্যবহার নেই...। প্রায়োগিক বিদ্যায় ভাষার ব্যবহার খুব

সামান্য হলেও এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যক্রম পুরোপুরি ইংরেজি ভাষামাধ্যমের। এসব বিদ্যা বাংলা ভাষায় প্রদান করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন না। কেন ভাবেন না, বলা মুশকিল। অথচ বিশ শতকের সূচনায় ঢাকায় প্রথম যে মেডিকেল স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানকার শিক্ষকগণ বাংলা মাধ্যমে চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতেন, বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যবইও তখন প্রকাশিত হতো এবং ছাত্ররা তা পড়ে ডাক্তারিও করতে পারতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার এই দৈন্যের পিছনে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার কোনো কারবার নেই। আবার সেগুলোর অনেকের সঙ্গে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ থাকে। সর্বোপরি, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো যাই হোক না কেন, এখানকার শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট। বাস্তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বাড়তি কামাই করতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। অনেকে নামেমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত চাকরিরত অবস্থাতেই মূল কর্মঘণ্টার শতকরা নববইভাগ ব্যয় করেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাঁরা এই ধরনের সুযোগ পান, অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষমতা বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিপক্ষে স্বতস্ফূর্ত অবস্থান গ্রহণ করে।[২৮]

৮. **পরিষেবা**

...বিদ্যুৎ বা টেলিফোন বিলে... রোমান লিপিতে লেখার মধ্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব আছে এমন মনে হয় না। বরং বাংলায় লিখলে নাম-ঠিকানাগুলো শুদ্ধভাবে লেখা যেত, অন্যদিকে ইংরেজিতে লেখার ফলে খুব সহজেই একজনের নাম আর একজনের নামে পরিণত হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে হাস্যকর হলো বাংলাদেশের ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র। গ্রামের ডাক্তার থেকে শুরু করে শহরের পাস-করা-ডাক্তার পর্যন্ত সকলে ইংরেজি ভাষায় ব্যবস্থাপত্র লেখেন।... ঐ ব্যবস্থাপত্র শুধু ওষুধের দোকানদারই পড়তে পারে, রোগী বা রোগীর পরিবারের সদস্যদের নিকট তা দুর্বোধ্য।[২৯]

এভাবেই একের পর এক ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার ক্রম-সংকুচিত হয়ে চলেছে, ভাষার মর্যাদা ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

ভাষার মান, মানুষের মান

বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মান আজ বাংলাদেশের সমাজের নীচের তলার মানুষের মানের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সেখানে সোপানতান্ত্রিকতায় বিন্যস্ত, সোপানতন্ত্রের উপরমহলের ক্ষমতাবানরা তাদের সমৃদ্ধির পথ খুঁজে নিয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতির শৃঙ্খলে নিজ দেশের সমস্ত সম্পদকে বন্ধক রেখে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে, আর তাই সোপানতন্ত্রের নিচের মহলের ব্যাপক মানুষের অধিকার ক্রমাগত খোয়া যাচ্ছে—দেশের সম্পদের উপর অধিকার খোয়া যাচ্ছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারও খোয়া যাচ্ছে। বাংলা দেশের ভাষা পরিস্থিতিও এর দ্বারাই চালিত হচ্ছে। মানহীন অধিকারহীন ব্যাপক মানুষের ভাষা হিসাবে বাংলাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে ভাষার ব্যবহারক্ষেত্রগুলোয় ক্রমশ জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে ক্ষমতাবানদের পছন্দের ভাষা ইংরেজির কাছে। বাংলা ভাষার এই ক্রমপশ্চাদপসরণের শেষ বোধহয় হবে না যতদিন বাংলা যাদের একমাত্র ভাষা সেই হত-মান হত-অধিকার মানুষগুলোরও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমপশ্চাদপসরণের শেষ হয়। দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার, ভূমিকা নেওয়ার ক্ষমতা সমতার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা ও প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে প্রচলনের সমান সুযোগ করে দেওয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সোপানতন্ত্র ভেঙে তেমন এক গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ার সংগ্রামকে তাই মনে হয় বাংলাদেশের আপামর সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাগুলোর মান প্রতিষ্ঠা ও সর্বস্তরে প্রচলনের সংগ্রামের থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। সেই আপামর সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশিজনের, প্রতি ১০ জনে ৯ জনেরও বেশির ভাষা বাংলা, কিন্তু বাংলাই একমাত্র ভাষা নয়। অল্প সংখ্যক মানুষের হলেও আরও বহু ভাষা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। বাংলা ভাষা প্রচলনে উৎসাহী মানুষ এই অন্য ভাষাগুলোকে অনেক সময়েই হয়ত ধর্তব্যের মধ্যে ধরেনি, কিন্তু অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সোপানতন্ত্রের বিরুদ্ধে তলাকার মানুষের গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য লড়াই সেই ভাষাগুলোর অধিকারের জন্যও লড়াই অবশ্যই। বাংলাদেশের বরিষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক আনিসুজ্জামান তাঁর ২০০৮ সালে লেখা প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেছেন:

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হল, তখন তার সমরূপতায় আমরা নিজেরাই এত অভিভূত হয়েছিলাম যে, অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার কথা আমাদের মনে হয়নি, এমনকী চাকমা জনপ্রতিনিধি যখন বাঙালিদের থেকে চাকমাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুললেন, তখনও তা আমাদের মনে তেমন দাগ কাটেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সিকি শতাব্দীর সশস্ত্র সংঘাত আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটিয়েছে। এখন খোঁজখবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে পঁয়তাল্লিশটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর বাস। তারা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করে, আর আমাদের সরকার তাদের অভিহিত করে উপজাতি হিসেবে। তাদেরকে পাছে আদিবাসী বলে স্বীকার করতে হয়, এই ভয়ে জাতিসংঘ-ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসও এদেশে সরকারিভাবে পালিত হয় না...। ...অনেক জনগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আটটি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের নিচে, আরও দুটি পাঁচ থেকে ছ হাজারের মধ্যে। এসব ভাষা টিকিয়ে রাখাই দুঃসাধ্য। বর্ণমালা নেই অনেকগুলো ভাষার। যারা রোমান বা বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করছে, তারা সকলেই যে খুব বেশিদিন ধরে এমন করছে, তা নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্মগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও বহু জনগোষ্ঠীর পক্ষে সে-অধিকার লাভ বা প্রয়োগ করা কঠিন হবে। চাকমা, মারমা, গারো বা ত্রিপুরী ভাষাভাষীর পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভবপর, অন্যদের পক্ষে তা নাও হতে পারে। তবু যাদের বর্ণমালা নেই, তাদের জন্যে বর্ণমালা--- তা সে বাংলা হলেও--- তৈরি করা হবে একটা প্রাথমিক কাজ।[৩০]

তথ্যসূত্র / উল্লেখপঞ্জী

১. আনিসুজ্জামান-এর 'বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত 'আনিসুজ্জামান: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' পুস্তকের ২৮৭-২৯৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠায় আছে।

২. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-২৮।

৩. আহমদ শরীফ-এর 'বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি' পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠায় আছে।

৪. আহমদ শরীফ-এর 'বাংলাভাষা সংস্কার আন্দোলন' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৯।

৫. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-২১।

৬. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-২২।

৭. 'মাহে নাও' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫১-তে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসান লিখিত 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধ।

৮. আনিসুজ্জামানের ১৯৭৫ সালে লেখা প্রবন্ধ 'স্বরূপের সন্ধান'-এ উদ্ধৃত। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত 'আনিসুজ্জামান: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় আছে।

৯. ডেভিড লিউয়িস-এর 'বাংলাদেশ: পলিটিকস, ইকনমি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি' পুস্তক, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা ২০১১ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৮।

১০. আনিসুজ্জামানের ২০১০ সালে লেখা প্রবন্ধ 'বাঙালির আত্মপরিচয়'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত 'আনিসুজ্জামান: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ৬০-৬১ পৃষ্ঠায় আছে।

১১. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৪৯।

১২. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-১৭।

১৩. স্বরোচিষ সরকারের প্রবন্ধ 'মাতৃভাষার সাংবিধানিক অধিকার ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা' পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় আছে।

১৪. নির্দেশটির পূর্ণ বয়ান কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা' পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে।

১৫. নির্দেশটির পূর্ণ বয়ান কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা' পুস্তকের ১৯-২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে।

১৬. নির্দেশটির পূর্ণ বয়ান হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৪৫-এ উদ্ধৃত আছে।

১৭. বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ একটিমাত্র বাক্যে গঠিত। বাক্যটি হল: 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।'

১৮. মনসুর মুসা-র 'বাংলা প্রচলন সংক্রান্ত বিবেচনা' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বাংলা একাডেমি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ষষ্ঠ অধিবেশনে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ পঠিত। মুক্তধারা, ঢাকা দ্বারা ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত মনসুর মুসা-র 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' পুস্তকে প্রবন্ধটি সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ১৩৭-১৩৮ ও ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠায় আছে।

১৯. হুমায়ুন আজাদ-এর 'বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র' পুস্তক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা দ্বারা ২০১০ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৩৪।

২০. খোন্দকার আবদুল হামিদ-এর 'স্পষ্টভাষী স্মরণে', ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২১-২৩।

২১. এই বিতর্ক বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে আনিসুজ্জামানের ১৯৯৭ সালে লেখা প্রবন্ধে: 'বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশি'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত 'আনিসুজ্জামান: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' পুস্তকে সংকলিত।

২২. বাংলাদেশ বাংলা একাডেমির দ্বারা প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ২য় খণ্ড'-এ গুলশন আরা বেগম-এর ২০১১ সালে লেখা ভূমিকা।

২৩. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

২৪. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা : আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় আছে।

২৫. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় আছে।

২৬. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় আছে।

২৭. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় আছে।

২৮. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ৩২-৩৭ পৃষ্ঠায় আছে।

২৯. স্বরোচিষ সরকারের ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে লেখা প্রবন্ধ 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা'। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত স্বরোচিষ সরকারের একই নামের পুস্তকে সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে।

৩০. আনিসুজ্জামান-এর 'বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি কথাপ্রকাশ, ঢাকা দ্বারা ২০১৫-তে প্রকাশিত 'আনিসুজ্জামান: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' পুস্তকের ২৮৭-২৯৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত। উদ্ধৃত অংশটি উক্ত পুস্তকের ২৯৪-২৯৬ পৃষ্ঠায় আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের আঁটুনি ও রোহিঙ্গাদের দুর্গতি

ভূমিকা

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্গত মানুষদের মধ্যে অন্যতম হল রোহিঙ্গা জনজাতিগোষ্ঠী। বহু শতক ধরে তাদের ভিটে-মাটি-দেশ ছিল আরাকান (বর্তমানের রাখাইন) প্রদেশ। আজ তাদের সেই নিজ ভূম থেকে তারা দলে দলে বিতাড়িত নৃশংস হামলার মুখোমুখি হয়ে। যারাও-বা সেখানে আছেন, তাদের বলির পশুর মতো গাদাগাদি করে বন্দি করে রাখা হয়েছে কিছু কিছু শিবিরে নাগরিক সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। দেশ থেকে বিতাড়িত বা হিংস্র আক্রমণের মুখে প্রাণ বাঁচাতে দেশছাড়া হওয়া রোহিঙ্গারা হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এমনকী সুদূর কানাডাতেও শরণার্থী হিসাবে। সদ্য ২০১৭ সালেই প্রায় ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতেও তাদের দুর্গতির শেষ নেই। বর্মা/মায়ানমার-এ সেনা ও উগ্র জাতিবিদ্বেষীদের আক্রমণে অসংখ্য রোহিঙ্গা প্রাণ হারিয়েছে, আবার শরণার্থী শিবিরেও খাদ্য-চিকিৎসার অপ্রতুলতা অসংখ্য রোহিঙ্গার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

কেন রোহিঙ্গাদের এই অবস্থা?

মায়ানমারের রাষ্ট্রনেতারা যা বলছেন, যার প্রতিধ্বনি বা সম্প্রসারণ ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের মুখেও শোনা যাচ্ছে, তা হল এই যে রোহিঙ্গারা উগ্রপন্থী, অপরাধ ও হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত বলেই এই অবস্থা। মার খেতে খেতে যে মাটিতে পড়ে আছে তাকেই মারকুটে বলার এই দ্বিচারিতার সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' (আরসা)-র উপস্থিতি ও আন্তর্জাতিক ইসলামি গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্ভাব্য যোগাযোগ।

মায়ানমারে রোহিঙ্গারাই রাষ্ট্রীয় আক্রমণের শিকার অথচ তাদের নিজেদের (সন্ত্রাসবাদী হওয়ার) দোষেই নাকি এমতাবস্থা—রাষ্ট্রনেতাদের এহেন ভনিতার মিথ্যাচার উন্মুক্ত হয়ে যায় যখন আমরা খেয়াল করি যে মায়ানমারের রাষ্ট্র সে দেশের প্রায় ২০টি জনজাতির সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে এবং এই প্রতিটি জনজাতিরই নিজস্ব সশস্ত্র সেনা ছিল বা আছে এবং এই সমস্ত যুযুধান জনজাতিদের সেনা চিন, ব্রিটেন ইত্যাদি 'বিদেশি শক্তি'-র পৃষ্ঠপোষেণা, সহায়তাও পেয়েছে (যেমন, কাচিন, কোকাঙ, সানদের সশস্ত্র সেনা চিন সরকারের পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছে; কারেনদের সেনা পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছে ব্রিটিশ সরকারের)। তাই রোহিঙ্গারা কেন আক্রান্ত তা আর বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন থাকে না, তা যুক্ত হয়ে যায় এই প্রশ্নের সঙ্গে যে, বর্মা/মায়ানমার-এর রাষ্ট্র কেন তার অ-বর্মী জনজাতিগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আছে? এই প্রশ্ন মাথায় নিয়ে বর্মা/মায়ানমার রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মায়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্মী মানুষের মধ্যে এই রাষ্ট্র তার গ্রহণযোগ্যতা বা যৌক্তিকতা তৈরি করছে 'বর্মী-বৌদ্ধ' জাতীয় পরিচয়কে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে সেই আদর্শানুযায়ী গোটা মায়ানমারকে সমরূপতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য ঘোষণা করে ও সেই লক্ষ্যে বর্মী-বৌদ্ধ মানুষদের শামিল করে। তাই রোহিঙ্গাদের উপর রাষ্ট্রের নির্মম আক্রমণের সহযোগী হচ্ছে রাখাইন বৌদ্ধদের একটা উগ্র অংশ, রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন করার দাবি তুলে মিছিল হচ্ছে বর্মী-সংখ্যাগরিষ্ঠ নানা এলাকায়।

প্রশ্নটা তাই কেবলমাত্র রাষ্ট্র বনাম নিপীড়িত জাতিরও নয়, প্রশ্নটা অপরাপর জনজাতির মধ্যে দ্বেষ-হিংসা-অবিশ্বাস-এর বাতাবরণেরও।

এই অধ্যায়ে তাই মায়ানমারের জনজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এই বাতাবরণের উদ্ভব ও বিবর্তনের সাপেক্ষে মায়ানমারের বর্তমান রাষ্ট্রের কথা ও রোহিঙ্গাদের দুর্গতির উৎসকথা আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। উত্তর খোঁজা হবে এই প্রশ্নের যে রোহিঙ্গাদের বিপন্নতার দিনরাত্রির অবসান ঘটানোর মতো নতুন কোনো শুরু সম্ভব কি না।

মায়ানমারের জনগোষ্ঠী

মায়ানমার বলে চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠী বাস করে। মায়ানমারের সরকারি নথি থেকে এই জনজাতিগোষ্ঠীদের উপস্থিতি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা সারণি-১-এ দেওয়া হল।

সারণি-১

মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ

জনজাতিগোষ্ঠীর নাম	১৯৮৩-র জনগণনা অনুযায়ী	২০০৩-এর জনগণনা অনুযায়ী
কাচিন (১২টি উপগোষ্ঠী সমেত)	১.৪	১.৪
কায়া (৯টি উপগোষ্ঠী সমেত)	০.৪	০.৫
কায়িন (১১টি উপগোষ্ঠী সমেত)	৬.২	৬.৪
চিন (৫৩টি উপগোষ্ঠী সমেত)	২.১	২.১
বামার (৯টি উপগোষ্ঠী সমেত)	৬৯.০	৬৭.৯
মোন	২.৪	২.৭
রাখাইন (৭টি উপগোষ্ঠী সমেত)	৪.৫	৪.২
শান (৩৩টি উপগোষ্ঠী সমেত)	৮.৫	৯.৪
অন্যান্য	৫.৪	৫.৪

[সূত্র: এই সারণিটি মায়ানমার সরকারের বিভিন্ন নথি থেকে তৈরি করে তিন মাউঙ মাউঙ থান তার 'ম্যাপিং দি কনটুরস অফ হিউম্যান সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস ইন মায়ানমার' প্রবন্ধে পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধটি সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ দ্বারা ২০০৭ সালে প্রকাশিত এন গণেশন ও কিয়াও ইন হলাই সম্পাদিত 'মায়ানমার: স্টেট, সোসাইটি অ্যান্ড এথনিসিটি' গ্রন্থে পাওয়া যায়।]

সারণি-১ দেখলে প্রথম নজরেই খেয়াল করা যায় যে বামার জনজাতি (যা বর্মী জনজাতি নামেও পরিচিত) মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশ কিছুটা বেশি। জনসংখ্যায় বামারদের এই আধিপত্য কি সদৃশভাবে গোটা মায়ানমারেই বিস্তৃত, অর্থাৎ সব অঞ্চলেই কি এই আধিপত্য বর্তমান? তা এই সারণি থেকে বোঝা যায় না, তা বোঝার জন্য অঞ্চলভিত্তিতে আরও বিশদ তথ্য দেখতে হবে। তাতে আমরা যাব। কিন্তু তার আগে এই সারণি থেকে আরও কী কী খেয়াল করা যায় দেখা যাক। সারণিটিতে জনজাতিগোষ্ঠীগুলোর নামের স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে মোন ছাড়া প্রতিটি জনজাতিগোষ্ঠীর পাশে বন্ধনীর মধ্যে বেশ ভালোসংখ্যক উপগোষ্ঠীর উপস্থিতি নির্দেশিত আছে। চিন ও শান জনজাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তো সংখ্যাটা খুবই বড়ো। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জনজাতিগোষ্ঠীগুলিও মোটেই সমসত্ত্বীয় নয়। প্রকৃতপক্ষেই একটি জনজাতিগোষ্ঠীর ভিতরের এই উপগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও

সমাজ-আচার, বিশ্বাস, ভাষা-র ক্ষেত্রে এমন পার্থক্য বর্তমান যা দুই জনজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হাজির থাকা পার্থক্যের সমতুল্য। ফলত জনসংখ্যার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বহুত্ব কেবল জনজাতিগোষ্ঠীদের মধ্যের পার্থক্যেই সীমিত নয়, তা জনজাতিগোষ্ঠীগুলোর আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের মধ্যে দিয়েও বহাল রয়েছে।

এই বৈচিত্র্য ও বহুত্ব মায়ানমারের ভাষার মানচিত্র থেকেও প্রতিভাত হয়। মায়ানমারে অন্তত ছয়টি ভাষা-পরিবারের ভাষা কথিত হয়:

১। তিব্বতি-বর্মী পরিবার, যার কিছু সদস্য হল বর্মী ভাষা, লাহু ভাষা, লিসু ভাষা, রাখাইন ভাষা, চিন ভাষা।
২। মোন-খেমের পরিবার, যার কিছু সদস্য হল মোন ভাষা, ওয়া ভাষা, পালাউঙ ভাষা।
৩। তাই-কডাই পরিবার, যার কিছু সদস্য হল থাই ভাষা, শান ভাষা।
৪। হমঙ-মিয়েন পরিবার, যার কিছু সদস্য হল হমঙ ভাষা, ইয়াও ভাষা।
৫। অস্ট্রোনেসিয় পরিবার, যার অন্যতম সদস্য হল সালোন ভাষা।
৬। ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবার, যার সদস্য রোহিঙ্গা ভাষা।

এছাড়া অগণিত মিশ্র ভাষা ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাষারূপ হাজির আছে। বামার বা বর্মী জনজাতির ভাষা বর্মী ভাষা। সেই ভাষাই সরকার-প্রশাসনের ভাষা হিসাবে, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষামাধ্যম হিসাবে আধিপত্যকারী। অন্যান্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা সরকার-প্রশাসন-শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার না পেয়ে সামাজিক পরিসরে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, এই নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সারণিটির শেষ সারিটিও খেয়াল করার মতো। এই সারিতে কোনো জনজাতিগোষ্ঠীর নামোল্লেখ না করে জাবদাভাবে অন্যান্য অভিধায় ৫.৪ শতাংশ জনসংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নজর করা যায় যে আয়তনে-বহরে এই 'অন্যান্য'-রা সারণিটিতে নয়টি-র মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম। ০.৪ বা ০.৫ শতাংশের কায়াদেরও যেখানে পৃথক উল্লেখ আছে, সেখানে এই ৫.৪ শতাংশের মধ্যের মানুষজনের পরিচয় উল্লেখের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল কীভাবে? এই ৫.৪ শতাংশের মধ্যে উপস্থিত জনজাতিগুলির আয়তন কি শতাংশের হারে ০.৪-এর থেকেও অনেক কম? তা যে নয়, তার অনুমান করা যায় এর থেকে যে এই অন্যান্যদের মধ্যে চাপা পড়ে আছে রোহিঙ্গারা—মায়ানমার থেকে যাদের নির্মম অত্যাচার করে বিতাড়ন আজ বহু আলোচনার বিষয়। এই রোহিঙ্গারা সংখ্যায়

মায়ানমারের ১৯৮৩ বা ২০০৩-এর জনসংখ্যার ২ শতাংশের কিছু বেশিই হবে, যদিও সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল কারণ ১৯৮২-র পর থেকে মায়ানমার সরকার তার জনগণনায় রোহিঙ্গাদের 'রোহিঙ্গা' না বলে 'বিদেশি', 'বাংলাদেশি' 'বাঙালি'—এমন নানা অভিধায় তাদের পরিচয়কে গুলিয়ে দিতে চাইছে। যেমন, ১৯৮৩ সালের সরকারি জনগণনায় রাখাইন রাজ্যে ২৪.৩ শতাংশ মানুষকে বাংলাদেশি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্বতন 'আরাকান', বর্তমান 'রাখাইন' প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বসতের ইতিহাস বেশ কয়েক শতাব্দীর। সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে পুনঃনির্মিত ইতিহাসের রায়ে রোহিঙ্গাদের 'বিদেশি অভিবাসী' বানিয়ে মায়ানমার সরকার এই জনজাতির স্বপরিচয়কে ধ্বংস করে তাদের দেশের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। ফলত, বোঝা যাচ্ছে যে পূর্বোক্তৃত সারণির 'অন্যান্য' অভিধার মধ্যে আসলে চাপা পড়ে আছে এমন বহু জনজাতির পরিচয় যাদের স্বপরিচয়ের সরকারি স্বীকৃতি মেলেনি।

সব মিলে, সারণি-১-এর তথ্য আলোচনা করে মায়ানমার-এর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বামার বা বর্মী জনজাতির সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি আরও প্রচুর জনজাতির সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যবহুল ও বহুত্বসম্পন্ন মানব-বিস্তারের আভাস এবং বেশ কিছু জনজাতির অবদমিত অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জনজাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আধিপত্য ও অবদমন কীভাবে কেন তৈরি হয়েছে ও হয়ে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব। সেই খোঁজার পথে পূর্বোত্থিত আর একটি প্রশ্নকে ধরে প্রবেশ করা যাক। পূর্বোত্থিত প্রশ্নটি হল, বামার বা বর্মী জাতির সংখ্যাগত আধিপত্য কি মায়ানমারের সব অঞ্চলে সদৃশভাবে বিস্তৃত?

মায়ানমারের ভৌগোলিকভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বামার বা বর্মীদের সংখ্যাগত আধিপত্য বিপুল। এই সমস্ত অঞ্চলে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশই হল বামার বা বর্মী। কিন্তু মায়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল বা জেলাগুলোয় সংখ্যাগতভাবে বর্মী বা বামাররা বেশ কম, এখানে সংখ্যাধিক্য দেখা যায় বিভিন্ন অপর জনজাতিগোষ্ঠীর। এই সমস্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনসংখ্যার জনজাতিগত বিন্যাস সারণি-২-এ দেওয়া হল।

দেখা যাচ্ছে যে সীমান্তবর্তী সাতটি রাজ্য, সাতটি জনজাতিগোষ্ঠীর নামে চিহ্নিত এবং প্রতিটি রাজ্যে সেই বিশেষ জনজাতিগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য প্রবল। কাচিন রাজ্য ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই বামার বা বর্মী জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা সংখ্যাগুরু জনজাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা থেকে অনেক কম। সুতরাং বামার বা বর্মীগোষ্ঠীর সংখ্যাগত আধিপত্য মায়ানমারের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোয়

বিবিধ জনজাতির জনসংখ্যাই বেশি। ঐতিহাসিকভাবেও এই সমস্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর লোকসমাজ ও লোকজীবনের গঠনে অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠীগুলির বহুল বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের মোজাইক বর্তমান। এই সমস্ত রাজ্যগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতিগুলি তাদের অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় শাসনের বিস্তারকে বামার বা বর্মী জাতির অন্যায় আধিপত্যবিস্তার হিসাবে দেখেছে এবং বার বার তার প্রতিরোধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। মায়ানমারের অন্তত ২০টি জনজাতি তাদের নিজস্ব সেনা গড়ে তুলে মায়ানমারের কেন্দ্রীয় সেনাশাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে বা আছে গত ষাট বছর ধরে। কীভাবে মায়ানমারের কেন্দ্রীয় শাসন বর্মীয় জাত্যাভিমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আর একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার যা উঠে আসছে সারণি-২ থেকে।

সারণি-২

জনজাতি	চিন রাজ্য	কাচিন রাজ্য	কায়িন রাজ্য	কায়া রাজ্য	মোন রাজ্য	রাখাইন রাজ্য	শান রাজ্য
বামার	০.৮ (০.৮)	২৯.৩ (২৯.১)	১৪.১ (১৪.১)	১৭.৫ (২০.৬)	৩৭.২ (৩৭.২)	০.৭ (০.৭)	১১.১ (১১.৪)
চিন	৯৬.৬ (৯২.৯)	—	—	—	—	৩.২ (৩.১০)	—
কাচিন	—	৩৮.১	—	—	—	—	৩.৮
কায়িন	—	—	৫৭.১ (৫০.৯)	৬.৪ (৫.৪)	১৫.৭ (১২.৭)	—	—
কায়া	—	—	—	৫৫.৯ (৫৪.১)	—	—	১.২(—)
মোন	—	—	১৭.১ (১৭.৭)	—	৩৮.২ (৩৮.২)	—	—
রাখাইন	৪.৪ (৩.৭)	—	—	—	—	৬৭.৮ (৬৪.৩)	—
শান	—	২৪.২ (২৩.৪	৩.০ (২.৯)	১৬.৬ (৮.৫)	—	—	৭৬.৪

সারণি ব্যাখ্যার্থে নির্দেশিকা: ১। প্রতিটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাব দেওয়া হয়েছে। ২। বন্ধনীর বাইরের সংখ্যা ১৯৮৩-র জনগণনা অনুসারে ও বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ২০০৩-এর জনগণনা অনুসারে। ৩। '—' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে যেখানে শতাংশের হার ১ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। [সূত্র: সারণি-১-এর অনুরূপ।]

সারণি-২-এ রাখাইন রাজ্যের হিসাব অন্য রাজ্যগুলোর হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে একটা অসঙ্গতি চোখে পড়বে। অসঙ্গতিটি হল এইরকম—অন্য সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রদত্ত হিসাবে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বা তার বেশির ভাগ হিসাব থাকলেও রাখাইন রাজ্যের ক্ষেত্রে আছে মাত্র ৭২ শতাংশের মতো হিসাব। জনসংখ্যার বাকি ২৮ শতাংশের মধ্যে ২৪.৩ শতাংশকে মায়ানমার সরকার তার জনগণনায় বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করে 'বিদেশি অভিবাসী' হিসাবে নাগরিক অধিকারহীন করে দিয়েছে—অথচ যারা আসলে এই প্রদেশে কয়েক শতাব্দী ধরে বাস করে আসছে 'রোহিঙ্গা' জাতি-পরিচয় নিয়ে।

১৯৮২-তে মায়ানমার সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইন তৈরি করে কৌশলে এদের নাগরিক পরিচয় কেড়ে নেওয়ার আগে, তারপর থেকে দফায় দফায় সেনা-অত্যাচারে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হওয়ার (১৯৭৮, ১৯৯১, ২০১২ ও ২০১৭-তে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দেশছাড়া করা হয়) আগে অবধি রাখাইন প্রদেশে এই রোহিঙ্গাদের সংখ্যা রাখাইনদের সংখ্যার প্রায় সমান-সমান ছিল। নাগরিক অধিকার হারানো মানুষজনের অস্তিত্বকে কীভাবে উধাও করে দেয় সরকারি হিসাব-খাতার শূন্যতাগুলো!

জনগোষ্ঠীর বহুত্ব বনাম সমরূপতার অতিকথা

মায়ানমারের নতুন রাজধানী নেপিদও (কেন্দ্রীয় বামার/বর্মী অঞ্চলের যে শহরে ২০০৫ সালে রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হয়)-এর ঊষর প্রান্তরে তিনটি বিশাল মূর্তি সরকার স্থাপন করেছে। মূর্তি তিনটি অতীতের তিন বর্মী যোদ্ধা-রাজার—আনাওরাহতা (রাজত্বকাল ১০৪৪ থেকে ১০৭৭), বায়িনাউঙ (রাজত্বকাল ১৫৫১–১৫৮১) ও আলাউঙপায়া (রাজত্বকাল ১৭৫২-১৭৬০)। মায়ানমারের সেনাপ্রধান শাসকরা—২০১১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই ১৯৬২ সালের পর আবার প্রায় ৪০ বছর বাদে নির্বাচিত সরকার গঠনের পরও যারা রাষ্ট্রপতির পদ সহ রাষ্ট্রক্ষমতার মূল কেন্দ্রগুলোকে এখনও তাদের নিয়ন্ত্রণ রেখে দিয়েছে,—তারা নিজেদের এই তিন যোদ্ধা-রাজার উত্তরপুরুষ হিসাবে তুলে ধরে এবং

তাদের শাসনকে এই তিন যোদ্ধা-রাজার শাসনের পর দেশ ও দেশের ঐক্য রক্ষায় নিবেদিত চতুর্থ শাসন হিসাবে মনে করে। অতীতের এই তিন বর্মী যোদ্ধা রাজাদের কী কীর্তি ছিল? এই তিন যোদ্ধা রাজাই তাঁদের আশপাশের অ-বর্মী রাজ্যগুলোকে আক্রমণ করে পরাভূত করে তাদের রাজত্ব প্রসারিত করেছিল এবং এইভাবে তারা অ-বর্মীদের উপর বর্মী-শাসন কায়েম করেছিল। 'বর্মা' নাম পাল্টে তাদের রাজত্বের নামের আদলে 'মায়ানমার' নাম রেখেছে সেনা-শাসকরা এবং ওই যোদ্ধা-রাজাদের শাসন বিস্তারকে 'জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার' আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সেনাপ্রধান শাসকদের এই রাষ্ট্রাদর্শ বর্মী জাত্যভিমানকে একটি অসহিষ্ণু আক্রমণাত্মক চেহারায় গড়ে তোলায় ইন্ধন জোগায়। যে অতীত থেকে তিন যোদ্ধা-রাজাকে তুলে নিয়ে এসেছে বর্মী সেনাপ্রধান শাসকরা, সেই অতীতে ও তারও পূর্বের অতীতে অধুনা 'মায়ানমার' বলে চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলটিতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল। এর মধ্যে বর্মী, মোন, শান ও আরাকান রাজত্ব ছিল ধারে-ভারে বড়ো। বর্তমানের পেগু শহরকে কেন্দ্র করে ছিল মোন রাজত্ব, ১২৮৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি। এই বৌদ্ধ রাজত্ব ঐশ্বর্যে বৈভবে প্রথমদিককার ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের নজর কেড়েছিল। অধুনা রাখাইন রাজ্যে আরাকান রাজত্বের কেন্দ্র ছিল, যে রাজত্ব খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে ১৭৮৫ অবধি দাঁড়িয়ে ছিল। এই রাজত্বের সঙ্গে ভারতীয়, সিংহলী ও আরব দেশের আদানপ্রদান ও যোগাযোগ বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। বর্মী যোদ্ধা রাজাদের আক্রমণেই এই রাজত্বগুলোর পতন হয়। বর্মীদের দ্বারা লুণ্ঠিতও হয় এবং বর্মী শাসনের অধীনস্থ হয়।

মোন, শান ও আরাকান রাজত্ব ছাড়াও অধুনা 'মায়ানমার' বলে চিহ্নিত ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ছিল বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষদের নিজস্ব সমাজ, যা সমাজ-গঠন ও প্রশাসনে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়েই বজায় ছিল। বর্মী রাজত্ব বা চৈনিক রাজত্বের মতো বড়ো-মাঝারি রাজতন্ত্রের প্রভাব এলাকার প্রান্তে অবস্থানের কারণে এরা মাঝে মধ্যে এইসব রাজতন্ত্রের কর বা অন্যান্য দাবি মেটাতে বাধ্য হলেও নিজেদের এলাকায় তাদের স্বাধীনতা মোটামুটি অটুটই থাকত। ইংরেজ উপনিবেশকারীরা যখন এই এলাকায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তখনও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কাল ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৮। এই সময় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা বর্মী, আরাকান ও মোন অঞ্চলকে একটি অখণ্ড প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আনলেও সীমান্তবর্তী

অঞ্চলগুলোকে 'ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স' হিসাবে আলগা প্রশাসনিক বাঁধনে রেখেছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্বময় জনসমাজকে ইংরেজরা তাদের ইউরোপীয় জাতি-পরিচয় ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগকরণের দৃষ্টি দিয়ে জাবদাভাবে কিছু জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ করে এবং তাদের চিহ্নিত এক একটি জাতির বাসস্থান হিসাবে এক একটি অঞ্চলকে তাদের রাজ্য (state) হিসাবে চিহ্নিত করে। এভাবেই কাচিন রাজ্য, কায়া রাজ্য, কায়িন (বা কারেন) রাজ্য, শান রাজ্য ইত্যাদির উদ্ভব। ইংরেজদের চোখে এরা ছিল 'নির্যাতিত সংখ্যালঘু' (oppressed minorities)। খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারক দল এদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্মপ্রচার করে 'অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলো'-য় নিয়ে আসার কাজ শুরু করে, অন্যদিকে ইংরেজ শাসক ও বণিকদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে একটি বিনা-শত্রুতার সম্পর্ক বজায় রেখে এখানকার জঙ্গলের বার্মাটিকের বিপুল ভাণ্ডারকে ও মহামূল্য পাথরের বিপুল ভাণ্ডারকে খাটিয়ে বাণিজ্য করায়। এর ফলে এই জনজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে স্ফূরিত সর্বপ্রাণবাদী (animist) ধর্মের ওপর কোথাও কোথাও বিদেশি পাদ্রির মুখ-বাহিত খ্রিস্ট ধর্মের প্রলেপ স্থায়ীভাবে শিলীভূত হয়; অভূতপূর্ব বাণিজ্যিকীকরণের তোড় বনসম্পদ ও ভূসম্পদ উজিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির দেহে নখরচিহ্নের জন্ম দিতে থাকে, কিন্তু সমাজ-গঠন ও প্রশাসনে এই জনজাতিগুলির পরম্পরা-বাহিত আত্মীয়-সম্পর্ক (kinship)-ভিত্তিক বা কৌম (clan)-ভিত্তিক কাঠামো অনেকটাই অটুট থাকে।

এই ইতিহাস-রোমন্থন দেখায় যে মায়ানমারের সেনা-শাসকরা অতীতের তিন বর্মী যোদ্ধা-রাজাকে অতিমানবের আকার দিয়ে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার হিসাবে গোটা মায়ানমারকে বর্মী শাসনের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে এনে বর্মী-আধিপত্য নামক ক্ষমতার এক সমরূপ বিস্তারের যে ঐতিহাসিক নিদর্শনকে তাদের কর্মপ্রেরণা হিসাবে সামনে আনছেন, তা অতিকথা (myth) বই আর কিছু নয়। মায়ানমারের জনবিস্তারে উপস্থিত বৈচিত্র্য ও বহুত্ব তার বিভিন্ন অঞ্চলে মানবসমাজের গঠন, কাঠামোরূপ ও প্রশাসনেও বৈচিত্র্য ও বহুত্ব বজায় রেখেছে। কোনো বর্মী-বৌদ্ধ সমরূপতা তাকে এক করে তুলতে পারেনি কখনও। কিন্তু বর্মী জাত্যাভিমান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় আবেগকে ঠাসবুনন করে এমন এক অতিকথা তৈরি হল কীভাবে, কোন সমাজ-রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে শক্তি অর্জন করে তা আধিপত্যকারী রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ হয়ে উঠল? সেই দিকে এবার তাকানো যাক।

তিন দফা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে (১৮২৪-১৮২৬-এ প্রথম যুদ্ধ যার মধ্য দিয়ে আরাকান ও সংলগ্ন অঞ্চল ইংরেজ শাসনে আসে, ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধ

যার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বামার বা বর্মী অঞ্চলে বর্মী রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে ইংরেজশাসন বিস্তৃত হয়, ১৮৮৫ সালে তৃতীয় যুদ্ধ যার মধ্য দিয়ে উত্তরের বাকি অংশেও ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হয়) ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা বর্মী রাজাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল। বর্মী রাজাদের আমলে রাজকীয় রাষ্ট্র ও বৌদ্ধ মঠগুলি ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। রাজা নিজেকে বৌদ্ধমঠের সেবক হিসাবে হাজির করতেন ও রাজার শাসনের পক্ষে লোকসমাজে যুক্তি-আবেগ-সমর্থন উৎপন্ন করতে বৌদ্ধমঠগুলি দ্বারা প্রচারিত ধর্মোপদেশ প্রধান ভূমিকা পালন করত। রাজার বা রাজপরিষদের নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণও করতেন বড়ো বড়ো মঠের প্রধান সন্ন্যাসীরা। এছাড়াও বৌদ্ধমঠগুলোই ছিল জনশিক্ষার মাধ্যম। সবে মিলে, বর্মী রাজত্বের প্রশাসনে রাজসভার সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে শুরু করে লোকপ্রশাসনের স্তর অবধি প্রতিটি স্তরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও তার ধর্মীয় সংগঠন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসন প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গড়ে তুলছিল তা রাজসভা থেকে লোকপ্রশাসনের স্তর অবধি বিস্তৃত এই বর্মী রাজকীয় প্রশাসনকে প্রতিস্থাপিত করেছিল ঔপনিবেশিক সেনা ও আমলাতন্ত্রের (কোথাও কোথাও কখনো কখনো খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের সহায়তা-সহযোগিতা সহ) ক্ষমতাকাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজরা যে 'ব্রিটিশ ট্রুপ' গড়ে তুলেছিল বর্মা শাসনের জন্য তাতে তারা সেনা হিসাবে শামিল করেছিল মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতির মানুষদের। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে, এই বাহিনীর সেনার ২৭.৮ শতাংশ ছিল কারেন জনজাতির, ২২.৬ শতাংশ ছিল চিন জনজাতির, ২২.৯ শতাংশ ছিল কাচিন জনজাতির, অথচ মাত্র ১২.৩ শতাংশ ছিল বামার/বর্মী। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে একেবারে ওপরের স্তরে ইংরেজরা থাকলেও পরবর্তী স্তরগুলো ভরানো হয়েছিল মূলত সাবেক ইংরেজ উপনিবেশ ভারতের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়ে এসে। অধীনস্থ উপনিবেশের ভূসম্পদ দোহন করার ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে নিয়ে চলার জন্যও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে তাদের সাবেক ভারতের উপনিবেশ থেকে নিয়ে এসেছিল রাস্তা গড়া, জঙ্গল কাটা, খনি খোঁড়া, তেল-খনি ও বন্দরে কাজ করা ইত্যাদির জন্য। রফতানির জন্য ধান উৎপাদন করার বাণিজ্যিক চাষে টেনে-আনা বিপুল সংখ্যক বর্মী কৃষকরাও ছিল চেট্টিয়ার (দক্ষিণ ভারতীয়) মহাজনদের ঋণপাশে বাঁধা। বামার/বর্মী সংখ্যাধিক্য কেন্দ্রীয় বর্মা অঞ্চলের মানুষদের কাছে এই ঔপনিবেশিক শাসন যে পরাধীনতা'-র

বোধ তৈরি করেছিল সেখানে এই 'পর' বা 'বিদেশি শাসক' হিসাবে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের শাসনের কুশীলব হিসাবে ভারতীয়দের ছবিও যুক্ত হয়ে গিয়েছিল; অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের অংশ হিসাবে ভারতীয়রা তাদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল। একইভাবে, ঔপনিবেশিক সেনা যখন বর্মীদের ইংরেজশাসন-বিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে ব্যবহৃত হতে লাগল (যার সব থেকে বড়ো উদাহরণ ১৯৩১ সালের বর্মী কৃষকদের অভ্যুত্থান, যা নৃশংসভাবে ঔপনিবেশিক সেনাকে দিয়ে দমন করা হয়) তখন কারেন, কাচিন জনজাতির লোকজন ঔপনিবেশিক দমনযন্ত্রের ফলা হিসাবে হাজির হয়ে জাতিবৈরিতার বীজ বুনে দেয়। চিন, কাচিন, কায়া জনজাতির বড়ো অংশ ইংরেজ শাসকদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়াও এই বৈরিতাকে উসকে দেয়।

বর্মীদের কাছে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের প্রশ্ন। উপনিবেশের দুর্ভোগের পূর্বের বর্মী রাজকীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠান যেহেতু সম্পৃক্ত ছিল এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধ ধর্মীয়প্রতিষ্ঠানের সমাজ-রাজনৈতিক প্রভাব খর্বিত করেছিল, তাই ঔপনিবেশিক শাসন-প্রশাসনের অবসান ঘটানোর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমাজ-রাজনৈতিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিদেশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাটাও বর্মীদের কাছে যুক্ত হয়ে ছিল বৌদ্ধ ধর্মাদেশ মান্য বর্মী শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, কারণ, বর্মী রাজত্বের আমলে শাসনের মান্যতা এভাবেই নির্ধারিত হত। ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দু'জন প্রখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভূমিকার জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন (উ ওট্টামা, ১৮৭৯-১৯৩৯) কারারুদ্ধ অবস্থাতেই মারা যান। এছাড়াও ১৯৩০-এর দশকের বিখ্যাত সায়া সান (Hsaya San) বিদ্রোহ, যা ইংরেজ শাসকরা ভারত থেকে অতিরিক্ত সেনা আমদানি করে তবে দমন করতে পেরেছিল, সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন একজন বৌদ্ধসাধক, ইংরেজদের হাতে যাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তি বর্মী লোককথার অংশ হয়ে গিয়েছে, বর্তমান মায়ানমারের মুদ্রায় তাঁর ছবি খোদিত থাকে। এছাড়াও, ইংরেজরা যখন বৌদ্ধমঠভিত্তিক সাবেক লোকশিক্ষার ব্যবস্থাকে রদ করে ইংরেজি ভাষামাধ্যমে স্কুল-কলেজ-কেন্দ্রিক শিক্ষা চালু করে, তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে বর্মী ভাষায় শিক্ষার পক্ষে যে সওয়াল করেন, তা জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শের কেলাসন ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

এইভাবে বর্মী জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শাসনের লজ্জা ঘুচিয়ে জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বর্মী-বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠার এবং বিদেশি শাসনের অনুষঙ্গে ভারতীয় ও সীমান্তবাসী জনজাতিদের যুক্ত করে তাদের প্রতি বৈরিতার উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে।

অতিকথার বাস্তবায়ন : ক্ষমতার ক্রমকেন্দ্রীভবন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বর্মায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও বর্মী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের রাষ্ট্রক্ষমতায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে একটি নির্ধারক বদল ঘটল—যে বর্মী জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ শাসক ও তার সরকার-প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-অসহযোগিতার সহযোগী ধারণা হিসাবে গড়ে উঠেছিল, তা এখন ঔপনিবেশিক শাসকদের ফেলে যাওয়া প্রশাসনিক কাঠামোকে ব্যবহার করেই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একটি জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার বীজমন্ত্র হয়ে উঠল। শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র একমাত্র বর্মী-বৌদ্ধ অভিভাবকত্বেই গড়ে উঠতে পারে এবং এই অভিভাবকত্ব একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধীশ্বর রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হতে পারে—রাষ্ট্র পরিচালনার এই ভাবনা ক্রমশ কীভাবে দানা বাঁধল দেখা যাক।

'স্বাধীনতা'-র প্রথম প্রহর

১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে সরকারিভাবে স্বাধীন বর্মা-র ঘোষণা হওয়ার আগেই ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে বর্মার বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে ভবিষ্যত স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো নির্ধারণের জন্য বর্মী জাতীয়তাবাদী নেতা আউঙ সান (বর্তমান নেত্রী আউঙ সান সু কি-র বাবা)-এর সভাপতিত্বে প্যাংলঙ-এ দুটি পরামর্শ-সভা হয়। সেই পরামর্শ-সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে বর্মার বিভিন্ন জনজাতির স্বেচ্ছামিলনের মধ্য দিয়ে নতুন দেশ গঠন ও ভবিষ্যতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে, শান ও কায়া জনজাতি যদি নতুন দেশ গঠনের দশ বছর পর এই দেশে তাদের অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয় এবং পৃথক হয়ে আলাদা দেশ গঠন করতে চায়, তাহলে তাদের সেই অধিকার থাকবে। কিন্তু এই প্রস্তাব কখনোই কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয় প্যাংলঙ কংগ্রেসের ৫ মাস পরেই বর্মী কট্টরপন্থীদের হাতে আউঙ সান ও তাঁর সরকারের কিছু ক্যাবিনেট সদস্য খুন হন ও নতুন নেতৃত্ব

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করে সমস্ত জনজাতির উপর বাধ্যতামূলক মিলন ও বর্মী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অভিভাবকত্ব স্বীকারের আবশ্যিকতা চাপিয়ে দেয়। এর ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে বর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বর্মী সরকারের বিরুদ্ধে স্বশাসন বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে কারেন, মোন, কাচিন, শান পা-ও, পালুয়াং ও রাখাইন জনজাতিদের নিজস্ব নিজস্ব বাহিনী। বহু ক্ষেত্রে নিজেদের অঞ্চলে তারা বর্মী সরকার-প্রশাসনের নাগালের বাইরে 'মুক্তাঞ্চল' বা নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়ে তোলে। কারেনদের সশস্ত্র বাহিনী 'কারেন ন্যাশনাল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন' তার প্রভাবের অঞ্চল বিস্তৃত করতে করতে তৎকালীন রাজধানী রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল ১৯৬১ সাল নাগাদ। বিভিন্ন অ-বর্মী জনজাতিগোষ্ঠীর নেতারা ১৯৬১ সালে মিলিত হয় ও অনেকে বর্মী-আধিপত্যের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্রের বদলে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রাষ্ট্রগঠনের দাবি তোলে, শান ও কায়া জনজাতির প্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এইসব মিলে বর্মা রাষ্ট্রের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে।

সেনা শাসনের প্রথম দফা

এই প্রতিক্রিয়া ও সংকটের মুখে বর্মী জাতীয়তাবাদের আরও কট্টর অংশ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এই কট্টর অংশ হল বর্মী সেনা বা তৎমাদও। এই তৎমাদও বা বর্মী সেনার জন্ম ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী বর্মী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিতরে ১৯৪২ নাগাদ। সেই সময় তৎমাও নিজেকে 'জনগণের সেবক' হিসাবে হাজির করত, স্বাধীন বর্মায় তা রাষ্ট্রীয় বর্মী সেনার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠে ক্রমশ নিজেকে 'জনগণের অভিভাবক/পথপ্রদর্শক' হিসাবে নিজের ভূমিকা জাহির করল। দেশের ঐক্য, সংহতি ও সুস্থিতি কেবলমাত্র তাদের তত্ত্বাবধানেই নিরাপদ, বর্মী-বৌদ্ধ সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশ কেবলমাত্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই—সম্ভব নিজের যোগ্যতা ও অপর সবের অযোগ্যতা সম্পর্কে এই বোধই তার চালিকাশক্তি।

১৯৬১-৬২-র সংকটমুহূর্তে বর্মী সেনাবাহিনী বা তৎমাদও দেশের পার্লামেন্টারি সরকারের পতন ঘটিয়ে সেনা-শাসন জারি করল। জেনারেল নে উইন-এর নেতৃত্বাধীন 'বিপ্লবী পরিষদ' (রিভলুশনারি কাউন্সিল) সেনা-নিয়ন্ত্রিত

একটি এক-পার্টি ব্যবস্থা চালু করল। সেই একক সেনা-নিয়ন্ত্রিত পার্টি, বর্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি, ক্ষমতায় উত্থানের পর পরই সমস্ত জনজাতিগোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানাল রাজধানী ইয়াঙ্গনে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে। সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বেশির ভাগ জনজাতিগোষ্ঠীর বিদ্রোহীরাই কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে পারল না। সরকারের পক্ষ থেকে বিকেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কিছু অকার্যকর প্রতিশ্রুতি, সরকারপক্ষে যোগ দেওয়া কিছু জনজাতির নেতাদের সরকারি উচ্চপদে বসিয়ে প্রলোভনের টোপ সাজানো ও অন্যদিকে নির্মমভাবে 'অসহযোগী' জনজাতিদের দমন—এর কোনোটাই স্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিদার জনজাতিদের কণ্ঠরোধ করতে পারল না। জনজাতিদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ চলতেই থাকল।

নে উইন পরিচালিত সেনা-সরকারের অধীনে বর্মার রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের ঝোঁক আরও তীব্র হয়। সেই ঝোঁক বর্মী-বৌদ্ধ 'গরিমা' পুনরুদ্ধার ও 'সমাজতন্ত্রমুখী যাত্রা'-র মিশেলে রঞ্জিত পোশাকে উপস্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালেই একদিকে ইংরেজি ভাষাকে 'অবক্ষয়ী ও অধঃপতিত সংস্কৃতি'-র প্রতিনিধি হিসাবে বর্জন করে সর্বস্তরে বর্মী ভাষা গ্রহণের লক্ষ্য ঘোষিত হয় আর অন্যদিকে, 'সমাজতন্ত্র অভিমুখে বর্মী পথ' হিসাবে দেশের সমস্ত ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের উপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কায়েমের লক্ষ্য ঘোষিত হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণকামী জনজাতিদের বিক্ষোভ এই দুইয়ের ফলেই আরও বৃদ্ধি পায়। জনজাতিদের নিজেদের মাতৃভাষাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বর্মী ভাষাকে সরকার-প্রশাসন-শিক্ষাব্যবস্থার স্তরে চাপিয়ে দেওয়াকে বর্মী আগ্রাসনেরই আর একটি রূপ হিসাবে জনজাতিরা দেখে। আর জনজাতিদের প্রথাগত জীবনাচার ও জীবনধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত জঙ্গল, কৃষিজমি, পশুচারণভূমি, খনিজভাণ্ডার, যেগুলোর উপর তাদের যৌথ অধিকার বা কৌমগত অধিকার দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত, বৈরী রাষ্ট্র যেভাবে সেসব নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাদের অধিকারহীন করে দিতে চাইছে, তা তাদের কাছে সর্বস্ব হারানোর শামিল হয়ে উঠেছিল।

সেনা শাসনের প্রধান জেনারেল নে উইন ঘোষণা করেন যে 'বৌদ্ধ বর্মী'-রাই দেশের 'প্রকৃত মালিক' এবং অপরাপর সবাইকে তাদের 'অধীনস্থ' হয়ে থাকতে হবে। দেশজুড়ে তিনি 'বর্মীকরণ' বা 'ইরাবতীকরণ'-এর প্রক্রিয়া চালু করেন যার অংশ ছিল—অ-বর্মী জনজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব অঞ্চলে সেখানে প্রশাসনিক পদে বর্মী আধিকারিক নিয়োগ, সেইসব অঞ্চলের স্কুলে বর্মী ভাষাশিক্ষা ও বর্মী ভাষামাধ্যমে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, বিদ্রোহীগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে হিংস্র সামরিক

অভিযান চালানো, বর্মী সেনার সদস্যদের সঙ্গে অ-বর্মী জনজাতির মেয়েদের জোর করে বিয়ে দেওয়া। অ-বর্মী জনজাতির মানুষদের কেবল অধিকারহীন করা নয়, তাদের স্বপরিচয়কেই ধ্বংস করার এক উদগ্র অভিযানকে বল্গাহীন করেন নে উইন।

এই পর্যায়েই ১৯৭৭ সালে সেনাশাসকদের পক্ষ থেকে 'অপারেশন নাগামিন' (ড্রাগন রাজা অভিযান) শুরু করা হয় যার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল জনগণের মধ্যে মিশে থাকা 'বিদেশিদের' চিহ্নিত করা। এর আগেই ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে 'ভারতীয়'-দের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছিল। দাঙ্গা-আক্রমণ-হেনস্থার মধ্য দিয়ে গত শতক জুড়ে বর্মায় এসে স্থায়ী বসবাস করতে শুরু করা ভারতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠকে বাধ্য করা হয়েছিল বর্মা ছাড়তে। এখন 'ড্রাগন-রাজা-অভিযান'-এ আরাকান (এখনকার রাখাইন) প্রদেশের রোহিঙ্গাদের উপর নেমে এল সেনা আক্রমণ। শতকের পর শতক ধরে এই অঞ্চলের অধিবাসী যারা, সেই রোহিঙ্গাদের 'বিদেশি' বলা হল এই গা-জোয়ারি যুক্তিতে যে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা 'বর্মা'-র 'দেশজ' হতে পারে না। বর্মী সেনা রোহিঙ্গাদের গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে উৎখাত-উৎপাত চালায়। এর ফলে দুই লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা ভিটেমাটি ছেড়ে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এক বছর পর ১৯৭৮-এ জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বেশির ভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী আবার আরাকানে ফিরে যায়। এর চার বছর পর ১৯৮২-তে নে উইন নেতৃত্বাধীন সেনা সরকার দেশের নাগরিক আইনের বদল করে পুরোনো নাগরিক পরিচয়পত্র বাতিল করে নতুন নাগরিক পরিচয়পত্র চালুর কথা ঘোষণা করে। রোহিঙ্গাদের বলা হয় যে তাদের এই নতুন নাগরিক পরিচয়পত্র পেতে হলে এমন প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যে ১৮২৩ সালের আগে তাদের কোনো পূর্বপুরুষ এই দেশে বাসিন্দা ছিল। ১৬০ বছর আগের প্রামাণ্য নথিপত্র সরকারি মহাফেজখানাতেই বিরল, তো, গ্রামের কৃষিজীবী রোহিঙ্গাদের কাছে তা যে থাকবে না তা জানা কথা। এই কৌশলেই রোহিঙ্গাদের নাগরিক পরিচয়পত্র দেওয়া হল না—তাদের নাগরিক পরিচয়টিই কেড়ে নেওয়া হল।

কেবল আরাকানের রোহিঙ্গা নয়, দেশজুড়ে অন্যত্রও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর 'নাগরিক' পরিচয় কেড়ে নেওয়ার এই আক্রমণ জারি হল। যে কোনো মুসলমানের (সেনার উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে বিশেষ খাতির বা সেনা আধিকারিকদের বিশেষ নজরানা দিয়ে তুষ্ট করার ক্ষমতা না থাকলে) পরিচয়পত্রে 'জাতীয়তা'-র জায়গায় কেবল 'বর্মী' না রেখে তার সঙ্গে একই সঙ্গে 'পাকিস্তানি', 'বাংলাদেশি' বা 'ভারতীয়' লেখা চালু করা হল যাতে মুসলমানরা দেশের 'পূর্ণ নাগরিক' না হতে পারে।

অ-বর্মী মানুষদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষাকে হিংস্রভাবে দমন করে রাষ্ট্রক্ষমতার যে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবন ঘটছিল, বর্মী-প্রধান কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তার ফাঁস ক্রমশ চেপে বসছিল। যেমন ধরা যাক, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বড়ো শহর ও শহরতলির শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কথা। তাদের কেবলমাত্র সরকার অনুমোদিত ও সরকারপন্থী 'শ্রমিক এসিয়েওন' (এসিয়েওন—সংগঠনী কমিটি)-এর সদস্য হওয়ারই অধিকার ছিল, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা কারখানাভিত্তিক শাখাগুলোর 'প্রধান' শ্রমিকরাই হতে পারতেন। ১৯৭৬ সালে সরকারের কিছু নীতির বিরুদ্ধে রাজধানীতে প্রথম বড়ো শ্রমিক বিক্ষোভ হওয়ার পর সরকার শ্রমিকদের 'শিক্ষা দিতে' তারপর থেকে 'শ্রমিক এসিয়েওন'-এর শাখার 'প্রধান' বা 'পরিচালক' হিসাবে ম্যানেজার বা ইঞ্জিনিয়ারদের নিযুক্ত করতে থাকেন, শ্রমিকদের সংগঠনের প্রধান হওয়ার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ যে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাদের উপরও নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়, সরকারপন্থী বৌদ্ধসঙ্ঘ সংগঠন গড়ে তুলে তার হাতে সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ভার তুলে দেওয়া হয়। অন্য মতের বা অন্য পথের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কড়া হাতে দমন করা হয় সরকারপন্থী সঙ্ঘ ও সরকার উভয় পক্ষ থেকেই।

রাষ্ট্রক্ষমতার ক্রম-কেন্দ্রীভবনের প্রবণতাকে তীব্রতর করে অপরাপর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের পাকে জড়িয়ে যাওয়া সেনা-সরকারের শাসন আবার তীব্র সংকটে বেসামাল হয়ে পড়ে ১৯৮৮ সালে দেশজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতার আঘাতে। ১৯৮৮ সালের শুরু থেকেই দেশজুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তুঙ্গমুহূর্ত হাজির হয় আগস্ট মাসে যখন গণতন্ত্রের দাবিতে সরকারবিরোধী ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভ (যা তার ঘটার দিনের অনুষঙ্গে '৮-৮-৮৮' আন্দোলন হিসাবে বিখ্যাত) রাজধানীকে বারুদের স্তূপের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সংকট সামলানোর জন্য জেনারেল নে উইনকে পদত্যাগ করিয়ে সেনার মধ্য থেকেই নতুন নেতৃত্ব ও একটি 'পরিবর্তিত' শাসনব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসা হয়।

সেনা শাসনের দ্বিতীয় দফা

'পরিবর্তিত' শাসনব্যবস্থায় সেনা-শাসনের শীর্ষক্ষমতাধারী কমিটি হিসাবে সেনার শীর্ষকর্তাদের একটি পরিষদ গড়ে তোলা হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'স্টেট ল অ্যান্ড অর্ডার রিস্টোরেশন কাউন্সিল' বা 'এসএলওআরসি' (আইন ও শৃঙ্খলা

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয়পরিষদ)। নাম থেকেই বোঝা যায় যে সেনাকর্তারা সমস্যাটিকে যে চোখে দেখেছিলেন তাতে বিভিন্ন অ-বর্মী জনজাতি সহ অপরাপর জনগোষ্ঠীর অধিকার-রক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের লড়াইগুলোকে বেআইনি কার্যকলাপ বা বিশৃঙ্খলা হিসাবেই দেখেছিলেন, ফলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে আরও জোরদার করে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ফলে ১৯৯০ সালে সাধারণ নির্বাচন করতে দিতে তারা বাধ্য হলেও এবং সেই নির্বাচনে তাদের পৃষ্ঠপোষিত পার্টিকে বিপুলভাবে হারিয়ে তাদের বিরোধী গণতান্ত্রিক সংস্কারের কথা বলা আউঙ সান সু কি-র নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক জোট বিজয়ী হলেও, সেনাধিপতিরা (এসএলআরওসি) সরাসরি সেই নির্বাচনের রায় খারিজ করে দিয়ে, গণতান্ত্রিক জোটের নেতা-নেত্রী-কর্মীদের গ্রেফতার করে, সন্ত্রাস জারি করে, অবাধ্য অবুঝ জনগণকে বুঝ মানানোর ভঙ্গিতে অভিভাবকের গলায় বলেন, 'আমরাও গণতন্ত্র চাই, তবে বিশৃঙ্খলার গণতন্ত্র নয়, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার গণতন্ত্র।'

এই 'শৃঙ্খলা ফেরানো'-র লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার মাথায় জেঁকে বসে সেনা শাসকরা এই সময় অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে একটি ভোলবদল আনেন। 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা চালিত' তথাকথিত 'বর্মী সমাজতন্ত্রী' পথের বদলে তারা 'খোলা বাজার অর্থনীতির' প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যিকীকরণ চালিত 'পুঁজিবাদী বিকাশ'-এর পথ গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। আগের সেনা-সরকারের লাগু করা আইন-কানুন বদলে নতুন আইন-কানুন লাগু করে বড়ো বড়ো বহুজাতিক কোম্পানিদের কাছে বর্মার ভূপ্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, জ্বালানি গ্যাস, খনিজ, বার্মাটিক গাছ, বহুমূল্য পাথর, উপকূলবর্তী উর্বর জমি) বাণিজ্যিকীকরণ, পণ্য হিসাবে উৎপাদন ও অবাধ রফতানির জন্য খুলে দেওয়া হয়। ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত নিষ্কাশন, পণ্য-উৎপাদন ও দ্রুত রফতানির জন্য দেশের সমস্ত অঞ্চলের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রয়োজনীয়তা আরও আশু জরুরি হয়ে ওঠে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনজাতিদের সশস্ত্র বাহিনীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সেনা অভিযান আরও তীব্র ও হিংস্র করা হয়। অন্যদিকে, পুরোপুরি যাদের নিশ্চিহ্ন করা যাচ্ছে না সেই বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে নানা ধরনের 'অস্ত্র বিরতি চুক্তি' করার চেষ্টা করা হয়। এই অস্ত্র বিরতি চুক্তির মাধ্যমে সেই বাহিনীর নেতাদের জোড়া প্রলোভন—অর্থাৎ, প্রভাবাধীন অঞ্চলের মানুষজনকে আইনের শাসনে রাখার ও অঞ্চলের জঙ্গলের গাছ, খনিজ, মূল্যবান পাথর, তেল বা গ্যাস-এর বাণিজ্যিকীকরণ ও রফতানির লভ্যাংশের একটা কমিশন পাওয়ার লোভ দেখিয়ে সেনা-সরকার-এর সহযোগীতে পরিণত করতে চাওয়া হয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭-

এর মধ্যে এমন ১৭টি 'অস্ত্রবিরতি চুক্তি' সই হয়, এর ফলে চুক্তিবদ্ধ বাহিনী-নেতারা ক্রমে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সেনা-সরকারের দক্ষিণ হস্তে পরিণত হয়, সেনা-সরকার বিরোধী বাহিনীগুলোও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ ছেড়ে নিজ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে 'আইনশৃঙ্খলা' রক্ষা, ভূসম্পদ বেচা ও অন্য ব্যবসাবাণিজ্যের কমিশন আদায়ের কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; পুরানো লড়াইয়ের পথে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতাতেই ২০০৯ সালে যখন সেনা-সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনজাতিদের সমস্ত বাহিনীগুলোকে বর্মী সেনা আধিকারিকদের নেতৃত্ব-নিয়ন্ত্রণে এনে বর্মী বাহিনীরই অংশ করে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তখন সেই সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা বেশিরভাগ বাহিনীরই আর ছিল না। এর মধ্য দিয়ে এই বাহিনী ও তার নেতারা তাদের অঞ্চলের জনজাতির মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ক্রমশ, জনপ্রিয়তা হারাতে হারাতে এখন তারা সাধারণের চোখে 'সরকারের চামচা, কমিশনে পকেট ভরানো ধান্দাবাজ' ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব চামচা-ধান্দাবাজদের হাতে কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে, এদেরকে দিয়েই 'পার্টি' গড়ে তুলে ২০১০-এর সাধারণ নির্বাচনে লড়িয়ে দিয়ে সেনা সরকার 'ক্ষমতা বিতরণ' (devolution) হচ্ছে বলে প্রচারের বাদ্যি বাজিয়েছে, আসলে এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রের প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়ছে বই কমছে না।

জনজাতির মানুষদেরও অধিকারহীনতা ও অধীনতা বাড়ছে বই কমছে না। কারণ, একদিকে তো তাদের জনপদের সমস্ত ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের যৌথ বা কৌম-ভিত্তিক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ ধ্বংস হয়ে বাণিজ্যিকীকরণের হররা উঠছে, আর অন্যদিকে, তীব্রতর হচ্ছে 'বর্মীকরণ' বা 'ইরাবতীকরণ'-এর হামলা। সর্বপ্রাণবাদী বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জনজাতিদের এলাকায় এসএলওআরসি-র প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এমন সব স্কুল খোলা হচ্ছে যারা দরিদ্র পরিবারের ছাত্রদের জোর করে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করছে। ওইসব এলাকায় এসএলওআরসি-র তত্ত্বাবধানে অগুনতি 'গণধর্মান্তরকরণের কর্মসূচি' নেওয়া হয়েছে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে তবেই নতুন নাগরিক পরিচয়পত্র দেওয়া হবে আর না হলে দেওয়া হবে না, এই ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ করা হয়েছে। 'আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার' জন্য সেনা অভিযানে গির্জা, ক্রস ও অন্যান্য খ্রিস্টীয় ধর্মীয় প্রতীক বা প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্বতন আরাকান, নতুন নামকরণ হওয়া রাখাইন প্রদেশে ১৯৯১ সালে মায়ানমার (পূর্বতন বর্মা, নতুন নামকরণ হওয়া) সেনা 'আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার্থে'

অভিযান চালায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বনের 'অপরাধ'-এ রোহিঙ্গাদের গ্রামে গ্রামে ঢুকে গ্রেফতার, নারীধর্ষণ, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়া; মাঠের ফসল কেটে নিয়ে চলে যাওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়ার 'দণ্ডপ্রদান' চালাতে থাকে। ২ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা আবার তাদের ভিটে-মাটি-দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭-এর মধ্যে জাতিসংঘের পুনর্বার মধ্যস্থতায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা আবার ফিরে আসে।

গোটা মায়ানমার জুড়েই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সরকারি প্রভেদীকরণ ও নাগরিক অধিকার হরণ বাড়তে থাকে।

'আইনশৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীভবনের একটি বিশেষ উদাহরণ হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর রাষ্ট্রের 'শৃঙ্খলারক্ষা' অভিযান। আমরা দেখেছি যে বর্মী জাতীয়তাবাদ বর্মী ও বৌদ্ধ এই দুই পরিচিতিকে একত্বে পরিগণিত করে। বর্মী রাষ্ট্র বর্মী-বৌদ্ধ ভাবাদর্শকে তার আধিপত্যের যৌক্তিকতা উৎপাদনে ব্যবহার করে। বড়ো বড়ো বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়। এর কোনো ব্যত্যয় হয়নি। এস এল আর ও সি জমানাতেও সেনার ওপরমহল ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ওপরমহল পরস্পর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা বজায় রেখেছে। কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এই সময়ে অভূতপূর্বভাবে সর্বময় হয়ে উঠেছে। সাধারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সরকারের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা বা বিরোধিতায় লিপ্ত না হওয়ার ফরমান ও তা রক্ষার্থে সরকার ও সরকারপন্থী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নজরদারি নে উইন-এর আমলেই শুরু হয়। এসএলওআরসি-জমানায় সরকারের সমালোচনা বা সরকারবিরোধী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার জন্য বহু সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করা হয়, শাস্তিমূলক শ্রমশিবির (লেবার ক্যাম্প)-এ পাঠানো হয়, এমনকী গুলি করে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্রের সঙ্গে মায়ানমারের জনগোষ্ঠীর বিবিধ দ্বন্দ্বের সঙ্গে সাধারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই দ্বন্দ্ব মিলিত হয়ে বিস্ফোরক চেহারা নেয় ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন মায়ানমারের রাজধানীর রাস্তা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সাধারণ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে সেনা-সরকারবিরোধী বিক্ষোভে। নৃশংস হিংস্রতায় মায়ানমার সেনা এই বিক্ষোভকে দমন করলেও ক্ষোভ-অস্থিরতার কম্পন যে সমাজদেহ থেকে দূর হয়নি তা বুঝতে হয়ত 'আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী'-দের ভুল হয়নি। তাই, নিপীড়ন, দমন ও রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের সমস্ত প্রক্রিয়া জারি রেখেও পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টায় আর একটি ভোলবদল তাঁদের পক্ষে দরকার হয়ে পড়ল। তাঁরা তাঁদের শাসনকেন্দ্র এসএলওআরসি-র নাম বদল করে বেশ একটা

'শান্তি-শান্তি'-মার্কা নাম নিয়েছেন—'স্টেট পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' বা এসপিডিসি ('শান্তি ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদ') এবং ২০১০ সালে ২০ বছর পরে আবার 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' করিয়ে নির্বাচিতের হাতে রাষ্ট্রচালনার ভার অর্পণ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছেন।

হাতে অস্ত্র, মুখে শান্তিমন্ত্র, বুকে দ্বেষ : লক্ষ্য নাকি গণতন্ত্র?

আউঙ সান সু কি—১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেনা-শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক জোটের নেত্রী হিসাবে বর্মার জনগণের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন, তারপর থেকে বেশির ভাগ সময়টাই সেনাদের হাতে বন্দি বা গৃহবন্দি থেকেছেন, নোবেল পুরস্কার তাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি দিয়েছে—তিনি বর্মা/মায়ানমার সেনা শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের সুখ্যাত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ২০১০ সালে নির্বাচনের প্রাকপর্বে সেনা-শাসক ও সু কি-র মধ্যে অসেতুসম্ভবতার বরফ যেন গলতে আরম্ভ করল। সু কি ঘোষণা করলেন যে আমেরিকা ও অন্যান্য বৃহৎ পশ্চিমী দেশ যাতে মায়ানমারের উপর চাপানো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (economic sanctions) প্রত্যাহার করে তার জন্য তিনি মায়ানমার রাষ্ট্রের হয়ে দৌত্য করতে রাজি আছেন। তার পরপরই সেনা শাসকদের সঙ্গে সু কি-র কয়েকটি বৈঠকও ঘটতে দেখা গেল। প্রবীণ সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকের যে ছবি প্রচারিত হল তাতে দেখা গেল প্রবীণ অভিভাবকের মতো সেনাপ্রধান/রাষ্ট্রপ্রধান সু কি-র সঙ্গে 'স্নেহশীল' আচরণ করছেন। ২০১০-এর নির্বাচনে সেনা-সরকারের (এসপিডিসি)-র চাপানো শর্ত মানতে রাজি না হওয়ায় সু কি-র দল (ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও নির্বাচনের পর দেখা গেল যে সু কি-কে নবগঠিত সরকারের অংশ করে নেওয়া হয়েছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে, ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার ওই 'একফোঁটা চোনা'-র পাশাপাশি বাকিটাকে বেশ 'দুধ-দুধ' বলেই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি বা অবশেষে মায়ানমারের গণতন্ত্রাভিমুখী যাত্রা শুরু হল। নতুন সরকারকে ২০০৮ সালে এসপিডিসি-র তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত হওয়া যে সংবিধান মেনে চলতে হবে, সেখানে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ সেনার হাতেই রাখা হয়েছে, সরকারে অনির্বাচিত সেনার নিয়োগ করা প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রক উপস্থিতি আইনবলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, এতদিন ধরে শিলীভূত হওয়া রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপ বহাল রাখা হয়েছে—হ্যাঁ, এগুলো 'গণতন্ত্র'-এর

বিপরীতমুখী বটে; তা সত্ত্বেও সু কি ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের উপস্থিতি কি 'গণতন্ত্র' অভিমুখে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অভিমুখে কিছু গতির জন্ম দেবে না, সে গতি কি ক্রমশ আরও বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে না?

এক বছরের মধ্যেই, ২০১২ সালেই, এই আশাবাদ ধাক্কা খায় রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমণের ঘটনা ও আবার রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া হতে বাধ্য করার ঘটনা সামনে আসার মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে একের পর এক যেসব ঘটনা দেখা যাচ্ছে তা এই আশাবাদকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছে। তা দেখায় যে বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শকে ক্রমশ আরও অপর-দ্বেষী করে তুলে ও সেই যৌক্তিকতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতাকে চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত রূপ দিয়ে যে নিপীড়ক কাঠামো গড়ে উঠেছে, সু কি-র মতো 'গণতন্ত্রী'-রা শুধু যে তার মধ্যে 'অসহায়', তা নয়, তারা বিরোধিতা না করার মধ্য দিয়ে এই উগ্র অপর-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদ ও অপরের অধিকার হরণের প্রক্রিয়াকে সমর্থনই করে যাচ্ছেন। আর এই অক্ষম-অযোগ্য 'গণতন্ত্রীদের' নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষাপটে উগ্র অপরবিদ্বেষী জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানও শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে। যে ঘটনাবলী থেকে এই ইঙ্গিত ঘনিয়ে উঠছে সেই দিকে এবার তাকানো যাক।

এসএলওআরসি/এসপিডিসি-র মদতে একটি উগ্র অপর-বিদ্বেষী বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উত্থান ঘটেছে, তার নাম 'মা বা থা'। এই সংগঠন এখন মায়ানমারের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে তার উপস্থিতি জাহির করছে। সরকার-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা তার পিছনে রয়েছে। অ-বর্মী অ-বৌদ্ধ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালানো (কখনও 'পশু হত্যা', 'গো হত্যা' বন্ধ করার নাম করে তাদের খাদ্যাভ্যাসকে 'অপরাধ' বলে তুলে ধরে; কখনও তাদের নিজেদের লোকাচার, লোকধর্ম পালনকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করে), জোর করে ধর্মান্তরকরণ করে বৌদ্ধ হতে বাধ্য করা, তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে বা জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের নিজেদের মাতৃভাষার বদলে বর্মী ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করে তথাকথিত 'বর্মী-বৌদ্ধ শুদ্ধ জীবনাচার' প্রতিষ্ঠার অভিযান তারা দাপিয়ে চালাচ্ছে। এই 'মা বা থা' সংগঠনই রাখাইন প্রদেশে রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যে একটা অংশকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত করতে সংগঠিত করেছে। এদের উসকানিতেই ২০১২ সালে রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা ও রাখাইনদের মধ্যে দাঙ্গা লাগে। সেই দাঙ্গায় ১০০ জনের প্রাণহানি হয়, যার মধ্যে প্রায় সবাই রোহিঙ্গা। এই দাঙ্গা ও তার রেশ টেনে মায়ানমার সেনা ও উগ্র অপর বিদ্বেষী কিছু রাখাইনদের যৌথ হামলার মুখে হাজার হাজার রোহিঙ্গা ভিটে-মাটি-

দেশ ছেড়ে আবার বাংলাদেশে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে, গ্রাম ধ্বংস করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে কিছু 'ক্যাম্প'-এ ঠেসে বন্দি করা হয়। এই ক্যাম্পগুলো এক একটি বন্দি শিবির। এর চারদিকে পাহারা দিচ্ছে মায়ানমার সেনা ও উগ্র রোহিঙ্গা-বিদ্বেষী কিছু রাখাইন। এদের অনুমতি ছাড়া রোহিঙ্গাদের এই ক্যাম্পের বাইরে বের হওয়ার অধিকার নেই। ফলে, ক্যাম্পের রোহিঙ্গারা হারিয়েছে জীবিকা উপার্জনের অধিকার, শিশু-কিশোররা হারিয়েছে শিক্ষালাভের অধিকার, অসুস্থরা হারিয়েছে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার অধিকার। রোহিঙ্গাদের উৎখাত করে ফাঁকা করা গ্রামে রাখাইন বা বর্মীদের জমি-জিরেত দিয়ে বাস-স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে সরকার-প্রশাসন ও মা বা থা থেকে, যাতে অঞ্চলের জনবিন্যাস স্থায়ীভাবে পাল্টে দেওয়া যায়।

২০১২ সালের এই আক্রমণ কেবল রাখাইন প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়ছে মায়ানমারের অন্যান্য প্রদেশেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসা-দ্বেষ-এর বাতাবরণ তৈরি করার মধ্য দিয়ে। মায়ানমার জুড়েই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রেওয়াজ চলছে বহুদিন, এখন বিভিন্ন গ্রামে বিদ্বেষপন্থীরা নিজেদের সংগঠিত করে এক একটি গ্রামকে 'মুসলিম-মুক্ত' বলে ঘোষণা করছে। ২০১২ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে ২১টি গ্রাম এমনভাবে নিজেদের 'মুসলিম-মুক্ত' বলে ঘোষণা করেছে। এইসব গ্রামের প্রবেশপথের ধারে বর্মী ভাষায় লেখা বোর্ড খাড়া করে দেওয়া হয়েছে সরকার-প্রশাসনের আনুকূল্যে। সেই বোর্ডে লেখা থাকছে যে, ওই গ্রামে বসত করা দূরের কথা, এক রাত অবধি কাটাতে পারবে না ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা, তারা সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক (বিয়ে) স্থাপন করতে পারবে না, তারা কোনো বাণিজ্যিক লেনদেনও করতে পারবে না। অনেক জায়গায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রবেশ করলে আক্রান্ত হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য গ্রাম ও শহরেও মা বা থা মুসলমান-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। মুসলমান ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ডাক দিয়ে, মুসলমান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সামাজিকভাবে বয়কট করার ডাক দিয়ে প্রকাশ্যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'হিংস্র', 'সন্ত্রাসী', 'দেশের শত্রু' বলে তাদের লাগাতার অপপ্রচার সরকার-প্রশাসনের সমর্থনে পুষ্ট হচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০১৫-র মধ্যে রাখাইন প্রদেশের বাইরে অন্তত ২৫টি শহরাঞ্চলে এর ফলে মুসলমান বিরোধী হিংস্র কার্যকলাপ সংগঠিত রূপে ঘটেছে। এমনই এক

ঘটনায় ২০১৩ সালের মার্চে মেইখতিলা শহরে ৪৪ জন মারা যায় ও ১২,০০০ মুসলমান অধিবাসী শহরের বাস ছেড়ে শহরের বাইরে আশ্রয়-শিবিরে স্থান নিতে বাধ্য হয়। তিনদিন ধরে উগ্র বিদ্বেষী বর্মী-বৌদ্ধদের হামলা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অবশেষে চতুর্থদিন সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে, যখন হামলাকারীদের যা করার তা করা হয়ে গিয়েছে। ২০১৩ ও ২০১৪ জুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের ওপর এমন হিংসাত্মক হামলা মায়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্ডালেতে বারবার ঘটে। ২০১৫ সালে কিছুটা বিরামের পর ২০১৬ সালে আবার এমন ঘটনাবলী বাড়তে থাকে কাচিন প্রদেশে উগ্র বিদ্বেষী বৌদ্ধদের হাতে একটি মসজিদ ধ্বংস ও অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর। সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকার-প্রশাসন হামলাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও আক্রান্ত মুসলমানদের উপরই সমস্ত দোষ চাপানোর কাজ করে গেছে।

২০১২ সালের পরই কিছু রোহিঙ্গা যুবক-যুবতী পালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে ও উগ্র বিদ্বেষী বর্মী-বৌদ্ধ হামলাকে প্রতিরোধ করা ও রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার হাসিল করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' বা 'আরসা' (আরাকান রোহিঙ্গাদের উদ্ধারবাহিনী) গড়ে ওঠে। ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর ও ৪ নভেম্বর তারা রাখাইন প্রদেশের উত্তরে কিছু পুলিশচৌকির ওপর হামলা চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মায়ানমারের সেনা রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে আবালবৃদ্ধবনিতাকে খুন, ধর্ষণ, বাকিদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার লাগাতার সন্ত্রাস জারি করে। প্রাণ বাঁচাতে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মীয়-স্বজন হারানো রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ-শিশু চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নাফ নদী পেরিয়ে বা সমুদ্রপথে ডিঙায় ভেসে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিতে শুরু করে। প্রায় ৬ লাখ শরণার্থী সর্বস্ব খুইয়ে এভাবে বাংলাদেশে এসে টেকনাফে বা কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। সেনা অভিযানের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত করে তাদের গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাদের ভিটে-মাটি, যাতে ফিরে গেলেও আর তাদের সেখানে বসতবাঁধা সম্ভব না হয়।

রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো খালি করার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ওই এলাকার মাটির নীচে থাকা বিপুল পরিমাণ তেল ও জ্বালানি গ্যাস নিষ্কাষণ ও চীনে রফতানির তোড়জোড়। রাখাইন প্রদেশের রাজধানী সিটওয়েতে একদিকে গড়ে উঠছে রোহিঙ্গাদের পশুর মতো গাদাগাদি করে বন্দি রাখার জন্য সরকারি বন্দিশিবির, আর অন্যদিকে, চলছে সিটওয়ে থেকে চীনে গ্যাস ও তেল চালান করার জন্য

মায়ানমারের মধ্য দিয়ে পাইপলাইন তৈরি করতে চীনা ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃত্বে কাজ। উগ্র বর্মী-বৌদ্ধ রাখাইন নেতাদেরও সেখানে কমিশনের বন্দোবস্ত হয়েছে।

মায়ানমার সেনা ও উগ্র বিদ্বেষী বর্মী-বৌদ্ধ-দের এই কার্যকলাপে সু কি 'অগণতান্ত্রিক' কিছু খুঁজে পাননি; কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে বসে থাকা সেনাপ্রধানদের স্বরই আজ তাঁর গলাতেও বাজছে। তিনি সেনা ও জাতিবিদ্বেষীদের মানবতার প্রতি অপরাধকে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবেই দেখার চোখ তৈরি করে ফেলেছেন!

আর মায়ানমারে আজ কেবল রোহিঙ্গারা নয়, কেবল ইসলাম-ধর্মাবলম্বীরা বা কেবল অ-বর্মী অ-বৌদ্ধ জনজাতির মানুষদের অস্তিত্বই অধিকারহীনতায় বিপন্ন নয়, বিপন্ন মায়ানমারের সমগ্র ভূ-প্রকৃতি। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজিবাদী বিকাশের মন্ত্র জপ করতে করতে যেভাবে গোটা মায়ানমারের ভূসম্পদকে নিলামে তুলে দ্রুত বিক্রিবাটা সেরে ফেলতে চাইছে, সেই লুণ্ঠনের চাপ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে স্বয়ং ভূপ্রকৃতিকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ১৯৯০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে মায়ানমারের মোট জঙ্গল এলাকার ১৯ শতাংশ (অর্থাৎ ৭৪,৪৫,০০ হেক্টর) জঙ্গলহীন বৃক্ষহীন হয়ে গেছে। ১৯২৪ থেকে ১৯৯৯—এই ৭৫ বছরে ইরাবতীর মোহনার ব-দ্বীপ অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ৮২.৭৬ শতাংশ কমে গেছে। বাণিজ্যিকীকরণ ও রফতানির উর্ধ্বশ্বাস অভিযানই এর কারণ। এই মানবিক-প্রাকৃতিক বিপন্নতার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ প্রকাশ আজ ঘটছে রোহিঙ্গাদের ভয়ানক দুর্গত অবস্থার মধ্য দিয়ে।

নতুন এক শুরুর জন্য

বিপন্নতার এই আখ্যান কি ক্রমউন্মোচনের মধ্য দিয়ে চলতেই থাকবে ভাবিত-অভাবিত মানবিক ও প্রাকৃতিক অনর্থপাতের পলিতে ইতিহাসের সোঁতাকে ভরিয়ে তুলতে তুলতে? অপরের প্রতি বিদ্বেষের বিষে জর্জর হয়ে একে অপরকে হেনে মানুষ কী সেই সোঁতার তীরে ভুতুড়ে কিছু মৃতদের নগরীতে সর্বাত্মক রাষ্ট্রক্ষমতার সৌধ ঘিরে মরা মানুষের মতো বিচরণ করবে? বাণিজ্যিকীকরণ ও পণ্যায়ন ছেনে-কেটে-লুটে হুণ্ডির তাড়ায় পরিণত করে ধ্বংস করবে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ কেবলমাত্র যা-ই কিনা মানুষের জীবনকে ধারণ করতে পারে?

নাকি, মানুষ আবার নতুনভাবে শুরু করতে পারে? বিভিন্ন অপররা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা নিয়ে, একে অপরের

অপরতার মধ্যে জ্ঞানপূর্ণ যাতায়াত নিয়ে সহাবস্থানের মানবিক পৃথিবীর বীজ রোপণ করতে পারে? 'মায়ানমার' বলে চিহ্নিত ভূখণ্ডে বর্মী, অ-বর্মী সমস্ত জনজাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, সন্দেহ, হিংসা-র ঢেউ ও চোরাস্রোতগুলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে একে অপরের উপর ভরসা করে, বিশ্বাস করে, একে অপরকে আঘাত না করে নতুন সহাবস্থান গড়ে তোলার দিকে কি পা বাড়াতে পারে ওই ঢেউ ও চোরাস্রোতগুলোকে পরিত্যক্ত অতীতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে দিয়ে? কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার বদলে প্রতিটি মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়ার স্বাধীনতাকে ধারণ করে একটি বারোয়ারি রাজনৈতিক ক্ষেত্র কি গড়ে উঠতে পারে?

এভাবে নতুন করে শুরু করতে গেলে বর্মী, অ-বর্মী সমস্ত জনজাতির একে অপরের মধ্যে বিভিন্নতা ও বহুত্বকে সমমর্যাদায় গ্রহণ করে পারস্পরিকতার সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হয়, কোনো একটিকে আদর্শ বা সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ণয় করে (যেমন, বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাকে নির্ণয় করে গড়ে উঠেছে বর্মী-বৌদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ) অন্য অপরাপর সমস্তকে তার আদলে সমরূপ করে তোলার ভাবাদর্শকে পরিত্যাগ করতে হয়। নির্ণীত আদর্শ বা সর্বশ্রেষ্ঠের আদলে সমরূপতা উৎপাদনের ভাবাদর্শের উপরই দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রক্ষমতায় ক্রমকেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে সর্বাত্মকতাবাদের দিকে যাত্রা। হিংসাত্মক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের অন্তহীন অন্ধ আবর্তে মানুষকে তা আচ্ছন্ন করে ও মানুষের রাজনৈতিক স্বতক্রিয়ার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে করতে তা ধ্বংস করে। মায়ানমারের ঘটনা তা দেখাচ্ছে। তাই সমরূপতা উৎপাদনের ভাবাদর্শ ও তার উপর ভিত্তি করা রাষ্ট্রক্ষমতার ক্রম-কেন্দ্রীভূতকরণের প্রবণতা— এই দুইয়েরই সর্বাত্মক বিরোধিতা না করে কেবলমাত্র সংসদীয় নির্বাচন ও সরকার গঠনের কিছু রীতিনীতি চালু করে গণতন্ত্রের পথে হাঁটা সম্ভব নয়। সর্বশ্রেষ্ঠত্ববাদ বর্জন, সমরূপতা উৎপাদনের ভাবাদর্শ বর্জন ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতাকে বর্জন করে বিভিন্নতা ও বহুত্বকে মর্যাদাদানের উপর ভিত্তি করে নতুন রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই হয়তো হতে পারে নতুন এক শুরু।

একমাত্র এই যাত্রা শুরুর আবহেই রোহিঙ্গারা তাদের বহু শতকের বাসস্থান আরাকান প্রদেশে পূর্ণ নাগরিকের সম্মান ও অধিকার পেতে পারে, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের চরম দুর্গত শরণার্থী জীবনের ও যেকোনো সময় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অনিশ্চয়তার ইতি ঘটতে পারে। নাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতা বারবার তাদের ঠেলে মায়ানমারের ভিতরে পাঠালেও সেখানে তাদের অস্তিত্ব যেমন ক্রমশ আরও অধিকারহীন, আরও দুর্গত হতে থাকবে, তেমনই বারবার আবারও তাদের ভিটে-মাটি-দেশ ছেড়ে শরণার্থী হতে হবে।

আলোচনায় উপস্থাপিত তথ্য যে সমস্ত সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে :

১। ফ্রান্সিস ওয়েড, কিয়াও উইন ও ড. থমাস ম্যাকমানস রচিত 'পারসিকিউসন অফ মুসলমিস ইন বর্মা', ২০১৭ সালে বর্মা হিউম্যান রাইটস নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রকাশিত।

২। এন গণেশন ও কিয়াও ইন হলাই সম্পাদিত, ইনস্টিটিউট অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ, সিঙ্গাপুর কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'মায়ানমার: স্টেট, সোসাইটি অ্যান্ড এথনিসিটি'—এই সংকলন গ্রন্থের র‍্যাচেল এম স্যাফমান, কিয়াও ইন হলাইঙ ও তিন মাউঙ মাউঙ থান লিখিত প্রবন্ধ তিনটি।

৩। ডেভিড আই স্টেইনবার্গ রাচিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা ২০১০-এ প্রকাশিত 'বর্মা/মায়ানমার: হোয়াট এভরিবডি নিডস টু নো' গ্রন্থ।

৪। লেক্স রিফেল সম্পাদিত, কনরাড অ্যাডেনওয়েস ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১০-এ প্রকাশিত 'মায়ানমার/বর্মা: ইনসাইড চ্যালেঞ্জেস, আউট সাইড ইন্টারেস্টস'—এই সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক লিখিত ভূমিকা, এবং কিয়াও ইন হলাইঙ, মাউঙ জারনি লিখিত প্রবন্ধ দুটি।

৫। ওয়ালাইপর্ন তান্‌তিকানাঙকুল ও অ্যাসলে প্রিচার্ড সম্পাদিত, চিয়াঙ মেইন ইউনিভার্সিটি দ্বারা ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'পলিটিকস অফ অটোনমি অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ইন মায়ানমার: চেঞ্জ ফর নিউ হোপ, নিউ লাইফ?' গ্রন্থ।

৬। লিও পল ডানা রচিত, ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক দ্বারা ২০০২ সালে প্রকাশিত, 'হোয়েন ইকনমিক্স চেঞ্জ পাথস্: মডেলস অফ ট্রানজিশন ইন চায়না, সেন্ট্রাল এশিয়ান রিপাবলিক, মায়ানমার অ্যান্ড নেশনস অফ ফর্মার ইন্দোচিনে ফ্রাঁসে' গ্রন্থে মায়ানমারের উপর অংশ।

সংযোজনী : জাতি হিংসার কিছু চিত্র দলিল

ওক তাদার ব্লক, ইয়াতসাউক টাউনশিপ, শান স্টেট-এর জাও গি রাউন্ড্যাবাউট-এ টাঙানো 'পাবলিক নোটিশ'। বর্মী ভাষায় যা লেখা রয়েছে তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

মুসলমানমুক্ত অঞ্চল

১। এখানে মুসলমানরা রাত কাটাতে পারবে না।

২। এখানে জমি-জায়গা-বাড়ি বা অন্য সম্পত্তি কেনা বা ভাড়া নেওয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।

৩। মুসলমানদের কেউ বিবাহ করতে পারবে না।

—দেশপ্রেমিক যুব সংগঠন।

‘ফা ইয়ার গি কোন’ গ্রাম, ‘কিয়াউঙ কোন’ টাউনশিপ, ইরাবতী ডিভিশন-এ টাঙানো ‘পাবলিক নোটিশ’, যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

১। এখানে মুসলমানদের বসবাস করা বা রাত কাটানো নিষিদ্ধ।

২। মুসলমানরা এখানে সম্পত্তি কিনতে পারবে না বা ভাড়াও নিতে পারবে না (তা কেবলমাত্র বৌদ্ধরাই করতে পারবে)।

৩। মুসলমানদের কেউ বিয়ে করতে পারবে না। (প্রতিটি পুরুষ/নারী-কে এ বিধি মেনে চলতে হবে।)

৪। কেউ এই সমস্ত আঞ্চলিক বিধি অমান্য করলে তাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে ও আঞ্চলিক মানুষজন তাকে উচিত শাস্তি দেবে।

বাঘকে খেতে দিও না আর কালা (মুসলিম)-দের জায়গা দিও না
বাঘকে খেতে দিতে গেলে সে তোমাকেই খেয়ে নেবে
আর কালা (মুসলিম)-কে জায়গা দিলে, তোমার দেশ-জাতি-ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে।

সিনমাকও গ্রাম, কিয়াউক টান টাউনশিপ, ইয়াংগন-এ টাঙানো ‘পাবলিক নোটিশ’, যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

এটি একটি বৌদ্ধ গ্রাম
অন্য কোনো ধর্ম এখানে নিষিদ্ধ
আমরা সৎ
জাতিগতভাবে অন্যদের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ
সিনমাকও গ্রাম হল
এবং থাকবে একটি বিশুদ্ধ বৌদ্ধ গ্রাম

দূরে এক রোহিঙ্গা গ্রাম জ্বলছে। একদল সশস্ত্র রাখাইন সেই গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে, একজন মায়ানমারি সেনা নির্লিপ্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। ঘটনাকাল জুন ২০১২। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ২০১৩-র প্রতিবেদন থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে।

মিনবিয়া টাউনশিপের রোহিঙ্গা গ্রাম 'জইল্যা পাড়া'য় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে রাখাইন আক্রমণকারীরা। অক্টোবর ২০১২-র ঘটনা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ২০১৩-র প্রতিবেদন থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে।

সিটওয়ে-র উপকণ্ঠে আইডিপি ক্যাম্প (ইনটারনালি ডিসপ্লেসড পারসনস ক্যাম্প)। জুন ২০১২-তে কট্টরপন্থী রাখাইন ও মায়ানমারী সেনার যুগলবন্দী আক্রমণে ভিটে-মাটি ছাড়া হওয়া হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের এখানে পশুর মতো গাদাগাদি করে প্রায়-বন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে।

লেডা শিবির, বাংলাদেশের কক্সবাজারের কাছে টেকনাফে রোহিঙ্গাদের একটি শরণার্থী শিবিরের দৃশ্য, ডিসেম্বর ৩, ২০১৬। জলের জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষায় রোহিঙ্গা নারী ও শিশুরা।
চিত্রগ্রাহক: এ এম আহাদ

পিছমোড়া করে হাত বেঁধে খুন করা হয়েছে এই রোহিঙ্গা যুবককে। এই মৃতদেহটি এরকমই ১৮টি রোহিঙ্গা-মৃতদেহ-র অন্তর্গত যা সিটওয়ের ঠিক বাইরে ১৩ জুন ২০১২-তে পুলিশ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি মৃতদেহেই এমন বীভৎস অত্যাচারের চিহ্ন ছিল। পুলিশ অঞ্চলের কিছু লোককে ডেকে তাদের বলে গণকবর খুঁড়ে দেহগুলি পুঁতে দিতে। ছবিটি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ২০১৩-র প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

অন্যতর কোনও পন্থা?

শেষ দুটো অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম এই প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বদলে অঞ্চলের কোনো প্রধান জাতির নেতৃত্বে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলে বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারের উপর রাহুগ্রাসের শাসন অবসান হয় কিনা। আমরা দুটো দৃষ্টান্ত আলোচনা করেছি। এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে কী দেখা গেল তা প্রথমে সারসংকলন করে নেওয়া যাক।

বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত

বাংলাভাষীদের ভাষিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছিল উপনিবেশের গর্ভ থেকে সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার গাজোয়ারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিজ জাতিরাষ্ট্র অর্জন করে। বাংলাভাষাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রচলনের অভিপ্রায় ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষীদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং উপনিবেশের রাহুগ্রাসে ভাষা-সংস্কৃতি ক্ষয়ের রোধ ঘটিয়ে পুনরুজ্জীবন ঘটানোর ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রশাসন-আমলাতন্ত্র-আদালতে ইংরেজি ভাষাকুশলতাকে পুঁজি করে যাঁরা সোপানতান্ত্রিক কাঠামোয় সুবিধাভোগী শীর্ষগুলি দখল করে বিরাজ করছিলেন, তাঁরা এই ভাষাসুবিধা আপসে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না, ফলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন প্রথম থেকেই অত্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও পরম্পরার উপর দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক বিকাশের কোনো দর্শন গড়ে ওঠেনি, বরং ঔপনিবেশিক প্রভুদের ফেলে রেখে যাওয়া প্রকৃতি ও মানুষকে লুণ্ঠন করে ‘নগরায়ন-শিল্পায়ন-ভোগবৃদ্ধির পথকে অনুসরণ-অনুকরণ’ করাই উন্নতির পথ হিসেবে শিরোধার্য থেকেছে। এর ফলে পশ্চিমী পুঁজির জন্য তদ্বির-তদারক করা, পশ্চিমী দেশে পাড়ি জমিয়ে উপার্জন

বাড়ানো ইত্যাদির অনুঘটক হিসেবে ইংরেজি ভাষার মান ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বেড়েছে বৈ কমেনি। ফলে সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের ধারা ক্রমশ শুকিয়ে এসেছে, 'কাজের ভাষা' ও 'মানের ভাষা' হিসেবে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষাই আধিপত্য জারী রেখেছে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের পথে হেঁটেছে, ফলে সর্বজনীন উদ্যোগের বিকাশ ঘটানোর বদলে পার্টি-সেনা-আমলাতন্ত্রের নাগপাশের নিয়ন্ত্রণ কায়েমই তার অভীষ্ট হয়ে উঠেছে। তার ফলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের ভাষিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তার কাছে ক্রমশ আরও মূল্যহীন হয়ে উঠেছে। শেষত, অন্য আর একটা দিকও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার অধিকারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র কিন্তু প্রথম থেকেই তার ভূখণ্ডের বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার অধিকার সম্পর্কে কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। চাকমা জনজাতির মানুষরা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যেভাবে এই জনজাতিদের ভাষিক অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় 'উন্নয়নী' পরিকল্পনায় তাদের ভিটেছাড়া দেশান্তরী হতে হয়েছে, তা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিকারী শাসন ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারও কোনো সহমর্মিতার স্পর্শ পায়নি।

মায়ানমারের দৃষ্টান্ত

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর বর্মায় জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব নিয়ে বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। যে পরম্পরা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বর্মী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের অভীষ্ট, তা হল অতীতের বর্মী রাজা ও সমরকুশলীদের অন্যান্য সমস্ত জনজাতিদের উপর অস্ত্রের জোরে শাসনাধিপত্য কায়েমের পরম্পরা। বর্মী ছাড়া অন্য সমস্ত জনজাতির কাছে শিকারী মানসিকতার বিচারে এই রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কোনো তফাৎ নেই। বিবিধ জনজাতি তাই এই রাষ্ট্রের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে আবদ্ধ আর রাষ্ট্রটিও তার দমনমূলক দিকটিকেই ক্রমশ প্রখর করে চলেছে। সমস্ত অধিকার হরণ করে রোহিঙ্গাদের এই রাষ্ট্র উচ্ছিষ্টের মতো দেশের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, এখন আমরা তাহলে তার উত্তর হিসেবে এই কয়েকটি কথা বলতে পারি :

- ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পরও ভূখণ্ডের সমস্ত জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারকে সমমর্যাদা দিয়ে

সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে না দেখলে উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র কোনো একটি শাসকজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে অন্য সমস্ত জনজাতির উপর একইরকম শিকারী শাসন কায়েম করে।

- উপনিবেশ-প্রভুদের প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতি ও মানুষকে লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে 'নগরায়ন-শিল্পায়ন-ভোগবৃদ্ধির' পথকেই বিকাশের একমাত্র পথ হিসেবে ধরে নিয়ে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করাই যদি শিরোধার্য থেকে যায়, তাহলে, উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্রের আমলেও উপনিবেশ-প্রভুদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারের প্রভুত্ব কায়েম থাকবে, বিভিন্ন জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হবে না।
- রাষ্ট্র যদি ক্ষমতার ক্রম কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে পার্টি-সেনা-আমলাতন্ত্রের হাতে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্রম কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা নিয়ে চলে, তাহলে ক্রমশ বিভিন্ন জনজাতিদের স্বতক্রিয়ার অধিকার হরণের প্রক্রিয়াই লাগু থাকবে, ফলে, জনজাতিদের ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারও রাহুগ্রাসে পড়বে।

উপনিবেশের যুগ পেরিয়েও শিকারী শাসনক্ষমতা বহাল থাকার এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী বা বিকল্প কোনো সম্ভাবনা কি আমরা দেখতে পাই? এই প্রশ্নটিই তাহলে এখন সামনে এসে দাঁড়ায়। এই প্রশ্নটিকে সঙ্গে নিয়েই আমরা এর পরের দুটি অধ্যায়ে আবার দুটি অন্য দৃষ্টান্তকে বিচার করব। প্রথমে আমরা বিচার করব স্কটল্যান্ডের ইতিহাসের একটি মুহূর্ত—২০১৪-র সেপ্টেম্বর মাস, যখন ব্রিটেন থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোটকে কেন্দ্র করে একটি তরঙ্গ উঠেছিল। তার পরে আমরা বিচার করব দীর্ঘ ইতিহাসপর্যায় জুড়ে কাতালোনিয়ার ভাষিক অধিকার ও স্বশাসন আদায়ের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত।

অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীন স্কটল্যান্ডের দাবিতে গণভোট: নতুন জাতীয়তাবাদ?

স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতা-তরঙ্গ

২০১৪-র ১৮ সেপ্টেম্বরে স্কটল্যান্ডে গণভোট হয়েছিল। 'স্কটল্যান্ডের কি স্বাধীন দেশ হওয়া উচিত?' এই প্রশ্নে তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পর 'হ্যাঁ'-মতামতের হার হয়েছে 'না'-মতামতের কাছে।

গণভোটের ফল ঘোষণার পরই এডিনবার্গে একটি বিশাল জমায়েত হয়, যেখানে এই ভোটে রিগিং-এর অভিযোগ তোলা হয়। তাছাড়াও জর্জ স্কোয়ারে দেখা যায় যে প্রচুর 'হ্যাঁ'-পন্থী 'শোক ও বিলাপ' (mourning and moaning) প্রদর্শন করছেন।[১]

অন্যদিকে, ১৯ সেপ্টেম্বর 'গার্জিয়ান' পত্রিকার অর্থনীতি বিভাগের সম্পাদক ল্যারি এলিয়ট লেখেন:

> উল্লাস নয়, স্বস্তি। এটাই ছিল স্কটিশ গণভোটের ফলে আর্থিক বাজারের (financial markets) প্রতিক্রিয়া।
>
> স্বস্তি এইজন্য যে স্কটল্যান্ড কী মুদ্রা ব্যবহার করবে তা নিয়ে মাসের পর মাস, হয়তো বা, বছরের পর বছর কচলাকচলি করার থেকে তারা রেহাই পেল, স্বস্তি এইজন্য যে কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে তল্পি গোটানোর ঘোষণার ছররা হয়তো বা আর শোনা যাবে না।...
>
> ফলস্বরূপ, পাউন্ড তার ঊর্ধ্বগতি বজায় রেখেছে, যে ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়েছিল গতকাল, যখন লন্ডনের ব্যাংকগুলো নিশ্চিত হয়েছিল যে গত কয়েক সপ্তাহের হ্যাঁ-পক্ষের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া গেছে ভোটের আগের শেষ ৪৮ ঘণ্টায়।... লন্ডনের শেয়ার বাজারও উঠেছে।
>
> ...এখন আর স্কটিশ ব্যাংকগুলোর সামনে আমানতকারীদের লম্বা সারি পড়বে না, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে নগদ টাকার আপৎকালীন আমদানি করতে হবে না, ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিএড়িয়ে যেতে পারা সবসময়েই বাজারের পক্ষে সুসংবাদ।[২]

দুই পক্ষের এই দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছে, গণভোটকে ঘিরে আমজনতা থেকে সর্বোচ্চ শাসক-প্রশাসক অবধি আবেগ-উত্তেজনা, আশা-হতাশার মন্থন বেশ তীব্র ছিল। এই গণভোটের আগে 'হ্যাঁ'ও 'না' পক্ষের প্রচার চলেছে বহুদিন, বা বলা ভালো, বহু বছর ধরে। ২০০৭ সালে স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (এসএনপি) স্কটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই এই গণভোটের প্রস্তুতি-প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'হ্যাঁ' মতের পক্ষে, অর্থাৎ ব্রিটেনের থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে সওয়াল-প্রচার করেছিল যে সমস্ত পার্টি, তারা হল: স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (এসএনপি), পরিবেশবাদী গ্রিন পার্টি, স্কটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি (এসএনপি) এবং কিছু বিপ্লবী বামপন্থী, যেমন, সলিডারিটি, সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ইত্যাদি। আর, 'না' মতের পক্ষে 'একসঙ্গে থাকাই ভালো' (Better Together) সওয়াল-প্রচার করেছিল ব্রিটেনের প্রধান দুই সংসদীয় রাজনৈতিক দল কনজারভেটিভ বা টোরি ও লেবার পার্টি (কেন্দ্রীয় পার্টি ও স্কটল্যান্ডের শাখা উভয়ই) এবং লিবারাল ডেমোক্রাটরা।

গণভোটের ফল দিয়ে এই দুইপক্ষের মধ্যে জয়ী বা পরাজিত বিচার করতে গেলে যে মস্ত ভুল হবে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'গার্জিয়ান' পত্রিকার জন হ্যারিসের ২৫ সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে:

> 'গণভোট-পরবর্তী কার্যকলাপের বিপুল ঢেউ ওঠার উল্লেখযোগ্য খবর এসেছে এই সপ্তাহে—অবাক হওয়ার কথা, যাদের পরাজিত বলে ধরা হচ্ছে সব খবর তাঁদের পক্ষে যাচ্ছে। গতকাল সকাল অবধি, গণভোট হওয়ার পরের পাঁচ দিনে স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি মোট ৩৭,০০০ নতুন সদস্য আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে দাবি করেছে, যা তার গণভোট পূর্ববর্তী মোট সদস্য সংখ্যা ২৫,০০০-এর চেয়েও বেশি।
>
> স্কটিশ গ্রিন পার্টি তার আয়তন তিন গুণ করে প্রায় ৬,০০ সদস্য সংখ্যায় পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ-মতের পক্ষে থাকা 'উইমেন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স' তার সদস্যসংখ্যা ৬০% বাড়িয়ে ফেলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অক্টোবরের গোড়ায় তাদের জাতীয় সভার জন্য আগের চেয়ে অনেক বড়ো জায়গা খুঁজতে হচ্ছে।
>
> এই শনিবার স্কটিশ পার্লামেন্টের সামনে একটি 'গণকণ্ঠ' (Voice of the People) সমাবেশ হবে, যাতে বেশ কয়েক হাজার জমায়েত হবে বলে প্রত্যাশা। বাহ্যত, স্ফূর্তি আর বেপরোয়া ভাব সর্বত্র, কেবলমাত্র স্কটিশ লেবার পার্টিই ব্যতিক্রম, স্কটিশ লেবার পার্টি এখনও মরেনি, তবে তার সদস্যসংখ্যা ৫০,০০০-এ নেমে এসেছে।... ফলাফল দাঁড়িয়েছে, জেতার পরও গোটা স্কটিশ লেবার পার্টিকে যারপরনাই গোমড়ামুখো ও দিশাহীন লাগছে এবং সীমানার উত্তর-দক্ষিণ উভয় পারের নেতারাই এখনও অবধি বুঝে উঠতে পারছেন না কী কারণে অতীত লেবার ভোটের ৩০ শতাংশ (বলা

বাহুল্য, ২৫-৩৯ বছর বয়সীদের বেশির ভাগ, অথবা তার একদা দুর্ভেদ্য দুর্গ গ্লাসগো-র বড়ো অংশ) স্বাধীনতাকে সমর্থন করল।'[৩]

ফলে, বোঝা যাচ্ছে যে, 'স্বাধীন স্কটল্যান্ডের দাবি' পরাজিত হলেও দাবির পক্ষের শক্তি ক্রমাগত তার গণভিত্তি প্রসারিত করতে পেরে উজ্জীবিত আর ব্রিটেনের অংশ হয়ে থাকার প্রস্তাবকরা ক্রমশ গণভিত্তি হারাতে হারাতে উদ্‌ভ্রান্ত।

তরঙ্গ বিশ্লেষণ

ব্রিটেন ভেঙে স্বাধীন স্কটল্যান্ড রাষ্ট্র গঠনের দাবির এই ঢেউ-ওঠা কি স্কট জাতীয়তাবাদ নির্মাণেরই একটি প্রকাশ? 'হ্যাঁ' মত গঠনের পক্ষে সওয়াল-প্রচার চালানো সবচেয়ে বড়ো দল স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির নামের মধ্যে জাতীয়তাবাদী পরিচয় থাকা, এই আন্দোলন গড়ে ওঠার পটভূমিকায় স্কটল্যান্ডের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে ঐক্যপন্থী ব্রিটিশ 'হুইগ' ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিকদের সঙ্গে স্কটিশ ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিকদের দীর্ঘ বিতর্ক—এইসব সেইরকমই ইঙ্গিত করে। কিন্তু সংশয়ের অবকাশ তৈরি হয় একটি পরিসংখ্যান থেকে। স্কটল্যান্ডের যে অধিবাসীরা নিজেদের আত্মপরিচয়ে 'ব্রিটিশ' নয়, 'স্কটিশ' পরিচয়কেই এগিয়ে রাখে বা একমাত্র বলে মনে করে ২০০০ সালের পর থেকে তারা মোট স্কটল্যান্ডের অধিবাসীদের ৭০% বা তার বেশি; কিন্তু ওই একই সময়পর্যায়ে স্কটল্যান্ডের স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পক্ষে মত দেওয়া অধিবাসীদের হার ২০% থেকে ৩৫%-এর মধ্যে থেকেছে, সম্প্রতি গণভোটের আগে তা অভূতপূর্বভাবে বাড়লেও ৫০% ছুঁতে পারেনি।[৪] এর থেকে স্পষ্ট যে 'স্কটিশ' আত্মপরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া সবাই স্বাধীন স্কটল্যান্ড চান না। আবার উলটো দিকটাও সত্য, কারণ বহু সমাজতন্ত্রী, যারা জাতীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে আন্তর্জাতিকতাবাদকে গুরুত্ব দেন, তারা এই গণভোটে স্বাধীন স্কটল্যান্ডকে সমর্থন করেছেন। ফলত, স্বাধীন স্কটরাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন আর জাতীয়তাবাদ নির্মাণের আন্দোলন পরস্পরের সঙ্গে খাপে-খাপে এঁটে যায় না—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা নিবিড়ভাবে বিচার করা দরকার।

স্কট জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন স্কটরাষ্ট্র গঠন

ব্লখ তাঁর 'ফিউডাল সোসাইটি' বইতে স্কটল্যান্ডের উৎপত্তিকে ইংল্যান্ডে স্ক্যান্ডিনেভীয় হানার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। স্ক্যান্ডিনেভিয় হানাদারির ফলস্বরূপ ইয়র্কশায়ারে ভাইকিংদের বাসপত্তনী গড়ে ওঠে এবং এডিনবার্গের নর্থ আমব্রিয়ান দুর্গের চারধারের নীচু জমি পাহাড়িয়া কেলটিক প্রধানদের দখলে আসে। এর ফলে

ইংল্যান্ডের অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতি-জীবনধারার থেকে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল একটা ধারা গড়ে ওঠে এই অঞ্চলে, যার ভিত্তিতে স্কটল্যান্ড রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।[৫]

স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চল ও দ্বীপগুলোর সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল গ্যেলিক।[৬] অন্য আর একটি ভাষাও গড়ে উঠেছিল স্যাক্সন ও ফরাসির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে প্রভাববিস্তারকারী ছিল কেল্টিক ও স্ক্যান্ডিনেভীয় উপাদানসমূহ। এই ভাষা 'স্কট' বা 'নর্দার্ন ইংলিশ' নামে পরিচিত হয় স্কটল্যান্ডের রাজদরবারে ও সামাজিক অভিজাতদের মহলে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তা হয়ে ওঠে রবার্ট হেনরিসন ও উইলিয়াম ডানবার-এর মতো কবির কবিতার ভাষা। কিন্তু এই ভাষার বিকাশে বাধা পড়ে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে স্কট ও ইংরেজ রাজাদের ঐক্য ঘটনার মধ্য দিয়ে, যার পরে স্কটল্যান্ডের রাজদরবার, প্রশাসন ও অভিজাতমহলের ভাষা হয়ে ওঠে দক্ষিণী ইংরেজি ভাষা।

গ্যেলিক ও স্কট ভাষা টিঁকে থেকেছে ক্ষয়প্রাপ্ত আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে। স্পেনের কাতালান জাতি বা ফ্রান্সের ব্রিটানিরা যেমন তাদের নিজস্ব ভাষার প্রমিত সংস্কৃত রূপ তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছে, স্কটরা তা কখনোই দেয়নি, এবং নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থাও গড়ে তোলেনি। তারা ইংরেজি ভাষাকেই গ্রহণ করেছে। সাধারণত জাতি পরিচয় নির্মাণে ভাষা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, স্কট জাতির পরিচয় নির্মাণে তা অনুপস্থিত।

১৭০৭ সালে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে ঐক্য চুক্তি হয়, যে চুক্তিকে টম নেয়ার্ন তাঁর 'দি ব্রেক-আপ অফ ব্রিটেন' বইতে এই দুই জাতির অভিজাত রাজনীতিকদের মধ্যে হওয়া 'অভিজাত দরকষাকষি' (patrician bargain) বলে অভিহিত করেছেন।[৭] মনে রাখা দরকার যে সেই সময়টা ছিল 'জাতি-রাষ্ট্র'-এর আবির্ভাবের আগের যুগ। সে সম্পর্কে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর 'ইমাজিনড্ কমিউনিটিজ' বইতে বলেছেন:

> আজকের দিনে নিজেকে মানসিকভাবে এমন একটি বিশ্বে হাজির করা বোধহয় খুবই কঠিন, যেখানে বেশির ভাগ লোকের কাছে রাজবংশীয় রাজ্য (dynastic realm) হল একমাত্র অনুমেয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কারণ, 'প্রকৃত' রাজতন্ত্রের অবস্থান রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত আধুনিক ধ্যানধারণার বিপরীতে। রাজপদ সমস্ত কিছুকে সংগঠিত করে একটি উচ্চ কেন্দ্রকে ঘিরে। তার মান্যতা উৎপন্ন হয় দেবত্ব (divinity) থেকে, জনতা থেকে নয়, যে জনতা, শেষ বিচারে, প্রজা মাত্র, নাগরিক নয়। আধুনিক ধারণা মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব একটি আইনমাফিক চিহ্নিত অঞ্চলের প্রতিটি বর্গসেমির উপর সম্পূর্ণভাবে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, এবং সমভাবে কার্যকরী থাকে। কিন্তু পুরোনো দিনের ভাবনায়, যেখানে রাষ্ট্র সংজ্ঞাত হত তার কেন্দ্র দিয়ে, সীমানা ছিল ছিদ্রময় ও অনির্দিষ্ট,

> আর সার্বভৌমত্বসমূহ অগোচরে একে অন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যেত। কূটাভাস হলেও এই কারণেই প্রাক-আধুনিক রাজতন্ত্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে তাদের শাসন সহজে কায়েম রাখতে পেরেছে এমন সব জনগোষ্ঠীদের উপর যারা প্রভূতভাবে অসদৃশ এবং প্রায়শই পরস্পর সংলগ্নও নয়।[৮]

এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্য থেকে যখন 'ব্রিটিশ' জাতীয় পরিচয় নির্মাণ এবং সেই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হল, তখন স্কটরাও তার অংশগ্রহণকারী ছিল, এবং খুব অনিচ্ছুক অংশগ্রহণকারী ছিল না। নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭০৭-এর চুক্তির শতবর্ষ পালন সমারোহের কথা, যা হয়েছিল ১ মে, ১৮০৭-য় এডিনবার্গে একটি রাজকীয় নাচের আসর (Grand Ball)-এর মধ্য দিয়ে। সেইদিন, সেই নাচের আসরের ঘরটিতে সেন্ট জর্জ, সেন্ট অ্যানড্রু ও সেন্ট প্যাট্রিক-এর বিশাল ছবির (যা ইংল্যান্ডের চার্চ ও রাজপরিবারের প্রতীক) নীচে বাদকগণ বাজাচ্ছে 'রুল ব্রিটানিকা', 'হার্টস অফ ওক', 'ব্রিটনস স্ট্রাইক হোম' এবং 'গড সেভ দি কিং' (ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের ধর্মসংগীত বলা যায় এগুলোকে)।[৯] নেপোলিয়নের ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতের মাঝের সেই সময়ে 'ব্রিটিশ' পরিচয় পরাভূত করেছিল 'স্কটিশ' পরিচয়কে। স্কটল্যান্ডের অভিজাত জমি-মালিকরা গোটা ইউনাইটেড কিংডম-এর বিভিন্ন জায়গাতেই বড়ো বড়ো এস্টেট-এর উপর মালিকানা কায়েম করেছে, তারাই রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সক্রিয় অংশ এবং তারা ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের বড়ো খুঁটি।

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের নীচু অঞ্চলে গড়ে ওঠা ভারী শিল্পগুলোর ফুলে-ফেঁপে ওঠার ভরসা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিশাল বাজার। স্কটরাও তখন 'শ্বেত মানুষের দায়' (White man's burden) কাঁধে তুলে নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে নিজেদের সমৃদ্ধিকে যুক্ত করেছে।[১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই পরিস্থিতি দ্রুত পালটায়। স্কটল্যান্ডের ভারী শিল্পে তীব্র মন্দা দেখা দেয় এবং ১৯৩০-এর পর দক্ষিণ ও মধ্য ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের কিছুটা আরোগ্য হলেও স্কটল্যান্ডে তা হল না। এই সময়ে প্রাধান্যবিস্তারকারী প্রবণতা হিসাবে দেখা গেল যে স্কটল্যান্ডের শিল্পপতিরা সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ইংল্যান্ডের দিকেই চেয়ে আছে। শুল্ক-ছাড় বা ভরতুকির জন্য যেমন তারা লন্ডনের সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল, তেমনই দেখা গেল ইংল্যান্ডের বড়ো বড়ো কোম্পানি বা কার্টেল-এর সঙ্গে স্কট-মালিকানাধীন ব্যবসার একীভূতকরণ (merger)। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেও স্কট জাতীয়তাবাদের কিছু প্রকাশ দেখা

গেলেও কখনোই তা বড়ো চেহারা নেয়নি, ব্রিটেনে অন্তর্ভুক্ত থাকার মধ্য দিয়েই তারাও তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে ভেবেছে।

১৯৮০-র দশকে আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। আন্তর্জাতিক আর্থিক পুঁজির (financial capital) প্রিয় 'লৌহমানবী' মার্গারেট থ্যাচার তখন নয়া উদারনীতিবাদের মুষল পর্ব শুরু করলেন। পূর্ববর্তী পর্যায়ে স্কটল্যান্ডে যেসব বড়ো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল, তা সব একে একে বন্ধ করে দেওয়া হল। সামাজিক পরিষেবার উপর আঘাত নামানো হল মুহুর্মুহু। নয়া উদারনীতিবাদের এই আক্রমণের অস্ত্রবাহক হিসাবে কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টি—দুই পক্ষই কাজ করায়, এই আক্রমণের বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা থেকে নতুন রাজনৈতিক শক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির দ্রুত উত্থান এই সময় থেকেই। একদিকে যেমন সে ব্যবসাবন্ধু মুখ গড়ে তুলেছে কম করের (low-tax) স্বাধীন স্কটল্যান্ডের স্লোগান তুলে, অন্যদিকে সে সামাজিক পরিষেবা আরো বাড়ানোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-এর নির্বাচনে স্কটিশ পার্লামেন্টে সর্ববৃহৎ পার্টি হিসাবে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির উঠে আসার পর যেমন স্বাধীনতার জন্য গণভোটের প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, তেমনই সামনে এসেছে স্বাধীন স্কটল্যান্ডের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতি কী হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, যা নয়া-উদারনীতিবাদের সঙ্গে দূরত্ব ও বিরোধিতা সযত্নে রক্ষা করেছে। এই প্রসঙ্গে আরো বিশদ আলোচনায় আমরা এই লেখার পরবর্তী অংশে যাব। স্কটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি তার অবস্থান ঘোষণায় যেমন যে কোনো বিনিয়োগকে (স্বদেশি-বিদেশি নির্বিশেষে) আহ্বান জানিয়েছে, তেমনই স্বাধীন স্কটল্যান্ডে শুধু স্কটদের অভিবাসন না চেয়ে যে কোনো ধর্ম-জাতের মানুষকে অভিবাসী হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদের প্রমিত ধারণার থেকে ভিন্ন—জাতীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি গঠনের থেকে ভিন্ন পথগামী।

আলোচনার এই অংশে বিভিন্ন দিক বিবেচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যা যা এল তা হল :

'ব্রিটিশ' জাতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে স্কট জাতি-পরিচয় ও জাতি-অস্তিত্ব (স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপে) নির্মাণপ্রচেষ্টা একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে একটিই মাত্র জাতি (স্কট জাতি)-র একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে চাইছে না, নিজস্ব কোনো পৃথক ভাষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে না। ব্রিটিশ জাতি-রাষ্ট্র স্কটল্যান্ডের উপর জোর খাটিয়ে শাসন কায়েম করেছিল বা ঔপনিবেশিক শাসন

চালিয়েছে এমনটা নয়, ইতিহাসের বড়ো সময় ধরে স্কটরা স্বেচ্ছাতেই 'ব্রিটিশ' থেকেছে। ফলে নিপীড়ক জাতি—নিপীড়িত জাতি-র প্রমিত কোনো ছক এখানে প্রযোজ্য নয়।

এই সমস্ত দিক থেকে স্কট জাতীয়তাবাদ অচেনা চেহারার। জাতিগত-ভাষাগত পরিচয় ও অধিকার স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে এর মধ্য দিয়ে অনেক বেশি প্রকাশিত হচ্ছে নয়া উদারনীতিবাদ-বিরোধী রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আকাঙ্ক্ষা। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পরিবেশবাদী 'গ্রিন'আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তার সহজ মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই এবার আমরা মনোনিবেশ করব।

নয়াউদারনীতিবাদ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য

স্কটল্যান্ডের আঞ্চলিক আইন-প্রণয়ন ও আইন-লাগু করার সীমিত ক্ষমতা থ্যাচার জমানা থেকে চলা একটানা নয়াউদারনীতিবাদের আক্রমণের সঙ্গে টক্করের তাজা ক্ষেত্র হয়ে থেকেছে। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্কটল্যান্ড তার সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রকে অনেক বেশি অটুট রাখতে পেরেছে। এখনও স্কটল্যান্ডে অটুট বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, সবার জন্য বিনামূল্যে ঔষধপত্র, স্কট ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা। প্রাইভেট ফিনান্স ইনিশিয়েটিভ বা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এর মতো আগমার্কা নয়াউদারনীতিবাদী প্রকল্পও এখনও স্কটল্যান্ডে বাতিল, জলবণ্টনও এখনও সরকারি দায়বদ্ধতার আওতায়।

স্বাধীন স্কটল্যান্ডের পক্ষে সওয়াল-প্রচার করা সব পক্ষ এই সামাজিক পরিষেবাকে আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্য ঘোষণা করে সরাসরি নয়াউদারনীতিবাদী ব্যবস্থাপত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও তারা নয়াউদারনীতিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বেশ কিছু নির্ধারক দিকের বিরোধিতা করে বিকল্প অবস্থান নিতে চেয়েছে, যেমন—

১. ব্রিটেনকে দোসর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক আধিপত্য বিশ্বজুড়ে কায়েম করে চলেছে, তার অংশীদারিত্ব ছেড়ে স্বাধীন স্কটল্যান্ড পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। স্কটল্যান্ডের ক্লাইড-এ ব্রিটেনের পারমাণবিক অস্ত্রবাহী সাবমেরিন-ঘাঁটি ট্রিডেন্ট অবস্থিত। স্বাধীন স্কটল্যান্ডে এই ঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ কেউ ন্যাটো জোট থেকে বেরিয়ে আসার কথাও বলছে।
২. স্কটল্যান্ডের জিডিপি-র ৫০% জুড়ে আছে উত্তর সাগর (নর্থ সি)-এর তেল উৎপাদন। এতদসত্ত্বেও, স্বাধীনতাকামীরা ঘোষণা করেছে যে স্বাধীন স্কটল্যান্ডে তারা নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহারের বিকাশ ঘটিয়ে জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে চায়, কার্বন-নির্গমন হ্রাস করতে চায়।
৩. সামরিক খাতে খরচ হ্রাস করে, যুদ্ধাস্ত্র শিল্পে সমস্ত ভরতুকি বন্ধ করে সেই সম্পদকে তারা সামাজিক পরিষেবা বৃদ্ধি করার জন্য কাজে লাগাতে চায়, যাতে এমন সমাজ গড়ে তেলা যায় যা 'আরো বেশি সহানুভূতিশীল, আরো ন্যায্য, আরো পরিবেশ-সচেতন, আরো সম্পদশালী।'

স্বাধীনতাকামীদের এই অবস্থান দেখায় যে তারা স্বাধীন স্কট রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে এমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছে যেখানে নয়াউদারনীতিবাদকে নাকচ করে বিকল্প রাজনৈতিক চর্চা সম্ভব হবে।

আর্থিক পুঁজি (financial capital) এই প্রবণতার মধ্যে তার বৈরী চিনে নিতে ভুল করেনি। এই আলোচনার শুরুতে গণভোটের ফলাফলে আর্থিক পুঁজির যে প্রতিক্রিয়া বিধৃত হয়েছে, তা থেকে সেটা বোঝা যায়। আরো বোঝা যায় এর থেকে যে গণভোটের ঠিক আগে ইউরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো একসুরে হুমকি দিয়েছিল যে স্কটল্যান্ড স্বাধীন হলে তার মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থার অঙ্গ হতে নানা অসুবিধা পোহাতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম প্রশাসনিক প্রধান ব্যারোসো ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীন স্কটল্যান্ডকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের অধিকারী হিসাবে সরাসরি বিবেচনা করা হবে না।

আলোচনার এই অংশ থেকে যা যা বেরিয়ে আসে তা হল:

স্কটল্যান্ডের স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া/না-হওয়াকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত চলছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে এই প্রশ্ন—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও চর্চা সংগঠিত করা ও পরিচালনা হবে কোন নীতির আধারে—আধিপত্যকারী নয়া উদারনীতিবাদের আধারে, না কি তার বিরোধী কোনো বিকল্পের আধারে? স্কট জাতীয়তাবাদও এই সংঘাতকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হচ্ছে; ফলে পূর্বপরিচিত জাতি-রাষ্ট্র গঠন-অভিলাষী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের থেকে তার রাজনৈতিক চেহারা স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত হয়ে উঠছে।

অতএব, এরপর . . .

গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট পরাজিত হওয়ার পরও স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েনি, বরং তা আরো উজ্জীবিত পুষ্ট চেহারা নিচ্ছে তা আমরা আগেই দেখেছি। এই জোয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব, যারা স্কটিশ

পার্লামেন্টেও সবচেয়ে বড়ো শক্তি, কোমর বেঁধে নামছে ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট থেকে আরো বেশি আঞ্চলিক আইন প্রণয়ন ও আইন লাগু করার অধিকার আদায় করে নিতে, যাকে বলা হচ্ছে 'ম্যাক্সিমাম ডেভোলিউশন' বা 'ডেভো ম্যাক্স'। সুতরাং আর্থিক পুঁজি (financial capital)-এর চিন্তার মেঘ এখনো কাটেনি। এই আলোচনার শুরুতে 'গার্জিয়ান'-এর যে লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল, ল্যারি এলিয়টের সেই লেখাতেই বলা হয়েছে:

> আর্থিক বাজার (financial markets) রাজনৈতিক ঝুঁকিকে ভয় পায়, এবং তা প্রভূত পরিমাণে হাজির থাকবে সামনের মাসগুলোয়—স্কটল্যান্ডকে যে সমস্ত নতুন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে তা নিয়ে কনজারভেটিভ এমপি-দের প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে, ওয়েলস ও উত্তর আয়ার্ল্যান্ডকেও একই রকম ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্য দিয়ে, এবং পরবর্তী মে-তে কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে।[১১]

সুতরাং স্কটল্যান্ডের গণভোটের মধ্য দিয়ে চলমান রাজনৈতিক নাটকের অবসান হল না, দৃশ্যান্তর হল মাত্র।

পরিশেষে কিছু সধারণ প্রসঙ্গ

স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে স্বাধীন স্কট রাষ্ট্র গঠনের দাবি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারায় হলেও তার বেশ কিছু বিশেষত্ব আছে যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রমিত ধারণার থেকে পৃথক। এর পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে আরো কিছু আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে যা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি সামনে তুলে এনেছে—যেমন, স্পেনের কাতালান অঞ্চল ও বাস্ক অঞ্চলের আন্দোলন, কানাডার ক্যুবেক অঞ্চলের আন্দোলন, ফ্রান্সের ব্রিটানির আন্দোলন, ব্রিটেনের ওয়েলশ অঞ্চলের অন্দোলন। স্কটল্যান্ডের আন্দোলনের মতোই এই আন্দোলনগুলোরও স্বাতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ দিক ধরে আলোচনা করে বোঝাবুঝি করা দরকার। জাতিগত আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তাভাবনার যে তৈরি প্রকোষ্ঠগুলো আছে, তার মধ্যে কোনোমতে ঢুকিয়ে দিয়ে সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা ঠিক হবে না। ১৯৭০-এর পর থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যেভাবে এই 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনগুলো আত্মপ্রকাশ করেছে, তা স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির দাবি রাখে। ১৯৭০-এর আগের পর্যায়ে প্রথমে বুর্জোয়া জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর্যায় বা পরে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন অঞ্চলে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই ১৯৭০-পরবর্তী পর্যায়ের

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর বেশকিছু পার্থক্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা সযত্ন অনুধাবনযোগ্য কারণ পরিবেশ-সচেতন, বৈষম্য-মুক্ত ভবিষ্যতের পথ এ-সবের মধ্য দিয়েও তৈরি হবে।

পরিশেষে বলার যে এই আলোচনা করা হচ্ছে এমন এক ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে এমন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বসে যা বহু নিপীড়িত জাতির কারাগার হিসাবে অধিষ্ঠিত। ভারতরাষ্ট্র প্রায় ঔপনিবেশিক চরিত্রের জাতিগত নিপীড়নের শাসন বজায় রেখেছে তার অন্তর্গত একাধিক নিপীড়িত জাতির উপর। এর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে, জাতিগত আন্দোলনের বিকাশ ও তার রাষ্ট্রীয় দমনের ইতিহাসও দীর্ঘ। স্কটল্যান্ডের গণভোট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, কিন্তু কাশ্মীরে এমন গণভোটের প্রস্তাব ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে রেজোলিউশন হিসাবে পাশ হলেও আজ অবধি তা হতে পারেনি রাষ্ট্রীয় বৈরিতার কারণেই। এইসমস্ত নিপীড়িত জাতিদের পক্ষ নিয়ে গণভোট দাবি করাকেই ভারতে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'-র আখ্যা দিয়ে দমন করা হয়। তাই ভারতীয় রাষ্ট্রের এই নিপীড়িনমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্ত জাতির শেষ সীমা পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো আবশ্যিক। না হলে, দুনিয়াজুড়ে মাথা চাড়া দেওয়া এই নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে না।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের 'দি গার্জিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত জন হ্যারিস-এর লেখা 'স্কটল্যান্ড হ্যাস সোউন হাউ দি লেফট ক্যান ফাইনালি ফাইন্ড ইটস পারপাস' শীর্ষক প্রতিবেদন।

২. ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের 'দি গার্জিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত ল্যারি এলিয়ট-এর লেখা 'ইউ কে পি এল সি ব্রিদস ইজি এগেইন আফটার স্কটল্যান্ডস ''নো'' ভোট—বাট ফর হাউ লং?' শীর্ষক প্রতিবেদন।

৩. ১-এর অনুরূপ।

৪. তুলনামূলক পরিসংখ্যানটি দুটি লেখচিত্রকে তুলনা করে পাওয়া যায়। লেখচিত্র দুটি আছে স্কটিশ সমাজতাত্ত্বিক মাইকেল কিটিং-এর লেখা 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্কটল্যান্ড: সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি সিফটিং পলিটিকস অফ ইউনিয়ন' বইয়ের ৬২ ও ৭৪ পৃষ্ঠায়।

৫. ব্লখের করা এই আলোচনা পাওয়া যাবে তাঁর 'ফিউডাল সোসাইটি' বইয়ের প্রথম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায়।

৬. এই গ্যেলিক ভাষা যে ইংরেজির চেয়ে প্রভূত আলাদা এবং শিক্ষিত ইংরেজদের কাছেও বোধগম্য নয়, তার একটা উদাহরণ ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা 'দি সলিটারি রিপার'।

এখানে ইংরেজ কবি স্কটল্যান্ডের পাহাড়ি অঞ্চলের কৃষক-কন্যার গানের সুরে মোহিত হলেও তার ভাষা কিছুই বুঝতে পারেনি।

৭. টম নেয়ার্নের 'দি ব্রেক-আপ অফ ব্রিটেন'বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৮. বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের 'ইমাজিনড কম্যুনিইটজ', পৃষ্ঠা ১৯।

৯. মাইকেল কিটিং-এর 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ স্কটল্যান্ড : সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি সিফটিং পলিটিকস অফ ইউনিয়ন'বইয়ের পৃষ্ঠা ১৭।

১০. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতে, বিশেষত বাংলায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় যে জুটমিলগুলো গড়ে ওঠে, তাদের মালিক ছিল মূলত স্কটরা।

১১. ২-এর অনুরূপ।

নবম অধ্যায়

কাতালান ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ

কাতালান ভাষা ও ভাষার সংকট

কাতালান ভাষার কথক ৯০ লাখের কিছু বেশি মানুষ, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন যে যে অঞ্চল জুড়ে তা হল—স্পেনের অন্তর্গত কাতালোনিয়া, বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, ভালেনসিয়া, আরাগনের পূর্ব প্রান্ত, পিরেনিজ-এ অবস্থিত আনডোরা, ফ্রান্সের অন্তর্গত উত্তর কাতালোনিয়া এবং ইতালির অন্তর্গত সার্দিনিয়ার আলঘেরো। অঞ্চল সাপেক্ষে কাতালান ভাষার উপস্থিতি বর্তমানে এইরকম :[১]

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	কাতালান ভাষায় কথা বলতে পারে (শতাংশ)	কাতালান বুঝতে পারে (শতাংশ)
কাতালোনিয়া	৭১,৩৪,৬৯৭	৮৪.৭	৯৭.৪
আনডোরা	৭৮,৫৪৯	৭৮.৯	৯৬.০
বালিয়ারিক	১০,০১,০৬২	৭৪.৬	৯৩.১
ভালেনসিয়া	৪৮,০৬,৯০৮	৫৩.০	৭৫.৯
আরাগনের পূর্বপ্রান্ত	৪৫,৩৫৭	৮৮.৮	৯৮.৫
উত্তর কাতালোনিয়া (ফ্রান্স)	৪,২২,২৯৭	৩৭.১	৬৫.৩
আলঘেরো (সার্দিনিয়া)	৪০,২৫৭	৬১.৩	৯০.১
মোট :	১,৩৫,২৯,১২৭	৯১,১৮,৮৮২	১,১০,১১,১৬৮

ভাষিক জনগোষ্ঠীর আয়তনের বিচারে এই কাতালান ভাষা সমকক্ষ সুইডিশ, ফিনিশ, নরওয়েজিয়ান বা চেক ভাষার মতো অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে। কিন্তু

ওই অন্যান্য ভাষাদের সমতুল্য স্বীকৃতি ও প্রচার তো কাতালান ভাষা পায়ইনি বরং তা গভীর সংকটগ্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে ইতিহাসের এক দীর্ঘ পর্যায় জুড়ে।

কাতালান ভাষার এই সংকটগ্রস্ত অবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিকরা ছয়টি অবস্থার কথা বলেছেন। সেই অবস্থাগুলো হল: ১। বিঘটন (disintegration), ২। বিগলন (dissolution), ৩। অবনমন (devaluation), ৪। বিভাজন (division), ৫। অন্তর্ধান (disappearance), ৬। অনুৎসাহ (demobilization)।[২] এই ছয়টি আখ্যার মোড়কে আসলে কী অবস্থার কথা বলা হয়েছে দেখা যাক।

১। **বিঘটন**: কাতালান ভাষার প্রধান আঞ্চলিক রূপগুলো হল কেন্দ্রীয় (যা কাতালেনিয়ার বৃহৎ অংশে চালু),বালিয়ারিক (যা বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে চালু), ভালেনসিয়ান (যা ভালেনসিয়াতে চালু) এবং উত্তর-পশ্চিমি (যা কাতালোনিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চালু)। বিঘটন বলতে যে সমস্যার কথা বোঝানো হয়েছে তা হল বিভিন্ন অঞ্চলের কাতালান ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অভাবে পারস্পরিক দূরত্ব (বিনিময়ের অভাব, পরস্পর বোধ্যতা হ্রাস পাওয়া) তৈরি হওয়া ও বাড়তে থাকা যা শেষাবধি প্রতিটি আঞ্চলিক রূপকে একটি পৃথক ভাষায় পর্যবসিত করে কাতালান ভাষার বিঘটন ঘটাতে পারে।

২। **বিগলন**: বিগলন বলতে বোঝানো হয়েছে কাতালান ভাষার নিজের নিজস্বতা ও স্বকীয়তা খুইয়ে বসা। প্রচার মাধ্যমে ও জনজীবনে কাস্তিলিয়ান ভাষার[৩] (যা সাধারণত 'স্প্যানিশ' ভাষা বলে পরিচিত) আধিপত্য কাতালান ভাষীদের কথোপকথনে ও লেখায় বহু কাস্তিলিয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কাতালান শব্দের বদলে। এর ফলে কাতালান ভাষার নিজস্বতা ও স্বকীয়তা ক্ষয়গ্রস্ত হচ্ছে।

৩। **অবনমন**: জনজীবনে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোয় কাস্তিলিয়ান ভাষা বহুল প্রচলিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে কাতালান ভাষার গুরুত্ব হারানোকে অবনমন বলা হয়েছে।

৪। **বিভাজন**: কাতালান-ভাষী অঞ্চলগুলো বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের সীমানার দ্বারা রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত থাকার কথা বোঝানো হয়েছে। কাতালান ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে একে একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা হয়েছে।

৫। **অন্তর্ধান**: মা-বাবাদের একাংশ তাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কাতালান ভাষায় কথা না বলে কাস্তিলিয়ান ভাষায় কথা বলার জন্য, নতুন প্রজন্ম কাতালান ভাষা শিখছে না, কাতালান ভাষায় কথা বলার ও বোঝার ক্ষমতা পুনরুৎপাদিত হচ্ছে না। একেই অন্তর্ধান বলা হয়েছে।

৬। **অনুৎসাহ**: অনুৎসাহ বলতে বোঝানো হয়েছে এটাই যে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়ে কিছু কাতালানভাষী সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য উৎসাহী-উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না, বরং 'যা চলছে চলুক' গোছের গা-ছাড়া ভাব দেখাচ্ছেন।

কাতালান ইতিহাস ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ

ভাষাবিদদের বর্গীকরণ অনুযায়ী কাতালান ভাষা লাতিন শিকড় সমেত গল-রোমান্স ভাষা-পরিবারের সদস্য। মৌখিক ভাষা হিসাবে তৎকালীন একমাত্র লিখিত ভাষা লাতিন-এর থেকে কাতালানের স্বতন্ত্র উপস্থিতি অষ্টম শতকে চিহ্নিত করা যায়। কাতালানের প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে এসে ভিসিগথদের আইনপঞ্জির লাতিন থেকে করা একটি অনুবাদ এবং ধর্মোপদেশের একটি সংকলনের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় মধ্যযুগে 'পুরানো কাতালোনিয়া' (লা কাতালুনিয়া ভেলা) অঞ্চল প্রশাসনিক-রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও আঞ্চলিক সম্প্রসারণ হতে থাকলে (লিগ, টরসা, মাজোরকা, ভালেনসিয়া, সারদিনিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে) কাতালান ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে এই সময়েই রামন লুল তাঁর সাহিত্যিক ও দার্শনিক রচনাবলির মধ্য দিয়ে পরিমার্জিত কাতালান গদ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দী কাতালান ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে স্বর্ণযুগ নিয়ে আসে। উচ্চমানের কাব্য, উপন্যাস, ব্যঙ্গাত্মক গদ্য এই সময় কাতালান ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।[৪] গণমাধ্যম হিসাবেও কাতালান ভাষার প্রসার ঘটে।

কিন্তু এর পরের দুই শতাব্দী, অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নেমে আসে বিপর্যয়, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্র ধরে। ১৪১০ সালে কাতালান রাজা মার্টিন-১ উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা গেলে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংকট দেখা দেয়, যার ধারাবাহিকতায় ১৪১২ সালের 'কাম্প-এর আপস রফা'-র মাধ্যমে কাস্তিলিয়ান ট্রাসটামারা রাজবংশ এই এলাকার উপর আধিপত্য কায়েম করে। এর ফলে ষোড়শ শতাব্দী জুড়ে চলে অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী মহলের 'কাস্তিলীয়করণ'। রাজসভাকে ঘিরেই যেহেতু তখন উচ্চ-সংস্কৃতি আবর্তিত হত, কাতালান ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির ধারা ব্যাহত হয়। নিম্ন ও মধ্যবর্গের মধ্যে অবশ্য কাতালান ভাষার মৌখিক ব্যবহার চালু থাকে। নিম্নবর্গ যেহেতু কাস্তিলিয়ান ভাষা বুঝতই না, নিম্নবর্গের দ্বারা তৈরি ও নিম্নবর্গের মধ্যেই প্রচারিত গান-পদ্য-নাটকে কাতালান ভাষাচর্চা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে আর একটি ঘটনারও সূত্রপাত ঘটে। রাজসভা-পোষিত কাতালান সাহিত্যচর্চার অবসানের ফলে কাতালান ভাষার

একটি কেন্দ্রীয় রূপের প্রমিতিকরণ এই সময় ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের বিকাশই প্রাধান্য পায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'স্পেনীয় পরম্পরা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ' (War of Spanish Succession)-এর মধ্য দিয়ে কাস্তিলীয় রাজা ফিলিপ-৫-এর ক্ষমতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলস্বরূপ কাতালানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ আরও তীব্র রূপ গ্রহণ করে। সদ্যজয়ী রাজা 'নুয়েভা প্লান্টা' নামে আদেশাবলি জারি করে। এই আদেশাবলি ভালেনসিয়ায় জারি হয় ১৭০৭ সালে, বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ১৭১৫ সালে এবং কাতালোনিয়ায় ১৭১৬ সালে। এই আদেশাবলির মাধ্যমে এই সমস্ত অঞ্চলের মাতৃভাষা কাতালানীয় ভাষার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং সর্বস্তরে কাস্তিলীয় ভাষার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ফলে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তো বটেই, সামাজিক ক্ষেত্রেও কাতালান ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমে যায়। অবশ্য এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও অঙ্কুরিত হয়। এই সমস্ত আদেশাবলি সত্ত্বেও, সরাসরি তাকে অগ্রাহ্য করে শিশুদের কাতালানীয় ভাষা ব্যবহারে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে নির্দেশিকা-পুস্তক রচনা করেন বালদিরি রেইহাচ ১৭৪৯ সালে। সেই বইয়ের নাম 'ইক্রসিয়ঁস পার আ ল'এসেনইয়ানসা ডি মিনিয়নস'। এই বইয়ের একাধিক সংস্করণ হয়েছিল এবং তা গোপনে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সমাজের উচ্চ স্তরে সমস্ত ধরনের প্রকাশনা মূলত কাস্তিলিয়ান ভাষাতেই হত। সমাজের উচ্চ ও মধ্য বর্গ সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নতির পথ হিসাবে কাস্তিলিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতিতে মানিয়ে নিতে থাকল। কেবলমাত্র সমাজের নিম্নবর্গই এই মানিয়ে নেওয়ায় অংশ নিল না, মাতৃভাষা কাতালানের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা ও তাদের মাতৃভাষা-চর্চা অটুট থাকল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের বিস্তারের প্রভাবে ও শিল্পবিপ্লবের ফলে আসা পরিবর্তনের ধাক্কায় এই অঞ্চলে 'পুনর্জন্ম' (রিনাইহেনকা) নামে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম হল। গত তিন শতকের মাতৃভাষা চর্চার ও মাতৃভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির অধোগতিকে 'পচন' (ডেকাডেনসিয়া) আখ্যা দিয়ে এই আন্দোলন নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য ঘোষণা করল। এই আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল নব উত্থিত বুর্জোয়ারা, যাদের শক্তির কেন্দ্র ছিল কাতালোনিয়া (যে অঞ্চলে সেই সময় থেকে আজ অবধি স্পেনের শিল্পায়ন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে)। ১৮৩৩ সালে কাতালোনিয়ায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত বলে ধরা হয়, যা ভালেনসিয়ায় ছড়ায় ১৮৪১ সালে

এবং বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ছড়ায় তার কিছু পরে। মাতৃভাষা কাতালানের সম্মান পুনরুদ্ধারের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে শুরু হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে এই পুনর্জন্ম আন্দোলন বিভিন্ন পথে বিকশিত হয়। কাতালোনিয়ায় তা রূপ নিতে থাকে সমাজের সর্বস্তরে কাতালান ভাষার ব্যবহারকে নিশ্চিত করার ভাষিক-সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং কাস্তিলীয়করণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে ভালেনসিয়ায় এটা পর্যবসিত হয় একটি দুর্বল দ্বিভাষিকতার মতাদর্শে যা কাস্তিলীয়করণের বিরোধিতা না করে সমাজের মধ্য ও উচ্চস্তরের জন্য অজুহাতের দরজা খোলা রাখে সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে কাস্তিলীয় ভাষাকে গ্রহণ করার দিকে।

প্রথম কাতালান সংবাদপত্র 'ডায়ারি কাতালা' প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৮৭০ থেকে। ওই ১৮৭০ থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে 'লা কামঙ্গনা ডি গারসিয়া' নামে কাতালান ভাষায় পত্রিকা যা ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-রাজনৈতিক সমালোচনা হাজির করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 'পুনর্জন্ম' আন্দোলনের থেকে শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভরকেন্দ্র সরে যায় 'আধুনিকতা' (মডার্নিসমে)-র আন্দোলনে। 'পুনর্জন্ম' আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আঞ্চলিক বদ্ধতার জন্য সমালোচনা করে এই আন্দোলন কাতালান ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানকে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করে। বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও তাদের সৃষ্টি[৫] এই আন্দোলনের ফসল। কিন্তু তা ছাড়াও এই আন্দোলনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যা 'রাজনৈতিক কাতালানবাদ' (Political Catalanism)-এর জন্মদাতা।

রাজনৈতিক কাতালানবাদ তার জন্মমুহূর্ত থেকেই কিছু স্বতন্ত্র চরিত্রযুক্ত, যার ফলে জাতীয়তাবাদের সাধারণ সংজ্ঞায় তাকে ফেলা সমস্যাজনক। কাতালান ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ভাষাচর্চার প্রসার এবং কাতালান জাতি-পরিচয়ের নির্মাণ রাজনৈতিক কাতালানবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও রাজনৈতিক কাতালানবাদ কখনোই কেবলমাত্র জন্মসূত্রে কাতালোনীয়দের জন্য চিহ্নিত একটি ভূখণ্ডে একটি কেন্দ্রীভূত জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণের উদ্দেশ্যকে তার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরেনি। রাজনৈতিক কাতালানবাদের মধ্যে বরং পাওয়া যায় বিকেন্দ্রীভূত এমন একটি রাষ্ট্র-কল্পনা যেখানে আঞ্চলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা প্রসারিত হবে, খর্বিত হবে না। রাজনৈতিক কাতালানবাদের বহু প্রবক্তা তাঁদের আদর্শকে এক 'নতুন ধরনের প্রগতিবাদী জাতীয়তাবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, আবার অনেকে 'জাতীয়তাবাদ' কথাটাতেই আপত্তি করে বলেছেন যে তাঁদের আদর্শ কাতালানবাদ, জাতীয়তাবাদ নয়।[৬]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজনৈতিক কাতালানবাদ কাতালোনিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রভাবিত করার মতো শক্তি অর্জন করে। তার প্রথম পর্বের উল্লেখনীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এনরিক প্রাট ডি লা রিবা যিনি কাতালোনিয়ার চারটি উপ-অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বার্সেলোনার আঞ্চলিক আইনসভা 'ডি পুটাসিয়ো ডি বার্সেলোনার' সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তারপর ১৯১৪ সালে কাতালোনিয়ার নবগঠিত আঞ্চলিক সরকার 'মানকমুনিতাত ডি কাতালুনিয়া'-র প্রধান নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রসারের চেষ্টা বড়ো আঘাতের মুখোমুখি হয় যখন স্পেনে সামরিক প্রধান প্রিমো ডি রিভেরার একনায়কতন্ত্র কায়েম হয় ১৯২৩ সালে। ১৯২৫ সালে একনায়ক রিভেরা কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার মানকমুনিতাত-কে ভেঙে দেন। একনায়কতন্ত্রী কেন্দ্রীভূত শাসন কায়েমের অংশ হিসাবে কাস্তিলীয় ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্যও আরোপ করা হয়। একনায়ক রিভেরার পতন ঘটে ১৯৩০ সালে। একনায়কতন্ত্রী শাসনের পতনের পর ১৯৩২ সালে কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক ক্ষমতার অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের চাপে 'কাতালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের সনদ' (স্ট্যাটুট অফ অটোনমি) মেনে নিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় স্পেনীয় সরকার। মানকমুনিতাত পুনর্গঠিত হয়।

১৯৩২-এর রাজনৈতিক সাফল্যের পর কাতালনিয় আঞ্চলিক সরকারের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে কাতালান ভাষার প্রমিত রূপ দেওয়া হয় ও সর্বস্তরে ভাষা ব্যবহার প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কাতালান ভাষায় বেতার সম্প্রচার প্রথম চালু করা হয় রেডিও অ্যাসোসিয়াসিও ডি কাতালুনিয়া (১৯৩০-১৯৩৯)-এর মাধ্যমে, ১৯৩৩ সালে কাতালান ভাষায় ২৭টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল, এছাড়াও শুরু হয়েছিল কাতালান ভাষার বহু পত্রিকা। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছিল।[৭]

এই সময় কাতালোনিয়ায় একটি নতুন ঐতিহাসিক শক্তি তার উত্থান ঘোষণা করে। সেই শক্তি হল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বলীয়ান শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। অ্যানার্কিস্ট, অ্যানার্কো সিন্ডিকালিস্ট, মার্কসিস্ট—এমন বিভিন্ন অবস্থানের তারতম্যসহ শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক কাতালানবাদের গণতান্ত্রিক চাহিদাকে ছাপিয়ে তা শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের চাহিদাকে গণআন্দোলনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইসবের মধ্য দিয়ে স্পেনের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে এবং তাকে রক্ষা করার

উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে সেনা-অভ্যুত্থানের প্রয়াস হয়। সেই সেনা অভ্যুত্থানের মুখে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্ন সংগঠন শ্রমিক মিলিশিয়া গড়ে তুলে তার প্রতিরোধে নামে। কাতালোনিয়ার বার্সেলোনা অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনগুলো গণউদ্যোগের উপর নির্মিত পাল্টা প্রশাসনিক কাঠামোরও জন্ম দিয়েছিল। সেই সময় শ্রমিকদের মিলিশিয়ার হয়ে লড়াই করতে যাওয়া জর্জ অরওয়েলের লেখা 'হোমেজ টু কাতালোনিয়া'-তে তার জীবন্ত ছবি আমরা পাই:

> সময়টা ছিল ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরের শেষ দিক।... আমি স্পেনে এসেছিলাম সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন লিখে পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু কোনো বিলম্ব না করেই আমি মিলিশিয়ায় যোগ দিয়েছিলাম, কারণ সেই সময়ে সেই পরিবেশে সেটাই একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে হয়েছিল। কাতালোনিয়ার নিয়ন্ত্রণ তখনও কার্যত অ্যানার্কিস্টদের হাতে এবং বিপ্লব তখনও পুরোদমে জারি। প্রথম থেকে যে সেখানে আছে তার কাছে হয়ত সেই ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারিতে এসে মনে হতে পারে যে বিপ্লবী পর্যায়ের শেষ ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে সোজা বার্সেলোনায় এসে পড়েছে এমন কারও কাছে সেই পরিস্থিতিও রীতিমতো চমকপ্রদ ও অভিভূত করে দেওয়ার মতো। সেই প্রথম আমি উপস্থিত হয়েছি এমন কোনো শহরে যেখানে শ্রমিকশ্রেণির হাতে চালকের রশি। প্রায় সমস্ত বাড়ির, ছোটো বা বড়ো, দখল শ্রমিকরা নিয়েছে এবং তাদের গায়ে টাঙিয়ে দিয়েছে হয় লাল পতাকা, নয়তো অ্যানার্কিস্টদের লাল ও কালো পতাকা, প্রতিটা দেওয়ালে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন আর বিপ্লবী পার্টিদের নামের আদ্যক্ষর, প্রায় সমস্ত চার্চকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, চার্চগুলোর সবছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের দল পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে চার্চগুলোকে। প্রতিটি দোকান বা কাফেতে লেখা ঝুলছে যে সেগুলো সাধারণ মালিকানাধীন (collectivized)—এমনকি বুট-পালিশ করে যারা তাদেরও সমবায়ীকরণ করা হয়েছে, তাদের বাক্সগুলোও লাল-কালো রঙ করা হয়েছে। হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিচারকরা বা দোকানের প্রদর্শকরাও চোখে চোখ তুলে তাকাচ্ছে এবং সমানে-সমানে ব্যবহার করছে। চাটুকারী বা সম্ভমসূচক কথনরীতি তখনকার মতো অদৃশ্য হয়েছে। কেউ আর 'সেনর' বা 'ডন' বা এমনকি 'উস্তাদ' বলে সম্বোধন করে না, সবাই সবাইকে কমরেড এবং তুমি' বলে। 'বুয়েনোস ডায়াস'-এর বদলে সবাই সবাইকে 'সালুদ!' বলে।... কোনো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মোটরগাড়ি নেই, সব অধিগৃহীত হয়েছে, সমস্ত ট্রাম-ট্যাক্সি বা অন্য পরিবহণ লাল-কালো রঙে রঙ করা হয়েছে।... বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এ এমন এক শহর যেখানে ধনী শ্রেণি কার্যত আর নেই। অল্প সংখ্যক কিছু মহিলা আর বিদেশি ছাড়া কার্যত রাস্তাঘাটে কোনো দামি পোশাক পরা লোক নেই। প্রায় সবাই শ্রমিকশ্রেণির পোশাক পরে, অথবা নীল আলখাল্লা পরে, বা মিলিশিয়ার পোশাক পরে।... যা দেখেছিলাম তাকেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম,

ভেবেছিলাম যে তা প্রকৃতই একটা শ্রমিকদের রাষ্ট্র এবং সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণিই হয় পালিয়েছে, নয়তো মারা পড়েছে, নয়তো স্বেচ্ছায় শ্রমিকপক্ষে যোগ দিয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি যে বড়ো সংখ্যক ধনবান বুর্জোয়া কেবলমাত্র আত্মগোপন করে আছে, শ্রমিকদের পোশাকের নিচে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে তখনকার জন্য।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ টানা তিন বছর গৃহযুদ্ধ চলে। কাতালোনিয়া, আরাগনসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রমিক ও কৃষকরা আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতা দখল করে স্বশাসনের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীন কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক এভাবে মেহনতী শ্রেণির নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে নেওয়ার বিরোধিতা করে। 'যুক্তফ্রন্ট' নীতি ও 'বিপ্লবের স্তর' সম্পর্কিত তত্ত্ব খাড়া করে তারা শ্রমিকদের দ্বিধাগ্রস্ত বুর্জোয়াদের অনুগমন করার বিধান দেয়। শুধুমাত্র বিধান দানই নয়, কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের নিয়ন্ত্রক শক্তি সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতি ও সামরিক সাহায্য দানও শ্রমিক-কৃষক মিলিশিয়াদের সাহায্য করেনি। সোভিয়েত রাষ্ট্র তখন চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত স্তালিনীয় চেহারা নিয়েছে—স্পেনেও তা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার বিপক্ষে দাঁড়ায়। কাতালোনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত ও তার পরে অবদমিত হয়। স্পেনজুড়ে সামরিক একনায়কতন্ত্রী ফ্রাঙ্কোর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালে।[৮]

১৯৩৯ সালে একনায়ক ফ্রাঙ্কোর চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত শাসন কায়েম হওয়ার পর আক্রমণ নেমে আসে কাতালোনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির উপর যেমন, তেমনই 'রাজনৈতিক কাতালানবাদ'-এর উপর। শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত স্বাধীন বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়, প্রচুর শ্রমিক ও বিপ্লবী সংগঠক খুন হন, আরও বহুসংখ্যাক দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। পাশাপাশি, রাজনৈতিক কাতালানবাদের প্রধান মুখ যে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা, তাদেরও অবদমনের শিকার অথবা দেশান্তরী হতে হয়। কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার 'জেনেরালিতাটাত দ্য কাতালুনিয়া' ভেঙে দেওয়া হয়। জনসমক্ষে কাতালান ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। গোটা স্পেন জুড়ে কাতালান ভাষার শিক্ষা বা সাহিত্যিক চর্চা প্রশাসনিকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার পদক্ষেপ জারি হয়। কাস্তীলিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকেই স্পেনের একমাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি করে তোলার গা-জোয়ারি প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। আগ্রাসী কাস্তীলিয় জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠল একনায়কতন্ত্রী ফ্রাঙ্কোর অস্ত্র। কাস্তীলিয় জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন গণসংগঠন (বিশেষ করে শ্রমিক সংগঠন) গড়ে তুলে প্রশাসনিক জোর খাটিয়ে কাতালনিয়দের বাধ্য করা হতে থাকে তার সদস্য

হতে। এছাড়াও স্পেনের অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষের অভিবাসন পরিকল্পিতভাবে কাতালোনিয়ায় করা হয়, জনসংখ্যায় অ-কাতালানদের অনুপাত বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এই শেষোক্ত কাজটি একনায়ক ফ্রাঙ্কোর প্রশাসন এই মাত্রায় করে যে ১৯৭৫ সালে এই শাসনের অবসানের সময় কাতালোনিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল অ-কাতালান প্রদেশ থেকে আসা অধিবাসী, যাদের মাতৃভাষা কাতালান নয়।

কাতালান ভাষা ও সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কাতালোনিয়ায় জারি ছিল নানাভাবে। কাতালোনিয়দের একটা বড় অংশ নিজেদের বাড়ির মধ্যে পরিবারে বা আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাতালান ভাষার চর্চা ও নতুন প্রজন্মের কাছে তা সঞ্চারিত করার কাজ সচেতনভাবে জারি রেখেছিল। বেশকিছু বেআইনি গোপন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল কাতালান ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা জারি রাখার জন্য।। অন্যদিকে, দেশান্তরী হতে বাধ্য হওয়া কাতালোনিয়দের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও কাতালান-চর্চা চলতে থাকে। দেশান্তরী হওয়া রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন কাতালান ভাষায়— যেমন, বুয়েনস আয়েরস থেকে 'কাতালুনিয়া', প্যারিস থেকে 'গোবলে কাতালা' এবং মেক্সিকো থেকে 'রিভিসতা দেলস কাতালানস দ্য আমেরিকা' প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৯৩৯ থেকে।

১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকে কাতালোনিয়ায় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকে। ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ প্রশাসনের বজ্রমুষ্টিকে ক্রমশ শিথিল হতে বাধ্য করে। ফলে কাতালোনিয়ার ভিতরেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে কাতালান ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ। ১৯৫৯ সাল থেকে প্রকাশ শুরু হয় 'সেরা দ্য'ওর' পত্রিকার এবং ১৯৬১ সাল থেকে 'কাদাল ফোর্ট' পত্রিকার। ১৯৬২ সাল থেকে কাজ শুরু করে কাতালান ভাষায় গ্রন্থের প্রকাশনা সংস্থা 'এদিসিওঁস ৬২' এবং 'এদিতরিয়াল এস্তেল'। কাতালান ভাষায় নতুন গানের দল তৈরি হওয়া প্রায় একটা আন্দোলনের চেহারা নেয়, যা 'নোভা কানকো' (নতুন গানের) আন্দোলন নামে পরিচিত হয় ১৯৫৯ থেকে। এই সমস্ত মঞ্চ থেকে বহু লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী কাতালান ভাষা ও সংস্কৃতির অবদমনের বিপক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।[৯]

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে একনায়ক ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর স্পেনীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন গতি পায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মাত্রায় দানা বাঁধা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চরম কেন্দ্রীভূত শাসনকাঠামোর পরিবর্তন

বাধ্য করে। ১৯৭৮ সালে নবনির্মিত স্পেনীয় সংবিধান একদিকে যেমন স্পেনের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা হিসাবে পুনর্গঠিত করে, তেমনই অন্যদিকে প্রতিটি অঞ্চলকে 'স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত সম্প্রদায়' (Autonomus Communities) হিসাবে ঘোষণা করে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের 'স্বায়ত্তশাসনের সনদ' (Statutes of Autonomy) স্বাক্ষরিত হয়—কাতালোনিয়ায় তা হয় ১৯৭৯ সালে, ভালেনসিয়ায় ১৯৮২ সালে এবং বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ১৯৮৩ সালে। এই সনদসমূহের মধ্য দিয়ে এইসমস্ত অঞ্চলে কাতালান ভাষা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পায়। আইনি স্বীকৃতির বিচারে অবশ্য অঞ্চলবিশেষে তারতম্য আছে। কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে দৃঢ় ও আন্তরিকভাবে কাতালান ভাষার প্রমিতিকরণ ও প্রসারের কাজ চালিয়েছে।

১৯৭৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার ১৯৮০ সালে ভাষানীতি নির্ধারণের জন্য একটি 'ডিরেক্তোরেত-জেনেরাল' তৈরি করে। তার উদ্যোগে ১৯৮৩ সালে 'ভাষা স্বাভাবিকীকরণ আইন' পাশ হয়। এই আইন কাতালান ভাষার সংকটগ্রস্ত অবস্থার স্বীকৃতি দেয়, কাতালান অঞ্চলে এই ভাষাকে সংখ্যালঘুর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থা থেকে অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এবং এই অঞ্চলে সরকারি সমস্ত কাজে কেন্দ্রীয় স্পেনীয় সরকারের কাস্তিলীয়ান ভাষার পাশাপাশি কাতালান ভাষার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করে। এর পাশাপাশি কাতালান ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের মান্যতা দেওয়া হয় ও তদনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সূচিত করা হয়। কাতালান ভাষায় গণ-প্রচারমাধ্যম গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে 'ভাষা স্বাভাবিকীকরণের জন্য উদ্যোগ' (Consortium For Language Normalisation) তৈরি করা হয় সমাজের সর্বস্তরে কাতালান ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বয়স্কদের কাতালান ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য। ১৯৯০ সালে গড়ে তোলা হয় 'কাতালান ভাষার সামাজিক সভা' (Social Council of the Catalan Language) যা ১৯৯১ থেকে ভাষা স্বাভাবিকীরণের সাধারণ পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে। ১৯৯৫ থেকে কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি নিতে থাকে যার উদ্দেশ্য সমসাময়িক বাস্তবতা অনুযায়ী কাতালান ভাষার সংকটমুক্তি ও প্রসারের জন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা। এর ধারাবাহিকতায় বিস্তৃত বিতর্কের পর ১৯৯৮ সালে পাশ হয় 'ভাষানীতি আইন' (Language Policy Act) যা কাতালোনিয়ার প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য ভাষা-সংক্রান্ত ব্যক্তিগত অধিকারের মান্যতা ঘোষণা করে

এই শর্তাধীনে যে কাতালোনিয়ার নিজস্ব ভাষা কাতালান সম্পর্কে তাদের গ্রহণশীল থাকতে হবে। এই আইন অনুযায়ী কাতালোনিয়ার নিজস্ব ভাষা কাতালান হওয়ার তাৎপর্য ত্রিবিধ:

১. **প্রাতিষ্ঠানিক**: যার অর্থ এই যে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহেই নয়, বণিকসভা, বিভিন্ন পেশাদারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও কাতালান ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক।
২. **আঞ্চলিক**: যার অর্থ এই যে কাতালোনিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়ায় কাতালান ভাষার ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩। **প্রসারে সাহায্য**: কাতালান ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উন্নতির জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে।[১০]

বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ বা ভালেনসিয়ায় কাতালান ভাষাসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সেখানকার আঞ্চলিক সরকারের প্রয়াস আন্তরিকতা ও ধারাবাহিকতার বিচারে অনেকটাই পিছিয়ে থেকেছে কাতালোনিয়ার থেকে। এই অধ্যায়ের শুরুতে দেওয়া সারণি ১-এ এই তিনটি অঞ্চলের জনসংখ্যায় কাতালান বলা ও কাতালান বুঝতে পারা লোকের শতাংশ বিচারের ফারাক বোধহয় তার ফলাফলকেই চিহ্নিত করে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কাতালান ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ কাতালোনিয়ায় দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল কাতালোনিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন অঞ্চল (শুধু স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলই নয়, তাছাড়াও আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ) থেকে আসা অকাতালান অভিবাসীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল স্পেন থেকে বেরিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। এই দুটো প্রশ্নকে এবার দেখা যাক।

কাতালানবাদ ও অভিবাসী প্রশ্ন

ভাষিক ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ বহু সময়েই এমন একটা আধিপত্যবাদী চেহারা নেয় যা তার চোখে চিহ্নিত অপরদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ ও জাতিহিংসার জন্ম দেয়। ইতিহাসে এর উদাহরণ অনেক। বর্তমান সময়ে এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ আধুনিক ইজরায়েল রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইহুদি জাতীয়তাবাদ যা বৃহৎ পুঁজির প্রসাদধন্য হয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে হিংস্র বুলডগের মতো প্যালেস্তিনীয়দের টুঁটি কামড়ে ধরেছে। কিন্তু

এইদিক থেকে রাজনৈতিক কাতালানবাদ ব্যতিক্রম। রাজনৈতিক কাতালানবাদের অন্তর্গত বিভিন্ন পক্ষ (বিভিন্ন আদর্শনৈতিক অবস্থান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী) এই ব্যাপারে একমত যে তারা জাতিহিংসা ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন বিভিন্নভাবে হলেও তারা চায় কাতালোনিয়ায় আসা অভিবাসীরা যেন তাদের ভাষা-সংস্কৃতিকে আক্রান্ত বা অবদমিত মনে না করেন এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তারা কাতালোনিয় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থান বা সংশ্লেষণ ঘটাতে পারেন। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারে কীভাবে, তার জন্য রাষ্ট্রের চেহারা ও ভূমিকাই বা কী হওয়া উচিত? এই নিয়ে বিভিন্ন রকম চর্চা রাজনৈতিক কাতালানবাদের মধ্যে হচ্ছে। সেই চর্চার কিছুটা স্বাদ পাওয়ার জন্য আমরা মিকুয়েল স্ট্রাবেল-এর উপস্থাপিত করা একটি বক্তব্য দেখতে পারি। মিকুয়েল স্ট্রাবেল কাতালোনিয়ার সমাজভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান (লিঙ্গুয়ামোনইউওসি)-এর নির্দেশক এবং বহুভাষিকতা বিশেষজ্ঞ, এর আগে তিনি ১৯ বছর কাতালান আঞ্চলিক সরকারের ভাষা-বিকাশ দফতরে কাজ করেছেন—কাতালোনিয়ার ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্যতম নীতি নির্ধারক হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত। ১৯৯৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেন। সেই বক্তব্যের একটা অংশে তিনি গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরেন। প্রথম উদাহরণ ফ্রান্সের। ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের পর যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা গোটা ফ্রান্সে একটি প্রমিত ফরাসি ভাষা ও ফরাসি হিসাবে একটিই জাতীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষই ফরাসি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলত—যেমন ওসিটান, প্রেটন, করসিকান, বাস্ক, কাতালান, ডাচ ও জার্মান ভাষা ছিল বড়ো জনসংখ্যার মাতৃভাষা। বিপ্লবের সময় যে 'আকাদেমি ফ্রাঁসে'-কে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল অভিজাততন্ত্রের ধারক হওয়ার জন্য, কিছুদিন পর আবার সেই 'আকাদেমি ফ্রাঁসে'-কেই পুনরুজ্জীবিত করে একটিই ফরাসি ভাষা ও একটিই জাতীয় পরিচয় গোটা ফ্রান্সের জনসংখ্যার উপর আরোপ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় উদাহরণটি হল বেলজিয়ামের, যে দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো একটি ভাষা বা জাতীয় পরিচয়কে নয়, বিভিন্ন ভাষা ও জাতীয় পরিচয়কে সমমর্যাদা দিয়েছিল। ১৯২৮ সালে বেলজিয়ামে একটি আইন পাশ করা হয় যে সেনাতে নতুন নিয়োগের সময় নবনিযুক্তদের প্রশিক্ষণ হবে সেইসব নবনিযুক্তদের প্রত্যেকের স্ব স্ব মাতৃভাষায়। এর ফলে সেনাবাহিনীও বিভিন্ন মাতৃভাষাসম্পন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল। সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত পরিচালন

পদ্ধতি থাকে যে সেনাবাহিনীতে সেখানেই এমন প্রক্রিয়া দেখায় যে সমাজের অন্যান্য স্তরেও বহুভাষা-সংস্কৃতির প্রতি স্বীকৃতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই দুই উদাহরণ আলোচনা করে মিকুয়েল স্ট্রাবেল বলেছেন:

> বহুভাষিকতার প্রতি ফরাসি ও বেলজিয় প্রতিক্রিয়ার এই পার্থক্য রাজনৈতিক দর্শনের সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ক্ষেত্রে চাওয়া হচ্ছে যে নাগরিকই নিজেকে মানিয়ে নেবে এবং মেনে চলবে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত (ভাষিক ও জাতীয়) ছাঁচের সঙ্গে—তার জন্য প্রধানত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহিত ও সাহায্যও করা হবে যাতে সবশেষে সমস্ত নাগরিককে একইরকম করে তোলা যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে ও তাদের ভাষিক চরিত্রের সঙ্গে—রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই রদবদল ঘটাতে হবে যাতে সে প্রতিটি নাগরিককে সমানভাবে বিবেচনা করতে পারে, বিবেচনা করতে পারে সেই নাগরিকের নিজস্ব শর্তে, নিজস্ব ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েই।[১১]

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই দ্বিতীয় চেহারাটাকে গুরুত্ব দিয়েই এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণ হতে পারে যা অভিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় ও ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েই নিজের অংশ করে নিতে পারবে। এমন ভাবনাই রাজনৈতিক কাতালানবাদের মধ্যে প্রধান প্রবণতা হিসাবে বর্তমান। এইখানেই তা জাতীয়তাবাদের পরিচিত সাধারণ চেহারার থেকে আলাদা হয়ে যায়, স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে।

কাতালানবাদ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্ন

কাতালানবাদের অভীষ্ট রাজনৈতিক গণতন্ত্র কি স্পেনের অন্তর্গত থেকেই আঞ্চলিক ক্ষমতার অধিকারকে ক্রমশ আরও বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সম্ভব, না কি স্পেনের থেকে বেরিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে সম্ভব? রাজনৈতিক কাতালানবাদের মধ্যে এই দুটি মতামতই বর্তমান। প্রথম পক্ষের যাঁরা, অর্থাৎ স্পেনে থেকে যাওয়ার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা মনে করেন যে স্পেনকে একটি বহুজাতিক বহুভাষিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে তার মধ্যে যেমন প্রতিটি জাতি ও ভাষার বিকাশের স্বার্থ রক্ষিত হবে, তেমনই ইউরোপিয় ইউনিয়নেও অধিক গুরুত্ব আদায় করা যাবে। যাঁরা এর বিপক্ষে, অর্থাৎ যাঁরা স্পেন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে, তাঁদের মতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র না গড়লে ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও আঞ্চলিক বিকাশ যথোচিতভাবে হবে না। তাঁরা অর্থনৈতিক দিকের কথাও তোলেন। কাতালোনিয়া স্পেনের সবচেয়ে শিল্পোন্নত অঞ্চল, এই অঞ্চল থেকে স্পেনীয় রাষ্ট্র যে পরিমাণ রাজস্ব তোলে, তার চার ভাগের এক

ভাগও এই অঞ্চলের জন্য খরচ হয় না—এমনটাই তাঁদের দাবি। কাতালোনিয়ার অধিবাসীরাও এই দুই মতের মধ্যে বিভক্ত। একটি সমীক্ষা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। ১৯৯০ সালে আনতোনি এস্ত্রাদে ও মন্তসেরাত ত্রেসেরা ২১০০ জন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালান । তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই রকম: এখন যদি একটা গণভোট ডাকা হয় কাতালোনিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে কি না সেই প্রশ্নে, তাহলে আপনার মত কী হবে? সমীক্ষার ফলটি হয়েছিল এইরকম:

সারণি-২[১২]

উত্তরের ধরন	বাবা-মা উভয়েই কাতালান এমন ব্যক্তিদের মধ্যে	অন্যান্যদের মধ্যে	মোট উত্তরদান কারীদের মধ্যে
'হ্যাঁ' ভোট দেন	৬০.৫%	৩৩.০%	৪৪.৫%
'না' ভোট দেন	১৪.৯%	৩৪.৬%	২৬.৪%
কোনো পক্ষে ভোট দেব না	২.৫%	>৩.৬%	>৩.১%
ভোটই দেব না	৬.৫%	>১১.৮%	>১৯.৬%
জানি না কী করব\ উত্তরদানে অস্বীকার	১৫.৬%	১৭.০%	১৬.৪%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

দেখা যাচ্ছে যে উত্তরদাতাদের মধ্যে কাতালান-বংশোদ্ভূতদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে, আর অ-কাতালান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীনতার বিপক্ষে, যদিও অ-কাতালানদের মধ্যেও স্বাধীনতার বিরুদ্ধচারণকারীরা সংখ্যায় খুব অল্পই বেশি স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারীদের থেকে। সব মিলিয়ে মোট হিসাবে স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারীরা বেশ এগিয়ে। ক্রমশ সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বনকারীরা সংখ্যায় আরো ভারি হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৮ সালের পর থেকে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবি আরও জোরদার হয়েছে। ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির সংকট ঘনীভূত হওয়ার পর আন্তর্জাতিকভাবে বৃহৎ পুঁজি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার ফলে স্পেনীয় কেন্দ্রীয় সরকারকেও সামাজিক খাতে

ব্যয় বরাদ্দ বিপুলভাবে ছাঁটাই করতে হয়েছিল। ফলত কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকারের তহবিল বিপুলভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং কাতালোনিয়ায় সমাজ ও জনকল্যাণখাতে ব্যয় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। এই ব্যয় হ্রাস ও বরাদ্দ হ্রাস-এর বিরুদ্ধে গণক্ষোভ সাধারণভাবে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবিকে আরো জোরদার করেছে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বার্সেলোনার রাস্তায় ১৫ লাখ কাতালানের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয় কাতালোনিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে। ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার বাধ্য হয় ২০১৪-র নভেম্বর মাসে স্বাধীনতার প্রশ্নে কাতালোনিয়ায় গণভোট ঘোষণা করতে। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার এই গণভোটকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং এর ফল মেনে নেবে না বলে জানিয়ে দেয়। কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার পুরোমাত্রায় সংঘাতের পথে না গিয়ে প্রস্তাবিত গণভোটকে 'প্রতীকী'বলে ঘোষণা করে। শেষ মুহূর্তে গণভোটকে প্রতীকী বলে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ায় অনেকেই ভোট দেননি। তা সত্ত্বেও ৫০% ভোট পড়েছিল এবং ভোটদাতাদের মধ্যে ৮০.৭% কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছিল। এর পর থেকে ক্রমশ দানা বাঁধে স্বাধীনতার প্রশ্নে 'প্রতীকী' নয়, প্রকৃত গণভোট করার ও তার ফল স্পেনের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে মানতে বাধ্য করার দাবিতে নানা আন্দোলন।

২০১৫-র সেপ্টেম্বরে কাতালোনিয়ার সরকারের নির্বাচন কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষের রাজনীতিবিদদের মধ্যে গণসমর্থন যাচাইয়ের ভোটের রূপ নেয়। কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বীরা কাতালোনিয়ার সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে, মোট ভোটের নিরিখেও ৪৭% ভোট পায়। নবগঠিত আইনসভা ২০১৫-র নভেম্বর থেকে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু করার মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাতালোনিয়ার নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুইগদেমঁ ২০১৬ সালে স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি চূড়ান্ত গণভোটের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার সেই গণভোটের পরিকল্পনাকে 'বেআইনি' ঘোষণা করে। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক বিচারসভার পক্ষ থেকে এভাবে 'বেআইনি' বলে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও ২০১৭-র ১লা অক্টোবর সেই গণভোট অনুষ্ঠিত হয় কাতালোনিয়ার সরকারের উদ্যোগে। কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার বিরোধী রাজনীতিবিদরা ওই গণভোট বয়কটের ডাক দিলেও আগের থেকেও বেশি মানুষ এই গণভোটে অংশ নেন (কাতালোনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ ভোট দেন) এবং তার মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ স্বাধীন কাতালোনিয়ার পক্ষে রায় দেন। এই গণভোটের রায়ের উপর

ভিত্তি করে কাতালোনিয়ার সরকার ২০১৭-র ২৭ অক্টোবর আইনসভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাতালোনিয়ার সরকার মনস্থ করে যে স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা/ অসহযোগিতা নিরপেক্ষ ভাবেই তারা কাতালোনিয়াকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে রূপ দেওয়ার পথে এগিয়ে যাবে।

এই গোটা সময় পর্যায় জুড়ে কাতালোনিয়ার রাস্তায় স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বিপুল গণসমাবেশ ধারাবাহিকভাবে দেখা গেছে। ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে বার্সেলোনায় এবং ২০১৬-র সেপ্টেম্বরে বার্সেলোনা, বের্গা, ল্যেইডা'সল্ট ও তারা গানা শহরে স্বাধীনতার দাবিতে সবচেয়ে বড় জমায়েতগুলো হয়।

স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক বিচারসভা কাতালোনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের এই দীর্ঘদিন ধরে অবিচলিতভাবে তুলে আসা দাবির তোয়াক্কা না করে স্বাধীনতার পক্ষের আন্দোলনকে দমন করার পরিকল্পনা করে কাতালোনিয়ার সরকারের স্বাধীনতার পক্ষের রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করার মধ্যে দিয়ে। ২০১৮ সালে কাতালোনিয়ার সরকারের এই নির্বাচিত পদস্থদের জামিন-অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হয় 'বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও গণতহবিল তছরূপ'-এর অভিযোগে। প্রধানমন্ত্রী কার্লেস পুইগদেমঁ এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদের চার সদস্য গ্রেফতারি এড়াতে দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। স্পেনের সুপ্রিম কোর্টে গ্রেফতার করে কারাবন্দী করা কাতালোনিয়া সরকারের পদাধিকারীদের দীর্ঘসুত্রী বিচার চলে প্রায় এক বছর ধরে, যার রায় সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয় ২০১৯-এর ১২ জুন। ১২ জনের মধ্যে ৯ জনকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে ৯ থেকে ১৩ বছর দীর্ঘ কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয় ও বাকি ৩ জনকে 'অবাধ্যতা'-র অপরাধে বিপুল পরিমাণ আর্থিক জরিমানা করা হয়।

স্পেনের সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা কাতালোনিয়া জুড়ে এই রায়ের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিপুল গণবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। পুলিশ জোর খাটিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করতে গেলে বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশের সঙ্গে হিংসাত্মক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আরো বেশি বেশি মানুষ বিক্ষোভে যোগ দিতে থাকে দিনের পর দিন। কিছু বিক্ষোভকারী বার্সেলোনা শহরে অবস্থিত স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের দফতর দখল করে নেওয়ারও চেষ্টা করে। এই টানা বিক্ষোভের মধ্যে কাতালান সরকারের স্বাধীনতাপন্থী প্রেসিডেন্ট কুইম তোরা স্বাধীনতার দাবিতে বিক্ষোভের

মধ্যে বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে ঘটা হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করে অবিলম্বে তা বন্ধের আবেদন করেন ও সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আরও জোরদার করার আহ্বান করেন। ২০১৯-এর ১৮ অক্টোবর বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বাধীনতার দাবিতে বিক্ষোভ জানাতে রাস্তায় নামে কাতালোনিয়া জুড়ে। লাখ লাখ মানুষ স্বাধীন কাতালোনিয়ার পতাকা হাতে নিয়ে, গায়ে জড়িয়ে বার্সেলোনা শহরকে স্তব্ধ করে দেয়। বার্সেলোনা শহরের পুলিশের হিসাব অনুয়ায়ী সেদিন ৫ লাখ ২৫ হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমেছিল। বিক্ষোভকারীদের অবস্থানে সমস্ত রাস্তা স্তব্ধ হয়ে যায়, ফ্রান্স-স্পেন আন্তর্জাতিক রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়, বার্সেলোনা বিমানবন্দরে বিমান-অবতরণ ব্যাহত হয়, স্পেনীয় গাড়িনির্মাতা সিয়াট কোম্পানি বার্সেলোনার মারতোরেল কারখানায় উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ২৫ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী শান্তিপূর্ণ ছাত্রধর্মঘট করে বিক্ষোভে যোগ দেয়। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দমনমূলক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যেও একটা ছোট অংশের উসকানিতে হিংসাত্মক সংঘাতের ঘটনা আবার বাড়তে থাকে। তার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর, একই অবস্থা বজায় থাকে। কাতালান সরকারের প্রেসিডেন্ট কুইম তোরা পুনর্বার হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধের আর্জি জানিয়ে বলেন যে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন কোনোদিনই হিংসার পতাকা বহন করেনি। পাশাপাশি তিনি অহিংস বিক্ষোভ আন্দোলন জারি রাখারও আবেদন করেন। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানান আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসার পথে আসার জন্য। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনায় বসার আহ্বান অস্বীকার করে বলে যে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে কোনো আলোচনাই চলতে পারে না কারণ তা স্পেনের সরকারের চোখে আইন বিরোধী।

নভেম্বর মাসেও কাতালোনিয়া জুড়ে স্বাধীনতার দাবিতে গণবিক্ষোভ লাগাতার চলতে থাকে। ১৩ নভেম্বর বিক্ষোভকারীরা একটি প্রধান আন্তর্জাতিক সড়কপথ ১৫ ঘন্টার জন্য অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।

কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার ইতিমধ্যেই পুলিশ, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, পরিবহন, কৃষি, পরিবেশনীতি ও পৌরশাসনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নীতি প্রণয়ন করার অধিকারী হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব আদায়ের বিষয়েই স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধীনতা এখনও নির্ধারক। শেষ বাধা টপকে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিসরে স্বাধীন কাতালোনিয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে আর কত পথ পার হওয়া বাকি ভবিষ্যৎই তা বলবে।

কাতালান ভাষাআন্দোলন ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ নিয়ে বাংলা ভাষায় এই আলোচনা করতে করতে একজন বাংলাভাষী হিসাবে কিছু চিন্তাসূত্র, কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়। নিঃসন্দেহে সে সমস্ত পূর্ণতর বিচার-বিবেচনার বিষয়, এখানে কেবল সেগুলোকে উল্লেখ করে রাখতে চাইছি।

এই আলোচনার প্রথম দিকে কাতালান ভাষার সংকট বর্ণনা করতে গিয়ে যে সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থাগুলোর কথা বলা হয়েছে, যেমন—বিঘটন, বিগলন, অবনমন, বিভাজন, অন্তর্ধান ও অনুৎসাহ, তাদের সাপেক্ষে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থাকে বিচার করলে আমরা দেখব যে বাংলা ভাষার সংকটও ক্রমশ গভীর হচ্ছে। কিন্তু ভাষার সংকট সম্পর্কে যে সচেতনতা কাতালোনিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেই তুলনায় বাংলা ভাষাভাষীদের সচেতনতা অকিঞ্চিৎকর নয় কি?

দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত ভাবনা প্রকাশিত হতে দেখি, তার মধ্যে একটি বিষয় আমাকে উদ্বিগ্ন করে। সেই বিষয়টি হল এই যে বাংলা ভাষার ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন চাইতে গিয়ে আমরা সচেতন থাকি না যে অন্যান্য বহু ভাষার (যেমন সাঁওতালি, সাদরি, কুরমালি, লেপচা, কামতাপুরি ইত্যাদি) সঙ্গে বাংলা ভাষা একই ভৌগোলিক অঞ্চল ভাগ করে নিয়ে আছে। সেই অন্য ভাষাগুলোও বিভিন্ন মাত্রায় সংকটগ্রস্ত। এইসমস্ত ভাষাগুলোর সংকটের সঙ্গে বাংলা ভাষার সংকটও কি বিভিন্নভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত নয়? এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাও কি এদের উপর আধিপত্যকারী ভূমিকা পালন করে না? তাই বাংলা ভাষার ও সংস্কৃতির সংকট মোচনের চেষ্টা কি এইসমস্ত ভাষাগুলোর ও তার সঙ্গে যুক্ত জাতীয় বা গোষ্ঠী-পরিচয়ের সংকট সম্পর্কে অচেতন থেকে বা তাদের উপর বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির আধিপত্য চাপাতে চেয়ে হবে? আমার উদ্বেগ এখানেই। এই প্রসঙ্গে কাতালান ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক কাতালানবাদ প্রবণতা হিসাবে যেভাবে কাতালোনিয়ার মধ্যে সমস্ত ভাষা ও জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে ভিন্নতার স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়ে মিলিত হতে চাইছে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা না করে, তা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। আমাদের বিশেষ সামাজিকঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই ভাবনা-প্রবণতাকে উপলব্ধি করা, বিকশিত করা ও প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হয়।

১. এই সারণিটি গৃহীত হয়েছে মিকুয়েল আনজেল প্রাদিলা কারদোনা-র লেখা 'লা কাতালানোফোনিয়া: আ কম্যুনিটি ইন সার্চ অফ লিংগুইস্টিক নরমালিটি' প্রবন্ধ থেকে যা সংকলিত হয়েছে মিকুয়েল স্ট্রাবেল ও এমিলি বয়-ফুস্টার সম্পাদিত 'ডেমোক্রেটিক পলিসিজ ফর ল্যাংগুয়েজ রিভাইটালাইজেশন: দি কেস অফ কাতালান' গ্রন্থে।

২. এ. ব্রানচাডেল তাঁর ২০০৩ সালে লেখা 'আলগুনেস প্রোপেস্টেস দি প্রোমাসিও দেল কাতালা' শীর্ষক প্রবন্ধে এভাবে বর্ণনা করেন যা মিকুয়েল স্ট্রাবেল ও এমিলি বয়-ফুস্টার তাঁদের সম্পাদিত 'ডেমোক্রেটিক পলিসিজ ফর ল্যাংগুয়েজ রিভাইটালাইজেশন: দি কেস অফ কাতালান' গ্রন্থের ভূমিকায় পুনরুল্লেখ করেছেন।

৩। কাতালোনিয়রা কাস্তিলীয়ান ভাষাকে স্প্যানিশ ভাষা বলার ঘোর বিরোধী। ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনের সময় গোটা স্পেনকে একটি কেন্দ্রীভূত কঠোর শাসনের অধীনস্থ করার প্রয়াসের অংশ হিসাবে একটি 'স্প্যানিশ' জাতীয় পরিচয় সবার উপর আরোপ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল, সেই জাতীয় পরিচয় নির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল কাস্তিলীয়ান ভাষাকে স্পেনের সব মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার গা-জোয়ারি। কাস্তিলীয়ান ভাষাকে স্প্যানিশ ভাষা বলার মধ্যে এই গা-জোয়ারি কাজ করে বলে কাতালোনিয়রা মনে করে। কাতালোনিয়দের ভাবনা অনুযায়ী, স্পেন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, সেখানে 'স্প্যানিশ জাতি' বলে একটি কোনো জাতি নেই, বরং কাস্তিলিয়ান, কাতালান, বাস্ক, গালিসিয়ান, আরাগনিয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি আছে। সেইসঙ্গেই, 'স্প্যানিশ' বলে একটি কোন ভাষা স্পেনে নেই, স্পেন একটি বহুভাষিক দেশ, যেখানে কাস্তিলীয়ান, কাতালান, বাস্ক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা আছে।

৪. এই সময়ে কাতালান ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল জোয়ানই মারতোরেন-এর লেখা তিরান্তলো ল্ব'ক, জুয়াম রোয়গ-এর লেখা ল' এস্পিল, অজানা লেখকের লেখা কুরিয়াল ই গুয়েলফা। অসিয়াস মার্ক এই সময়ের কাতালান ভাষার সর্বাগ্রগণ্য কবি, যিনি নতুন কাব্যভাষার জন্ম দিয়েছিলেন।

৫. এই আন্দোলনের ফসল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বরা হলেন রাইমন কাসেলাস, জোয়াকিম রুইরা, জোয়ান মারাগাল, মানতিয়াগো বুসিনল, প্রুডেনসি বেরট্রানা, ক্যাটেরিনা অ্যালবার্ট, ইগনাসি ইগলেসিয়াস ইত্যাদি।

৬. এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা আগ্রহী পাঠকরা পেতে পারেন মনসেরাত গ্লবেরনাউ লিখিত 'কাতালান ন্যাশনালিজম: ফ্রাঙ্কোইজম, ট্রানজিশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে।

৭. এই সময় সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটো ধারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রথম ধারাটি হল ন্যুসেনটিসমে, যা ইউরোপের প্রধান শিল্প আন্দোলনগুলোর মধ্য থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজেছিল, যার প্রধান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন ইউজেনি ডি'ওরম, জওমে বোফিল ঈমেটস, জোসেপ কারনার, জোসেপ এম. ললাপেজ পিকো, কার্লেস সোলদেভিলা, কার্লেস রিবা ও ভেনচুরা গ্যাসোল। দ্বিতীয় ধারাটি হল আঁভাগার্দিসমে', যা স্বকীয়তা ও নিজস্বতার উপর জোর দিয়েছিল, যার প্রধান ব্যক্তিত্বরা ছিলেন জোসেপ ভি ফয়, জোয়ান সালভাত-পাপাসিত এবং জোয়ান অলিভার।

৮. ১৯৩২-১৯৩৯ কাতালোনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের উত্থান ও পতন নিয়ে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের জন্য উৎসাহী পাঠক দেখতে পারেন ফার্নান্দো দিক্লদা 'কম্যুনিস্ট মুভমেন্ট ফ্রম কমিন্টার্ন টু কমিনফর্ম' গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠা থেকে ২৪২ পৃষ্ঠা। জর্জ অরওয়েলের 'হোমেজ টু কাতালোনিয়া'-তেও একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর আবেগ ও বিশ্লেষণে দীপ্ত আখ্যান উপস্থিত। এছাড়া অন্যতর পাঠ ও চর্চা প্রকাশিত 'স্পেন ১৯৩৬–৩৭ : গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নৈরাষ্ট্রবাদী গণউদ্যোগ' বইতে বিশদ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাবেন।

৯. এঁদের মধ্যে আছেন সালভাদর এস্প্রু, জোয়ান অলিভার, জোসেপ ভি ফয়েক্স, আগুস্তি বারত্রা, জোয়ান ভিনিয়লি ইত্যাদিদের মতো কবি, জোসেপ প্লা, মেকে রডরেডা, লোরেঙ্ক ভিলালঙ্গা, মানুয়েল ডি পেডরোলো, পিয়ার ক্যালডার্স ইত্যাদিদের মতো গদ্য লেখকরা।

১০. ১৯৭৫ পরবর্তী কাতালোনিয়ার সরকারের ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য উৎসাহী পাঠকেরা মিকুয়েল ষ্ট্রাবেল ও এমিলি বয়েক্স-ফুস্টার সম্পাদিত 'ডেমোক্রেটিক পলিসিজ ফর ল্যাংগুয়েজ রিভাইটালাইজেশন : দি কেস ফর কাতালান' গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

১১. মিকুয়েল ষ্ট্রাবেল-এর গোটা বক্তব্য এবং তার উপর অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনা সংকলিত হয়েছে স্যু রাইট সম্পাদিত 'ল্যাংগুয়েজ, ডেমোক্রেসি, অ্যান্ড ডিভোলিউশন ইন কাতালোনিয়া' গ্রন্থে।

১২. স্যু রাইট সম্পাদিত 'ল্যাংগুয়েজ, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডিভোলিউশিন ইন কাতালোনিয়া' গ্রন্থে মিকুয়েল ষ্ট্রাবেলএর উপস্থাপনায় উদ্ধৃত।

দশম অধ্যায়

বিকল্প সম্ভাবনা

স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে হওয়া গণভোটকে ঘিরে ওঠা তরঙ্গ কিছু বিশেষত্ব সামনে নিয়ে এসেছিল। আধিপত্যকারী নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির বাইরে বেরিয়ে বিকল্প নীতির মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিকে পরিচালনা করার অভিপ্রায় এখানে স্বশাসনের চাহিদার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

কাতালোনিয়ার ভাষিক অধিকার ও স্বশাসন আদায়ের দীর্ঘ আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিকশিত হওয়া রাজনৈতিক কাতালানবাদ আবার বেশকিছু অন্য বিকল্প ধ্যানধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন জাতি ও ভাষাগোষ্ঠী অপরাপরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে কীভাবে এক বহুত্বের পরিসরের মধ্যে নিজ নিজ বিকাশের পথ করে নিতে পারে, কীভাবে সেখানে শিকার ও শিকারীর সম্পর্ক তৈরি হওয়া এড়ানো যেতে পারে, তাকে অগ্রগণ্যতা দিয়ে রাজনৈতিক কাতালানবাদীরা রাষ্ট্রের বিকল্প রূপ নির্ধারণ ও নির্মাণ করার কথা ভেবেছে।

উভয় ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক স্বশাসনের ভাবনা অগ্রগণ্যতা পেয়েছে। যথাসম্ভব বিশাল একটি ভূখণ্ড জুড়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একটি রাষ্ট্র গঠন করে কেন্দ্র থেকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-নজরদারি চালু রাখার ঔপনিবেশিক যুগের জাতিরাষ্ট্রের ছাঁচের বিরোধিতা করা হয়েছে। এমন প্রশাসনের আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে যা নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভূত করে প্রতিটি অঞ্চলকে স্বাধীনভাবে স্বশাসন চর্চার জায়গা করে দেয়। অর্থাৎ, মহাপরাক্রমী কোনো পার্টি-সেনা-আমলাতন্ত্রের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের বদলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনগুলোর স্বাধীন ও পরস্পর সম্পর্কে সংবেদনশীল ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ বিষয়গুলো নির্বাহ করার চেষ্টা জন্ম নিয়েছে।

এই দৃষ্টান্তগুলো নানা বিকল্প সম্ভাবনাকে সামনে এনে দিচ্ছে। একটি শিকারী আধিপত্যের রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার মানে নিজে সেই শিকারীর অবস্থানকে অনুকরণ করে অপরাপরদের উপর নতুন এক শিকারী শাসন কায়েম করা—এটাই

যে একমাত্র ভবিতব্য নয় তা দেখিয়ে দিচ্ছে। অর্থনীতি, সমাজগঠন, রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে উপনিবেশ-শিকারীদের নীতিরই পুনরাবৃত্তি না করে বিকল্প তৈরির চেষ্টাকে বাস্তবতায় রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটাচ্ছে। এই সম্ভাবনাগুলো স্কটল্যান্ড বা কাতালোনিয়ার ভাষা-জাতিসত্তার সংগ্রামের আগামী বিকাশপথের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা বা জীর্ণতা প্রাপ্তির নিয়তিতে পৌঁছবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর যে কোনো কোণেই যে কোনো জনজাতির ভাষা-জাতিসত্তার সংগ্রাম এই সম্ভাবনাগুলোকে নিজেদের স্বতক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন পথে নতুন ভাবে বিকশিত করতে পারে। তাই, এই সম্ভাবনাগুলোকে বিবেচনার মধ্যে রেখে আপন স্বতক্রিয়ার পরিসরটিকে আরও গভীর ও ব্যাপ্ত করা সবারই কাজ। কেউই কেবল দর্শক বা বিশ্লেষক নয়।